বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[২৩ ও ২৪তম খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মাওলানা সাইফুর রহমান কাসেমী

শিক্ষাসচিব, জামিয়া মাদানিয়া নবাবকাটারা নিমতলী, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব, গোলাম মাখদুম জামে মসজিদ
১০৮, আগাসাদেক রোড, ঢাকা।

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারী : ২০১৮
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য 500 মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২৩

- আল্লাহর ভালোবাসা /২৫
- রহমতের নবীর চিরস্থায়ী মুজিযা /৭৯
- আত্মশুদ্ধির চিন্তা /১১৫
- গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো /১৪৭
- তিনটি অমূল্য বাণী /১৬৯
- সামাজিক জীবনরে সোনালি রীতি /১৯৩
- আল্লাহর অস্তিত্ব /২২৩

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২৪

- আল্লাহপ্রেমের প্রাকৃতিক চাহিদা /২৪১
- অনুপম সৌন্দর্য /২৯১
- মারেফাতের মুক্তা /৩২৫
- মুনাফিকের পরিণতি /৩৬৭
- জঙ্গলের ভ্রমণ /৩৯৩
- নিজের ভুলত্রুটিগুলো জানা /৪০৯

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-২৩

আল্লাহর ভালোবাসা /২৫

حُبٌّ শব্দের ব্যবহার /২৫

দুটি ইল্‌মি নুকতা /২৭

মহব্বতের স্তরসমূহ /২৮

প্রকৃত মহব্বতকারীর চারটি নিদর্শন /৩০

ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসার উপহার /৩২

আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে বৃদ্ধি পায় /৩৪

একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি /৪১

আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার তিনটি নিদর্শন /৪২

আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার ৬টি আলামত /৪৫

'মহব্বত' প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য /৪৮

প্রকৃত ভালোবাসার ধরন হাদীছের আলোকে /৫৩

ভালোবাসার অন্তর নিজেই কথা বলে /৫৬

রাবেয়া বসরি (রহ.)-এর খোদাপ্রেমের কাহিনি /৫৬

প্রেমমাখা প্রার্থনা /৫৯

মহব্বত : মানসূর ইবনে হাল্লাজের দৃষ্টিতে /৬১

আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মহারা এক যুবকের গল্প /৬২

প্রতি প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়তমের আলোচনা /৬৩

সময় এসেছে ভেবে দেখার /৬৪

সৃষ্টিপ্রেমের এই হাল! /৬৬

সরিষার দানাপরিমাণ মহব্বতের মর্যাদা /৬৭

লম্বা সেজদা করার কারণ /৬৭

আহলে মহব্বতের জন্য সুসংবাদ /৬৭

আল্লাহপ্রেমীদের প্রতি প্রেমমাখা সম্বোধন /৬৮

প্রেমছড়ানো কবিতা /৬৮

ইশকের বড়ি কোথায় পাওয়া যায়! /৬৯

মোরাকাবা নাকি প্রেমসুধা /৭০
পান করার পূর্বে পানকারী /৭০
প্রেমসুধার ভিখারী /৭১
বৃদ্ধদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের আকাঙ্ক্ষা /৭১
শিক্ষিতদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের তামান্না /৭২
পাপী-তাপীদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের আকাঙ্ক্ষা /৭৩
সময়ের মূল্যায়ন করুন /৭৫
আপনার একটি সুদৃষ্টির ব্যাপার মাত্র /৭৫
রহমতের নবীর চিরস্থায়ী মুজিযা /৭৯
সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মুজিযার প্রদর্শন /৭৯
নবুওতও চিরস্থায়ী, মুজিযাও চিরস্থায়ী /৮১
জামারাত থেকে কঙ্কর অদৃশ্য হওয়ার মুজিযা /৮১
আবে যমযমের মুজিযা /৮২
আরো চারটি চিরস্থায়ী মুজিযা /৮৩
কুরআনকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা /৮৪
এক রুশ নারীর আহাজারি /৮৪
সমকালীন সরকারের বিস্ময়! /৮৫
ঈমানদীপ্ত দুটি ঘটনা /৮৫
হাদীছের হাফেযগণ /৯০
একটি চমৎকার ঘটনা /৯১
আসমাউর রিজাল শাস্ত্র /৯২
সর্বপ্রথম মাদরাসা /৯২
মাদরাসাসমূহ বন্ধের জঘন্য ষড়যন্ত্র /৯৩
দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা /৯৫
ইল্‌ম ও ফনের মারকাযসমূহ /৯৬
দারুল উলূম দেওবন্দের কবূলিয়্যত /৯৯
মাদরাসা কেন ধ্বংস হবে না /৯৯
মাদরাসাগুলো কীভাবে চলে? /৯৯
আমাদের তরী যদি ডুবে যায় /১০১
ওলামায়ে কেরাম খাবেন কোত্থেকে? /১০২
আলেমদের ধ্বংসের চেষ্টা করা অনর্থক /১০২
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর সাহসিকতা /১০৩
হযরত মাদানী (রহ.)-এর দুঃসাহসিক জবাব /১০৪

তালেবে ইল্‌মরা গোটা জাতির মুহসিন /১০৫
কোন-কোন জিনিসের দর্শন ইবাদত /১০৫
হাশরের মাঠে আলেমগণের সম্মাননা /১০৬
আল্লাহর পথে /১০৬
অতীত পাপসমূহের কাফফারা /১০৭
সাহস হারাবেন না /১০৭
কুফরি শক্তিকে নস্যাৎ করে দিন /১০৭
আসুন, নববী আদর্শের দৃষ্টান্ত হয়ে যাই /১০৭
মাওলানা হওয়ার অর্থ কী? /১০৯
আত্মোৎসর্গকারী কাফেলাটি /১০৯
মানুষের হৃদয় জয় করার উপায় /১১০
কবুলিয়্যাতের চিন্তা করুন /১১১
আত্মশুদ্ধির চিন্তা /১১৫
ইসলামে মূলনীতি নির্ধারণ /১১৫
মনের পরিচ্ছন্নতার আদেশ /১১৮
এযুগে অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা কীভাবে হয়? /১১৯
দাগ দূর করার ডিপ্লোমা /১১৯
এটি ভিন্ন যুগ /১২০
শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাষার ব্যাকরণশাস্ত্র /১২০
যিকির ও সুলুকের জন্য সহায়ক কিছু পদ্ধতি /১২১
মৃত্যুর মোরাকাবা /১২২
রেসালাতের মাকসাদ ও তার বিভাগসমূহ /১২২
ভিন্ন বিভাগের কর্ম নিয়ে প্রশ্ন করবেন না /১২৪
দীনের প্রতিটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ /১২৫
জাহেরি ও বাতেনি ইল্‌মের ধারক ব্যক্তিবর্গ /১২৫
যিকির ও আত্মশুদ্ধির একটি পৃথক বিভাগ আছে /১২৬
শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মাকামে ইহসান' /১২৬
হাদীছ বোঝার জন্য ওস্তাদ প্রয়োজন /১২৮
বিশেষজ্ঞেরও ভুল হয় : দুটি উদাহরণ /১২৮
একটি প্রশ্নের উত্তর /১২৯
হাদীছে নিঃশব্দ ও সশব্দ যিকিরের ইশারা /১২৯
মোরাকাবার আসল লক্ষ্য /১৩০
এক শাইখুল হাদীছের করুণ দশা! /১৩০

যিকির ও আত্মশুদ্ধি কি নফল কাজ? ১৩১
কয়েকটা বিভ্রান্তির নিরসন /১৩১
আমার সৌভাগ্যের গল্প /১৩৪
অহংকার হতে মুক্তির উপায় /১৩৪
আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত /১৩৫
একটি বাস্তবতা /১৩৬
যিকির ইবাদতে আগ্রহ সৃষ্টি করে /১৩৭
নক্‌শবন্দি সেলসেলার সবক পরিচিতি /১৩৭
কলব জারি হয়ে যাওয়া প্রথম পদক্ষেপ /১৩৮
বিশ বছরের সাধনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল /১৩৯
মোরাকাবার প্রতি গুরুত্ব দিন /১৪০
নক্‌শবন্দি সেলসেলার অজিফাসমূহ /১৪০
ছাত্রজীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব /১৪১
ছাত্ররা যেভাবে অজিফা আদায় করবে /১৪২
সকল নবীর প্রতি যিকিরের আদেশ /১৪৩
তরুণদের দুর্ভাবনার সমাধান /১৪৪
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো /১৪৭
একটি খোদায়ি রীতি /১৪৭
গুনাহ কাকে বলে? /১৪৮
গুনাহ দু-ধরনের /১৪৮
গুনাহের শ্রেণি বিন্যাস /১৪৮
গুনাহের সর্বশেষ পর্যায় /১৫০
গুনাহের দুনিয়াবি ক্ষতি /১৫০
পূর্ববর্তী উম্মতের ধংসের কারণ /১৬১
চল্লিশ বছর পূর্বে করা পাপের শাস্তি /১৬২
কুরআন মুখস্থ হওয়া থেকে মাহরূমি /১৬৩
আমলের সাইনবোর্ড /১৬৩
গুনাহের প্রভাব অধীনদের মধ্যেও আসে /১৬৩
এক বাদশাহর আফসোস /১৬৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১৬৫
তিনটি অমূল্য বাণী /১৬৯
মানবজাতির উত্থানের রহস্য /১৬৯
আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা /১৬৯

আনন্দদায়ক আমলনামা /১৭০
বেদনাদায়ক আমলনামা /১৭১
একটি মূল্যবান হাদীছ ১৭২
সদকা করার ফজিলত /১৭২
ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিয়ো না /১৭৩
সদকা কাকে দেবেন? /১৭৩
সদকার আটা /১৭৪
'হাথ দাদে তা কম আনদা আয়ে' /১৭৪
দান-সদকা কখন কঠিন হয়ে যায়? /১৭৫
মৃত্যুর ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় /১৭৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১৭৬
লাভজনক ব্যবসা /১৭৬
মেহমানকে আহার করানোর ছাওয়াব /১৭৭
আয়ুতে বরকত হওয়ার বিস্ময়কর গল্প /১৭৭
এক টাকা দানেরও ছাওয়াব আছে /১৭৮
নিয়ত স্বচ্ছ হলে প্রতিদান নগদ /১৭৮
ক্ষমা করার ফজিলত /১৭৯
ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ/১৭৯
নবীজির ক্ষমার অনন্য উদাহরণ /১৭৯
অপূর্ব ক্ষমার আরেকটি উদাহরণ /১৮০
উল্টে গেল হৃদয়তরী /১৮৪
বিনয়ের ফজিলত /১৮৫
প্রকৃত মর্যাদা /১৮৫
দীনের ওপর আমল কীভাবে হবে? /১৮৬
জীবনের মূল্যায়ন করো! /১৮৬
তাওবার দরজা কখন বন্ধ হয়? /১৮৬
দয়াময় প্রভুর পছন্দ /১৮৭
পাপ মোচনের সময় ১৮৭
সামাজিক জীবনরে সোনালি রীতি /১৯৩
হৃদয়ের বন্ধন যেভাবে সৃষ্টি হয় /১৯৩
নিজের মধ্যে কল্যাণকামিতা সৃষ্টির আদেশ /১৯৫
প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় /১৯৫
মুখকে হাতের পূর্বে উল্লেখ করার হেকমত /১৯৬

মানুষ কী কারণে জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট /১৯৭
নিজের জীবনের সদকা /১৯৮
সন্তানদের আচরণ /১৯৯
মায়ের মমতা : একটি বিস্ময়কর ঘটনা /২০১
স্ত্রীকে কষ্ট দেবেন না /২০৪
স্ত্রীরাও সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবে /২০৪
সন্তান না হওয়ার জন্য তিরস্কার করা /২০৪
এক বুযুর্গের ঘটনা /২০৫
নবীজির উত্তম চরিত্রের একটি ঝলক /২০৬
স্ত্রীর মন জয় করে নিন /২০৬
স্ত্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ করবেন না /২০৬
কুরআনের দৃষ্টিতে ভাইয়ের মর্যাদা /২০৭
প্রতিবেশীর হক /২০৮
অধীনদের সঙ্গে আচরণ /২০৯
নবীজির আখেরি পায়গাম /২০৯
নবীজি যার উকিল হবেন /২১০
কারো মনে আঘাত দেবেন না /২১০
উম্মাহর আকাবিরগণের মধ্যে মানবপ্রেম /২১২
হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মানবপ্রেম /২১২
হযরত ওমর (রাযি.)-এর মানবপ্রেম /২১৩
মিয়াঁ আসগর হুসাইন দেওবন্দি (রহ.)-এর মানবপ্রেম /২১৫
অবুঝ প্রাণীদের সঙ্গে সদাচারের শিক্ষা /২১৬
হযরত থানুবি (রহ.)-এর সহমর্মিতা /২১৭
এক বেশ্যা নারীর দয়া /২১৭
এক মুহাদ্দিছ সাহেবের দয়া /২১৮
হক মাফ করানোর পদ্ধতি /২১৯
আল্লাহর অস্তিত্ব /২২৩
সন্দেহ থেকে বাঁচার শিক্ষা /২২৩
বস্তুবাদীদের নিরুত্তর করার প্রশ্নাবলি /২২৪
পৃথিবীর সৃষ্টিজীব ও স্বভাবগত নির্দেশনা /২২৬
কুরআনে মাজীদে কুদরতের নিদর্শন /২২৭
আসমানে কুদরতের নিদর্শন /২২৭
ডারউইন মতবাদের অসারতা /২২৮

কুদরতের নিয়ম ও তার সৌন্দর্য /২২৯
এক নাস্তিকের ঔদ্ধত্ব /২৩০
কুদরতের কারিশমা বোঝার নির্দেশ /২৩১
চুল গজানোর মধ্যে কুদরতের মহিমা /২৩১
হাড্ডিগুলো বেড়ে উঠার মধ্যে কুদরতের সৌন্দর্য /২৩২
মুখের আকৃতির ভিন্নতার মধ্যে কুদরতের কারিশমা /২৩৩
আল্লাহর অস্তিত্বের একটি চমৎকার দলিল /২৩৪
দৃঢ় ঈমানের পরিচয় /২৩৪
কদু বড় আর আম ছোট করে সৃষ্টির হেকমত /২৩৫
ঈমানের হেফাযত করতে হবে /২৩৬
এক বিজ্ঞানীর স্বীকারোক্তি /২৩৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার-২৪

আল্লাহপ্রেমের প্রাকৃতিক চাহিদা /২৪১

মানবদেহের প্রাকৃতিক চাহিদা /২৪১
আত্মার প্রাকৃতিক চাহিদা /২৪১
দুধের বাচ্চার ইল্‌ম অর্জন /২৪২
আইডিয়েলের সন্ধান /২৪৩
এ্যাডলর-এর অভিমত /২৪৩
ফ্রাইড-এর অভিমত /২৪৩
চূড়ান্ত কথা /২৪৪
সব বান্দা-ই আল্লাহকে বিশ্বাস করে /২৪৪
অন্তরের ক্ষুৎ-পিপাসা মেটানোর অস্থিরতা /২৪৫
মহব্বতে ইলাহীর জযবা চেনার উপায় /২৪৬
নিজের মধ্যেই তালাশ করো! /২৪৭
দুনিয়া-আখেরাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত /২৪৭
ঈমানি নূরের উপকারিতা /২৪৮
তিনটি বিস্ময়কর কথা /২৪৮
পাষাণ হৃদয়গুলোকে গলানোর উপায় /২৪৮
বিপ্লব সৃষ্টিকারী নাম /২৪৯
দুনিয়ার মহব্বত দূর করার উপায় /২৪৯
অলসতা হতে বাঁচার আদেশ /২৫১
বিবেক অন্তর ও দৃষ্টির প্রধান মুরশিদ /২৫১
মাখলুকের ভালোবাসার সীমারেখা /২৫১
যা হৃদয় জয় করে নেয় /২৫৩
মহব্বতে ইলাহীর ব্যাকুলতা কীভাবে প্রশান্তিলাভ করবে! /২৫৪
আল্লাহর দিকে ছুটে যাওয়ার অর্থ /২৫৮
হিজরতের কয়েকটি স্তর /২৫৯
মাখলুক থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি /২৫৯
সাক্ষাৎ চার প্রকার /২৫৯
আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান /২৬০
আল্লাহর তাজাল্লির দর্শন /২৬২
একটি ইল্‌মি নুকতা /২৬২
আল্লাহপ্রেমের মূল ভিত্তি /২৬৩
তিনিই তোমার উপাস্য /২৬৪
তিনটি সোনালি উক্তি /২৬৫

সেই সেজদার স্থান /২৬৬
প্রেমের দাবিদারদের ভয় লাগে /২৬৭
উদ্দেশ্য পূরণের সময় /২৬৭
কুরআনে মাজীদে তিন ধরনের মানুষের আলোচনা /২৬৮
মৃত্যু যাকে ভয় পায় /২৬৮
মৃত্যুর জন্য যারা অপেক্ষা করে /২৬৯
আল্লাহর ভালোবাসায় সমৃদ্ধির কারণ /২৬৯
পবিত্র কুরআনে 'ইশ্‌ক' শব্দটি নেই কেন? /২৭০
মহব্বতের তীব্রতা /২৭১
কল্যাণের ইচ্ছা /২৭২
ইশ্‌কের পথে ব্যালেন্স রক্ষা করুন /২৭২
এটা সেলফোন নয়– হেলফোন (হেল অর্থ নরক) /২৭৩
তাহাজ্জুদ পড়া নসিব হবে যেভাবে /২৭৩
বিজাতীয় অভ্যাস /২৭৪
তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কারণে তাহাজ্জুদ নসিব হবে /২৭৪
সারা রাত জেগে ইবাদত /২৭৪
স্বাদের সঙ্গে পরিচয় /২৭৫
নামায বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যম /২৭৫
আল্লাহর ভালোবাসা নিশ্চিতকারী আমলসমূহ /২৭৫
বান্দার আলোচনা কীভাবে স্থায়িত্ব পায় /২৭৬
তোমার মধ্যে নেসবতের নূর আছে /২৭৬
কোমল হওয়ার দীক্ষা /২৭৭
ভালোবাসা-ই কথা শেখায় /২৭৮
একটি বিস্ময়কর কথা /২৭৯
এক বৃদ্ধের চমৎকার দু'আ /২৭৯
একলা থাকা সে তো তোমাকেই মানায় /২৮০
এক বৃদ্ধের বিস্ময়কর দু'আ /২৮০
হৃদয়ের জানালা খুলে দাও /২৮১
একটি চমৎকার কথা /২৮১
একটি প্রেমভরা দু'আ /২৮১
আরেকটি অপূর্ব দু'আ /২৮২
বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের আদব /২৮৩
বান্দার প্রতি আল্লাহর অভিযোগ /২৮৪
আল্লাহকে মানিয়ে নাও /২৮৬
অনুপম সৌন্দর্য /২৯১
সারা পৃথিবীর মাহবুব /২৯১

নবীজির প্রতি ভালোবাসা বাড়ানোর পদ্ধতি /২৯২
অনুপম রূপ-সৌন্দর্য /২৯৩
আল্লামা কুরতুবি (রহ.)-এর উক্তি /২৯৩
অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনার উদ্দেশ্য /২৯৪
অনুপম সৌন্দর্য সাহাবাদের দৃষ্টিতে /২৯৫
সৌন্দর্যের নিগুঢ় রহস্য /৩০৪
ইবনে আসাকিরের বর্ণনা /৩০৫
নবীজির দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ /৩০৭
কবিদের মাঝে ইশকে রাসূলের মর্যাদা /৩১৭
এশকে বেলালীর মূল্যায়ন আল্লামা ইকবালের কবিতায় /৩১৯
মারেফাতের মুক্তা /৩২৫
আহলে ইল্‌মের উপাধি /৩২৫
ভাষাজ্ঞান ও কুরআন অনুধাবণ /৩২৫
হেদায়াতপ্রাপ্ত স্বভাবের অধিকারী /৩২৬
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর মারেফাত /৩২৮
দুনিয়া ত্যাগের অর্থ কী? /৩২৮
ফরজ আদায়ের স্বাদ /৩২৯
দুনিয়ার হাকিকত /৩৩০
সাধকের বঞ্চনার কারণ /৩৩৩
আত্মিক আপ্যায়ন /৩৩৬
প্রকাশ্য নসীহতের মন্দ প্রভাব /৩৩৬
হুজুরির কাইফিয়্যাত /৩৩৭
ছাহেবে নেসবত শান্তির কারণ হয় /৩৩৭
নফসের সঙ্গে ঝগড়া করার ফজিলত /৩৩৭
বিপ্লবের মাধ্যম /৩৩৮
ওজর ব্যতীত অজিফা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি /৩৩৮
দুটি মূল্যবান অজিফা /৩৩৯
'আল্লাহর দিদার'-এর ধরন কেমন হবে? /৩৩৯
দৃশ্যত বিপদ; বাস্তবে সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম /৩৪০
প্রকৃত ঈমান কখন অর্জিত হয়? /৩৪২
খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) ও ইহয়ায়ে সুন্নত /৩৪২
সালেকদের উপকার কীভাবে হয়? /৩৪৪
কলবি যিকিরের উপকার /৩৪৪
মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) ও সুন্নতের গুরুত্ব /৩৪৫

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অমূল্যবান মাধ্যম /৩৪৬
সালেহ্ লোকদের সোহবতের ফজিলত /৩৪৭
নফসের খাহেশাত বিদ্যমান থাকার প্রমাণ /৩৪৭
'ফানা'-এর পূর্বে 'বাকা'-এর পর নফসের হাকিকত /৩৪৭
শরীয়তের অনুসরণ সকল কামালাতের বুনিয়াদ /৩৪৭
হৃদয়ের আকুতি /৩৪৮
দুরূদ শরীফ ও কলবি যিকিরের ছাওয়াব /৩৪৮
বিপদ ও নেয়ামত কীভাবে? /৩৪৯
সুন্নতের অনুসরণ ও শাইখকে ভালোবাসার ফজিলত /৩৫০
কুফরের অন্ধকার কীভাবে দূর হয়? /৩৫০
প্রত্যাখ্যানযোগ্য কথামালা /৩৫১
এটিও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত /৩৫১
প্রিয়তমের দেওয়া কষ্টের স্বাদ /৩৫১
বিদ'আতের হাকিকত /৩৫১
তাসাওউফ অস্থিরতার অপর নাম কীভাবে? /৩৫১
সফলতার একমাত্র পথ /৩৫২
নবীজির উসিলার গুরুত্ব /৩৫২
প্রকৃত কৃতিত্ব কেমন মানুষের? /৩৫২
প্রকৃত সালেকের গুণ /৩৫২
প্রকৃত মুমিন কে? /৩৫৩
ইবাদতের স্বাদ একটি পুরস্কার /৩৫৩
সত্যের অনুসারী হওয়া যাকির হওয়ার দলিল ৩৫৩
স্বপ্নের গ্রহণযোগ্যতা /৩৫৩
'আনফাসে রহীমিয়্যাহ'- হতে কিছু মারেফত /৩৫৩
জনসাধারণের মধ্যে মুখের হেফাযত /৩৫৪
কখনো যদি লৌকিকতা করতে হয়, তখন... /৩৫৪
যদি সত্যের সন্ধানী পরের মাঝে চলে যায়, তখন... /৩৫৪
একটি কথা ভালোভাবে মনে রাখবেন /৩৫৪
সালেক নিজেকে প্রাথমিক স্তরের মনে করবে /৩৫৪
স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিন /৩৫৪
আত্মসমর্পণ /২৫৫
'নুকূশে তরীকত' থেকে কিছু মারেফাত /২৫৫
গালবায়ে হালের সময় অযাচিত কথা বলা /২৫৫
'আল্লাহ' শব্দই ইসমে আজম /২৫৫

মৃত্যুর সময় অভ্যাসের আমল জারি হয়ে যায় /২৫৬
এজাযত ও খেলাফতের উৎস /৩৫৭
কুমন্ত্রণা ও তার প্রতিকার /৩৫৭
শয়তানি ও নফসানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার কী? /৩৫৮
'মাকতুবাতে রশীদিয়্যাহ' থেকে কিছু মারেফাত /৩৫৮
শোওয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদ পড়া /৩৫৮
যখন যাতের স্মরণের কল্পনা স্থির হয়ে যায় /৩৫৯
নবীর সাহচর্যের ফায়দা /২৫৯
তাসাওউফে লেগে থাকা উচিত /২৫৯
যিকিরের জন্য অবসর কেন খুঁজব /৩৬০
'সালেকদের রাহনুমায়ী' থেকে মারেফাত /৩৬০
ফলাফলের অপেক্ষা /৩৬০
আত্মতুষ্টি হতে কীভাবে বাঁচবেন? /৩৬০
গীবতের চিকিৎসা /৩৬০
নেক আমল করার কারণ /৩৬০
কুধারণার চিকিৎসা /৩৬১
নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির উত্তম উপায় /৩৬১
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষকরণ /৩৬১
প্রতিশোধপ্রবণতার চিকিৎসা /৩৬১
গাইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কখন অপছন্দনীয় /৩৬১
হিংসার চিকিৎসা /৩৬১
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ফজিলত /৩৬২
তাওয়াজ্জুহর ফয়েজ /৩৬২
মুনাফিকের পরিণতি /৩৬৭
বস্তুর আকৃতি ও হাকিকত /৩৬৭
বাতেনের ওপর মেহনত করার প্রয়োজন /৩৬৮
আত্মভোলা হওয়া আল্লাহভোলা হওয়ার নামান্তর /৩৬৯
অন্তরের পরিচ্ছন্নতা /৩৬৯
অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার দুটি উপায় /৩৭০
শয়তানের হামলার ধরন /৩৭৩
কল্যাণকামিতার খোলসে শত্রুতা /৩৭৪
মূল্যবান নসীহত /৩৭৬
পরিতাপের প্রকারসমূহ /৩৭৮

বর্ণচোরা কাকে বলে? /৩৭৯
নেফাকের প্রকারসমূহ /৩৭৯
নেফাকে আকবরের পরিচয় /৩৭৯
নেফাকে আসগর-এর পরিচয় /৩৮০
মুনাফিকি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ /৩৮১
নেফাক থেকে বাঁচার উপায় /৩৮২
অপমৃত্যুকে ভয় করার সুফল /৩৮৩
ইখলাস না থাকার ভয় /৩৮৩
সুফিয়ান ছাওরি (রহ.)-এর অপমৃত্যুর ভয় /৩৮৩
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অপমৃত্যুর ভয় /৩৮৩
হযরত ওমর (রাযি.)-এর অপমৃত্যুর ভয় /৩৮৪
মুনাফিকির পরিণতি /৩৮৫
জঙ্গলের ভ্রমণ /৩৯৩
জীবন যাপনের স্বভাবজাত জ্ঞান /৩৯৩
সিংহ বাউন্ডারি লাইন কীভাবে তৈরি করে /৩৯৪
বনের রাজার রাজকীয় জীবন /৩৯৫
বাচ্চাদের পৃথক করে দেয়া /৩৯৬
স্ত্রী সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ /৩৯৬
সিংহের দস্তরখান /৩৯৬
শিকারের পরিকল্পনা /৩৯৭
শিকারের পদ্ধতি /৩৯৭
জিরাফ শিকারের পদ্ধতি /৩৯৭
এক অভিনেত্রী সিংহীর গল্প /৩৯৮
সিংহের কৃতজ্ঞতার গল্প /৩৯৯
সিংহের খাবার /৪০১
একটি বিস্ময়কর দৃশ্য /৪০১
সিংহ কখন শিকার করে /৪০২
হামলার সময় সতর্কতা /৪০৩
সিংহ জায়গা বদলাতে থাকে ৪০৩
মানুষের উপর হামলা করার মৌলিক কারণ /৪০৩
পথের অধিকার /৪০৪
নিজের ভুলত্রুটিগুলো জানা /৪০৯
বিশেষ মজলিসসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? /৪০৯

আমল করার প্রতিজ্ঞা /৪০৯
নিজের ত্রুটি কখন প্রকাশ পায় /৪১০
উদাসীনতার চাদর /৪১১
নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যিনাকারী /৪১২
সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে /৪১৩
একব্যক্তির অমার্জিত মন্তব্য /৪১৩
নিজের কথার ব্যাপারেও উদাসীনতা! /৪১৩
দ্বিমুখী আচরণ বর্জন করুন /৪১৪
কুদৃষ্টি থেকে কারা বেঁচে থাকে /৪১৪
দোষদর্শী চোখ /৪১৫
নিজের দোষত্রুটি জানার উপায় /৪১৫
শাইখের কাছে দোষত্রুটি বর্ণনার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি /৪১৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৪১৭
যার ওস্তাদ নেই তার কোনো ভিত্তি নেই / ৪১৮
ভালো বন্ধুর পরিচয় /৪১৯
'ভালো কাজে সাহায্য করো'-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ /৪২০
সেই দরবেশ এমনই ছিল /৪২০
বাদশাহকে শিক্ষাদান /৪২১
গভর্নর হলে এমনই হও /৪২২
বিষাক্ত কথাও হজম করে নিতে হবে /৪২৩
তুমিই আমাকে সঠিক চিনেছ /৪২৩
এক বুযুর্গের ঘটনা /৪২৪
মানুষ হিংসা করে কেন /৪২৪
হযরত লুকমানের পাণ্ডিত্য /৪২৫
প্রকাশ্যে চোরের হাত কাটার বিধানের হেকমত /৪২৬
কামেল মানুষের নিদর্শন /৪২৬
সবাইকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করো /৪২৭
মছনবিতে হেকমতপূর্ণ কথার কারণ /৪২৮
কুকুর দ্বারা মারেফাত লাভ /৪২৮
মালিকের সাথে অফাদারি /৪৩১
আরেফানা কালাম /৪৩২
বুকটা হিংসামুক্ত করার ফজিলত /৪৩৩
কুরআনে মাজীদে আমাদের আলোচনা /৪৩৪

খুতুবাতে যুলফিকার

২৩তম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহর ভালোবাসা

'আল্লাহর ভালোবাসার দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, তিনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে কখনো-কখনো পরীক্ষাও করেন। আর এই পরীক্ষার ব্যাপারটা বুঝেও আসে। আপনি পাঁচ টাকা দিয়ে তরমুজ ক্রয় করে টোকা মেরে দেখেন, ভেতরে কাঁচা, না পাকা। এমনিভাবে পনেরো টাকা দিয়ে মাটির পাত্র ক্রয় করে তাতে টোকা মেরে দেখেন, পাত্রটা কাঁচা, না পাকা। আমরা যেমন দশ-পনেরো টাকার জিনিসকে টোকা মেরে দেখি, তা কাঁচা, না পাকা, আল্লাহও টোকা মেরে দেখেন, বান্দা কাঁচা, না পাকা! দুধ পানকারী লোকটি পাগল নয় তো আবার? এ-কারণে আল্লাহ তার এমন প্রিয় বান্দাদের প্রতি কখনো-কখনো বিপদাপদ পাঠিয়ে দেন এবং দেখেন, এমন কঠিন-মুহূর্তে আমার বান্দা কী করে?'

আল্লাহর ভালোবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে ভীষণ ভালোবাসা রাখে।'[১]

অর্থাৎ– ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে। ভালোবাসা অন্তরের একটি অবস্থার নাম। 'মহব্বত' শব্দটি পবিত্র কুরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে, হাদীছ শরীফেও ব্যবহৃত হয়েছে।

حُبٌّ শব্দের ব্যবহার

মহব্বত (مَحَبَّت)-এর মূল শব্দ দুটি অক্ষর দ্বারা গঠিত হয়েছে। ح ও ب। حُبٌّ আরবি ভাষায় একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। আরবি ভাষার একটি সৌন্দর্য যে, এক-একটি শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– এই حُبٌّ (হুব্বুন) শব্দটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১ম অর্থ : الصَّفَا والبَيَاضُ পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতা। আরবের লোকেরা এই শব্দটিকে পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতার অর্থে ব্যবহার করে। যেমন– আরবরা দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতার বোঝাতে বলে থাকে حَبَبُ الْاَسْنَانِ মানে দন্তপাটির সুবিন্যস্ততা।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

২য় অর্থ : اَلْعُلُوُّ وَالظُّهُوْرُ সুউচ্চ হওয়া, উদ্ভাসিত হওয়া। এই حُبٌّ শব্দ থেকেই حُبَابٌ শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পানির বুদবুদ ও ফেনা। আপনাদের জানা আছে, পানির বুদবুদ ও ফেনার মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আছে।

৩য় অর্থ : اَللُّزُوْمُ وَالثَّبَاتُ যখন কোনো উট জিদ করে বসে যায়, উঠানোর চেষ্টা করেও উঠানো যায় না, তখন বলা হয় حَبَّ الْبَعِيْرُ যখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আর দাঁড়ায় না, তখন তার জন্যও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৪র্থ অর্থ : اَللُّبُّ এর অর্থ হলো সারাংশ মূল জিনিস। শব্দটি উর্দূ ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন–لُبِّ لُبَاب (সারকথা)।

৫ম অর্থ : اَلْحِفْظُ وَالْاِمْسَاكُ আটকে রাখা, সংরক্ষণ করা। পাত্রে পানি ঢালুন; পাত্র পানিকে আটকে রাখবে, গড়িয়ে পড়তে দেবে না, সংরক্ষণ করবে। এ-কারণেই আরবরা পানির পাত্র বোঝাতে বলে حُبُّ الْمَاءِ মানে পানির কলসি।

বাস্তবতা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলব, 'মহব্বত'-এর মধ্যে উল্লিখিত পাঁচটি গুণই বিদ্যমান। যেমন–

এক. 'মহব্বত' পরিচ্ছন্নতা চায়। অন্তরে অন্যের মেলামেশা সহ্য করে না। যদি একটা বিন্দুপরিমাণও অন্যের মহব্বত সেখানে আসে, তখন মাহবুব (প্রিয়তম) সহ্য করতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

দুই. মহব্বতের মধ্যে উচ্চতা ও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা আছে।

তিন. মহব্বতের মধ্যে স্থিরতা ও দৃঢ়তা ও আছে।

চার. মহব্বত অন্তরের সারাংশ।

পাঁচ. মহব্বত অন্তরকে ভরে দেয় আর অন্তর তা আটকে রাখে। যে অন্তরে মহব্বত থাকে, তার ওপর তা ছেয়ে যায়। তখন মহব্বতের কথা ছাড়া অন্তরে আর কিছুই ভালো লাগে না।

দুটি ইল্‌মি নুকতা

حُبٌّ শব্দটির মধ্যে দুটি ইল্‌মি নুকতা ও সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। প্রথমত ح হলক থেকে উচ্চারিত হয়। এটি হুরুফে হলকীর মধ্যে একটি। আর ب দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয়। একে হরফে শাফাবী বলে। এবার লক্ষ করুণ, ح মাখরাজের এক প্রান্ত হতে উচ্চারিত হয় এবং ب উচ্চারিত হয় অপর প্রান্ত হতে। এতে বোঝা গেল, মহব্বত এমন জিনিস, যার শুরুও হয় মাহবুব হতে এবং শেষও হয় মাহবুব পর্যন্ত গিয়ে। এ-কারণেই একে حُبٌّ বলে। এমনিতেও আপনি দেখবেন, যখন حب শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, তখন উভয় ঠোঁট পরস্পর মিলিত হয়। ঠিক এমনিভাবে মহব্বতও দুটি হৃদয়কে পরস্পরে মিলিয়ে দেয়।

এতে আরো একটি নুকতা রয়েছে। তা হলো, হরকত অর্থাৎ– যবর, যের, পেশ এই তিনটির মধ্যে যবরকে أخف الحركات তথা সবচেয়ে সহজ হরকত বলা হয়। এ-কারণেই ছোট শিশুরা যখন নতুন-নতুন কথা বলে, তখন এমন শব্দগুলো বলা তাদের জন্য সহজ হয়, যেগুলোর শুরুতে যবর থাকে। যেমন– আব্বা, আম্মা, আল্লাহ ইত্যাদি। এই শব্দগুলো শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি বলতে পারে। কিন্তু উক্ত হরকতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হরকত হলো পেশ, যাকে أشدالحركات (সব চেয়ে কঠিন হরকত) বলে। এবার দেখুন, حُبٌّ শব্দটির মধ্যে কোন হরকত আছে? পেশ। অর্থাৎ– সবচেয়ে কঠিন হরকত। এতে একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, حُبٌّ তথা মহব্বতের অবস্থার মধ্যে সর্বদা কঠিনতা ও প্রচণ্ডতা থাকে।

محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن
محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے
محبت کے انداز ہیں سب پرانے
خبردار ہو! اس میں جدت نہیں ہے

মহব্বত মহব্বত তো বলি, তবে
যাতে প্রচণ্ডতা নেই, তাকে মহব্বত বলে না।
মহব্বতের সকল ধরনই পুরাতন
মনে রেখো, এতে কোনো নতুনত্ব নেই।

মহব্বতের স্তরসমূহ

মহব্বতের কিছু স্তর রয়েছে। যেমন–

১. সম্পর্ক হওয়া। মহব্বতের প্রাথমিক অবস্থাকে عَلَاقَة বা সম্পর্ক বলে, যার অর্থ হচ্ছে, কারো সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক অনুভূত হওয়া।

২. ইচ্ছা হওয়া। অর্থাৎ– تعلق তথা সম্পর্কের কাইফিয়াত আরো একটু উন্নতি করলে তাকে 'ইচ্ছা' বলা হয়। বান্দা ইচ্ছাকৃতভাবে কারো দিকে মননিবেশ করে। একেই বলে–

هُوَمَيْلُ الْقَلْبِ اِلٰى مَحْبُوْبِه

'স্বীয় মাহবুবের দিকে অন্তর ঝুঁকে যাওয়া।'

৩. আকর্ষিত হওয়া। অর্থাৎ– ইচ্ছার কাইফিয়াত যখন আরো একটু উন্নতি লাভ করে, তখন তাকে اَلصَّبَابَةُ বলে। اَلصَّبَابَة অর্থ আকর্ষিত হওয়া, টান পড়া। যেমন– পানির মধ্যে সর্বদা নিম্নমুখী টান থাকে, গভীরতার দিকে আকর্ষণ থাকে। এমনিভাবে মাহফিলে লোকজন বসবে ঠিক; কিন্তু অন্তর এক দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে।

৪. অবশ্যক হয়ে যাওয়া। অবস্থার উন্নতির এটি চতুর্থ স্তর, যাকে الغرام বলা হয়। অর্থাৎ– আবশ্যক হওয়া, নিশ্চিত হওয়া। যেমন– কুরআনে কারীমে আছে–

اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

'তাঁর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।'[১]

৫. ভালোবাসা অনুভব হওয়া। অবস্থার যখন আরো উন্নতি সাধিত হয়, তখন একে 'الوِداد' বলে। আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একটি নাম রয়েছে 'الودود' উভয়টার মাদ্দা এক। এই মহব্বত যখন খাঁটি হয়, তখন তাকে وِدَاد বলে।

৬. অন্তরে গেঁথে যাওয়া। অর্থাৎ– অবস্থার যখন আরো উন্নতি হয়, তখন তাকে الشغف বলা হয়। شغف বলা হয় গেলাফ বা চাদরকে। অর্থাৎ– মহব্বত অন্তরের গেলাফ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৫

কুরআন মাজীদেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

'প্রেম তাকে উন্মাতাল করে ফেলেছে।'[১]

৭. ভালোবাসা হয়ে যাওয়া। সপ্তম স্তরকে العشق বলা হয়। কুরআন মাজীদে একস্থানে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রবল।'[২]

এ আয়াতে মহব্বতের যে প্রচণ্ডতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, এর অপর নাম عشق। হাদীছেও عشق শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উর্দূ ভাষায় তো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ই। হলুদ রঙের এক ধরনের তৃণলতা আছে, যাকে আরবি ভাষায় عشق বলে। কখনো-কখনো এই লতাগুলোকে গাছের ওপর লেপ্টে থাকতে দেখা যায়। এই লতাগুলো যে-গাছের ওপর বিস্তৃত হয়, সেই গাছকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। মানুষের ইশ্‌ক তথা ভালোবাসার ব্যাপারটাও এমনই। কারণ, ইশকের মধ্যে মানুষ কখনো-কখনো নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এ-কারণে কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে عشق শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। শুধু এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, মহব্বতের প্রচণ্ডতা থাকতে হবে, আত্মহারা হওয়া যাবে না। কিন্তু ইশ্‌ক জিনিসটিই এমন, যা মানুষকে আত্মহারা করে দেয়। এক বর্ণনায় এসেছে– 'একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট এক যুবককে আনা হলো। তিনি তাকে চিনতেন। যুবকটি শুকিয়ে এক তারিখের চাঁদের মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, কী হয়েছে তার? লোকেরা উত্তর দিল, তার ইশ্‌ক হয়েছে (ইশকের রোগে আক্রান্ত হয়েছে) এরপর থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) আরাফার ময়দানে দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! ইশ্‌ক থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

মানুষের এই ইশ্‌ক এতই খারাপ জিনিস যে, এতে আক্রান্ত ব্যক্তি দীন-দুনিয়া সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩০
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

৮. মহব্বতের অষ্টম স্তর হলো, اَلتَّيَّمُ وَهُوَالتَّعَبُّدُ অর্থাৎ– মানুষ তার প্রিয় ব্যক্তিকে নিজের অনুসরণীয় বানিয়ে তাকে পূজা করে, তাকে সেজদা করতে মনে চায়। তো মুমিন বান্দা আল্লাহ রব্বুল ইযযতকে যে-সেজদা করে, তা মহব্বতের এই কাইফিয়াতের কারণেই করে থাকে।

৯. উপাসনা করা। এর পরবর্তী স্তর হলো اَلتَّعَبُّدُ এ-কারণেই দাসত্ব করা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদার কাজ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও কুরআনে عبد তথা 'দাস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তো عبد শব্দটি ব্যবহৃত হওয়াও বিশেষ এক ধরনের মর্যাদার ব্যাপার।

১০. নিজের বন্ধু বানিয়ে নেওয়া। মহব্বতের সর্বশেষ স্তর হলো اَلْخُلَّةُ আল্লাহ রব্বুল ইযযত সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও নিজের খলীল বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও স্বীয় খলীল বানিয়েছিলেন। হাদীছে পাকে এসেছে, নবীজি ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীল বানিয়েছেন যেভাবে খলীল বানিয়েছিলেন ইবরাহীমকে। অন্যত্র ইরশাদ করেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا

'আমি যদি কাউকে খলীল বানাতাম, তাহলে আবুবকরকেই বানাতাম।

অবশেষে তিনি ইরশাদ করলেন–

وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ

'কিন্তু তোমাদের সাথী তো আল্লাহর খলীল, আল্লাহর বন্ধু।'

এটিই মহব্বতের সর্বোচ্চ মাকাম ও সর্বশেষ স্তর।

প্রকৃত মহব্বতকারীর চারটি নিদর্শন

আল্লাহ চান, বান্দা আমার সঙ্গে মহব্বত করুক আর আমি আমার বান্দার সঙ্গে মহব্বত করি। যেমন– তিনি একস্থানে ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ

'হে ঈমানদার বান্দারা! যদি তোমরা দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে খুব শীঘ্রই আল্লাহ এমন একটি জাতিকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যাদের তিনি মহব্বত করবেন আর তারাও তাঁকে মহব্বত করবে।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ নিজের পছন্দ বলে দিয়েছেন যে, আমি চাই তোমরা আমাকে মহব্বত কর আর আমিও তোমাদের মহব্বত করব। সামনে এমন বান্দাদের চারটি নিদর্শনও তিনি বলে দিয়েছেন–

প্রথম নিদর্শন : আল্লাহ বলেন–

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'তারা ঈমানদারদের সম্মুখে বিনয়ী হবে।'[২]

অর্থাৎ– যার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা থাকে, তার মধ্যে নম্রতা এবং বিনয়ও থাকে।

দ্বিতীয় নিদর্শন : ইরশাদ হচ্ছে–

أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

'কাফেরদের ওপর প্রভাবশালী ও বিজয়ী হবে।'[৩]

এ-বিষয়টি এক কবির ভাষায় এভাবে ফুটে উঠেছে–

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

'মুমিন যখন বন্ধুদের মাঝে অবস্থান করে, তখন সে মোমের মতো নরম। আর সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ের ময়দানে ইস্পাতের মতো কঠিন।'

এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং মুমিনদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[৪]

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪
২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪
৪. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৯

তৃতীয় নির্দশন : ইরশাদ হচ্ছে,

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

'তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।'[১]

এই 'জিহাদ' চার ধরনের হয়।

১. নিজের প্রবৃত্তি ও নফসের সঙ্গে জিহাদ। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ

'মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে।'

২ : কাফেরের সঙ্গে জিহাদ করা।

৩ : নিজের সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা।

৪ : নিজের মুখ ও যবান দ্বারা জিহাদ করা। যেমন– যেব্যক্তি অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলে, নিশ্চয়ই সে অনেক বড় মুজাহিদ। তো এ চার ধরনের জিহাদ করা মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ নিদর্শন : ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

'...এবং তারা নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পায় না।'[২]

যেমন– আজকাল দীনের ওপর মজবুতভাবে আমলকারীদের তথাকথিত 'মুক্তচিন্তা'র লোকেরা নিন্দা করে থাকে। সুযোগ পেলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যেও পিছিয়ে থাকে না– আরে! এ যে মোল্লার বেশ ধরেছে! কী ব্যাপার; মোল্লা হয়ে গেলে নাকি? ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য এখন অহরহ চলছে। দীনদার লোকদের এসব নিন্দা ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। তারা শুধু আল্লাহর জন্য হাসিমুখে তা সহ্য করে নেন।

ভালোবাসার বিনিময়ে ভালোবাসার উপহার

এক হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

'আমার বান্দা আমার ফরজ বিধানগুলো আদায়ের মাধ্যমে যতটা নৈকট্য াভ করে, অন্য কোনো আমল দ্বারা ততটা নৈকট্য লাভ করতে পারে না।'

একেই قَرَب بالفرائض বলা হয়। তবে-

وَلَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ

'আর আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার এতটা নৈকট্য অর্জন করে য, আমি তাকে মহব্বত করতে শুরু করি।'

দেখুন! আপনার ড্রাইভার আট ঘণ্টা আপনার সঙ্গে কাজ করে। এতে কিন্তু আপনার অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা তৈরি হয় না। কিন্তু যদি সে টিতে গিয়ে ফেরার পথে কোথাও ভালো মধু পেয়ে আপনার জন্য এক বাতল ক্রয় করে এনে বলে, এই নিন স্যার! আপনার জন্য এনেছি; খুব গালো মধু, আমাদের এলাকার মধু। তো আপনি তাকে মধুর মূল্যও পরিশোধ করছেন, আবার অন্তরে তার জন্য ভালোবাসাও অনুভব করছেন। কেন? কারণ, সে তার ডিউটির বাইরে ব্যক্তিগত সময়ে আপনার জন্য কাজ করেছে। নফল ইবাদতগুলোর অবস্থাও ঠিক এমন। নফল নামাযে বান্দা তার ব্যক্তিগত সময়ে আল্লাহর বন্দেগিতে লিপ্ত হয়। এ-কারণেই তার বিনিময়ে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। এরপর বান্দা আল্লাহর কতখানি নিকটে চলে যায়? ইরশাদ হচ্ছে–

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ

আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে।

وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ

আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে।

وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا

আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে।

وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا

আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।

وَلَئِنْ سَأَلَنِى لَأُعْطِيَنَّهُ

আর যদি সে আমার কাছে (করুণা) চায়, তা হলে অবশ্যই আমি তাকে দান করে থাকি।

সুবহানাল্লাহ!

এটিই মহব্বতের মাকাম। আপনি চিন্তা করে দেখুন, বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঘোষণা করছেন, আমি তার কান হয়ে যাই, আমি তার চোখ হয়ে যাই, আমি তার হাত হয়ে যাই! আল্লাহু আকবার কাবীরা!

একজন মুমিন বান্দার জন্য এর চেয়ে আর বেশি মর্যাদার কিছুই হতে পারে না যে, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইযযত তার সঙ্গে মহব্বত করেন।

আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে বৃদ্ধি পায়

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কিছু আমল এমন রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

১. কুরআনের তেলাওয়াতের দ্বারা।

ভালোবাসা বৃদ্ধির প্রথম আমল ও উপায় হলো–

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ

'পবিত্র কুরআন চিন্তাভাবনা ও গভীর নিমগ্নতার সাথে তেলাওয়াত করা।'

এতে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। পরিষ্কার কথা, প্রিয়তমের সঙ্গে যে পরিমাণ কথোপকথন হবে, ভালোবাসাও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কারণ, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার সমকক্ষ।

২. নফল নামাযের দ্বারা।

আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় ও আমল হলো–

التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ

'ফরজ ইবাদতের পর নফল ইবাদতসমূহ আদায় করার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।'

তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আউওয়াবীন, তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল-উজু, সালাতুশ-শুকর, সালাতুল-হাজাত। যখনই সুযোগ হবে, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দরবারে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবেন। এর কারণ কী? কারণ হলো, আমরা জানি না, কোন স্থানের সেজদা, কোন সময়ের সেজদা আল্লাহর ভালো লেগে যায় আর আমাদের প্রতি তিনি করুণার দিষ্টিতে তাকান।

তো নফল নামায ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে নিজের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি করুন।

৩. অধিক পরিমাণে যিকিরের দ্বারা।

আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টির তৃতীয় আমল ও উপায় হলো–

دَوَامُ ذِكْرِهٖ عَلٰى كُلِّ حَالٍ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ

'সর্বদা মুখেও আল্লাহর যিকির রাখবে, মনে-মনেও আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে।'

কারণ, অধিক পরিমাণে যিকির করলে যার নামে যিকির করা হয়, তাঁর জন্য অন্তরে বিশেষ ধরনের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যার নাম আপনি উচ্চারণ করতে থাকবেন, তাঁর জন্য অন্তরে এক ধরনের মহব্বত অনুভব করবেন। যেমন– কেউ যদি আপনার সম্মুখে আইসক্রীমের আলোচনা শুরু করে, তাহলে উপস্থিত সকলের মন চাইবে, যদি তা পেয়েও যেতাম, তা হলে কতই-না ভালো হতো! এ-কারণেই আল্লাহ রব্বুল ইযযত স্বীয় বান্দাদের অধিক পরিমাণে যিকির করতে আদেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো।'[১]

কারণ, অধিক পরিমাণে যিকিরের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের মহব্বতে তীব্রতা সৃষ্টি হয়। এমনকি হাদীছে আদেশ হয়েছে, 'তোমরা মহব্বতের সাথে আল্লাহকে এত পরিমাণ ডাকতে থাকো, যেন লোকেরা বলে, আরে! এ তো দেখছি পাগল হয়ে গেছে।'

এই হাদীছে মূলত পাগলামির স্তর পর্যন্ত পৌঁছে আল্লাহকে ভালোবাসার তালীম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

এক ধরনের সম্পর্ক আছে, যাকে আইনগত সম্পর্ক বলে। আরেক ধরনের সম্পর্ককে বলে উন্মাদনার সম্পর্ক। আইনগত সম্পর্কের অর্থ হলো, স্বামী-স্ত্রী আছেন ঠিকই; কিন্তু একজনের সঙ্গে অপরজনের মেজাজ ও রুচির মিল নেই। স্বামীর মন লেগে থাকে অন্য কোথাও; অথচ ঘরে অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী! ব্যস! সন্তানের মা; এজন্য এক সাথে বসবাস করে। অন্যথায় এক সাথে

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

বসে খাওয়াদাওয়া, কথাবার্তা বলা কিংবা হাসিঠাট্টা করা সব বন্ধ। মাসিক খরচের টাকা দিয়ে দিলাম; সংসার চালাও, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করো। বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে স্বামী-স্ত্রী উভয় মিলে অংশগ্রহণ করছে। ঘরে মেহমান এলে স্বামী-স্ত্রী উভয় মিলে আপ্যায়নও করছে। মহিলা ঘরের সকল কাজকর্ম সম্পাদন করছে। পুরুষও নিয়মিত সাংসারিক খরচপাতি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও হৃদ্যতা নেই। মানুষের চোখে তা বৈবাহিক সম্পর্ক মনে হলেও বাস্তবে তা অন্তঃসারশূন্য। একে আইনগত সম্পর্ক বলে।

অপর এক ধরনের সম্পর্ক আছে, যার নাম উন্মাদনার সম্পর্ক, যার অর্থ হলো, বিবাহ করেছে পছন্দমতো। শুরুতে তো এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে যে, তাকে ছাড়া কিছুতেই মন বসে না, কিছুই ভালো লাগে না। পূর্বে অফিসে পৌঁছে যেত সকাল দশটায়। এখন বারোটা বেজে যায়। গিয়েই প্রথম ফোনটি ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে না করে স্ত্রীকে করে। মধ্যখানে দু-চারজন ব্যবসায়ীকে ফোন করে পুনরায় স্ত্রীকে কল করে। এরপর আগে তো সন্ধ্যায় ঘরে ফিরত আর এখন বিকাল তিনটায়ই হাজির। কখনো-কখনো মা-বাবার সঙ্গে বসে কথা বলার সুযোগটুকুও পায় না। যুবকদের বিয়ের প্রথম বছর তো এভাবেই কেটে যায়।

তো আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমার বান্দারা! তোমরা আমার সঙ্গে সাংবিধানিক সম্পর্ক তো রাখবেই। কারণ, আমি তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু আমার ইচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে উন্মাদনার সম্পর্কও রাখো। যখন বসে থাক, তখনও স্মরণে থাকি, যখন দাঁড়িয়ে থাক, তখনো স্মরণে থাকি- চলতে, ফিরতে সর্বদা তোমাদের অন্তরজুড়ে আমারই স্মরণ হোক, আমারই কল্পনা হোক। আমার স্মরণে তোমরা উদাস হও, আমার ভাবনায় হও বিভোর। আমার স্মরণেই তোমার চোখ অশ্রুশিক্ত হোক, আমার ভয়েই তোমার হৃদয় কাঁপুক। আমারই ভালোবাসায় তোমার অন্তর আলোড়িত হোক। মোটকথা, যা কিছুই কর, সর্বদা আমার স্মরণে ডুবে থাকো। এমনকি তোমরা নিম্নোক্ত আয়াতের নমুনা হয়ে যাও–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলুন হে নবী! আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই মহান প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'[১]

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১৬২

আল্লাহ বান্দার নিকট এমন সম্পর্কই আশা করেন। আর অন্তরের এই অবস্থা অধিক পরিমাণে যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আমাদের শায়েখগণ সালেকদের নিজ খানকায় রেখে কিছুদিন অধিক পরিমাণে যিকির করার অভ্যাস গড়ে তুলতেন। মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হওয়ার দীক্ষা দিতেন। কারণ, আল্লাহ বলেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

'আপনি আপনার রবের নামের যিকির করুন এবং তার দিকেই পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করুন।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ تبتل শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ পরিপূর্ণ মনোনিবেশ। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আল্লাহমুখী না হওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ অনুভূত হবে না। অতএব যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়তে চায়, আবার অন্তর এদিক-সেদিকও লেগে থাকে, তা হলে মহব্বতের স্বাদ সে কখনো লাভ করতে পরবে না। এই ব্যক্তি রসমী কথা যদিও বলতে পারবে, কিন্তু অন্তরের সেই অবস্থা থাকবে না যেমনটা থাকা উচিত ছিল।

'আল্লাহর যিকির' মানুষকে মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বীয় মালিকের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এ-কারণেই কিছু তরুণ ও যুবক ছেলে যারা নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নষ্ট প্রেমের মায়াবী জালে আটকে যায়, তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় বেশি-বেশি আল্লাহর যিকির। যিকিরের কারণে আল্লাহ স্বয়ং তার অন্তরের পরিস্থিতি বদলে দেন। যে অন্তরে কোনো মাখলুকের প্রেম প্রভাব বিস্তার করে ছিল, তা আপনাআপনি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পরিশেষে আল্লাহর মহব্বত সেখানে বিজয়ী হয়ে যায়।

৪. মাহবুবের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার দ্বারা।

আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির চতুর্থ আমল ও উপায় হলো–

إِيْثَارُ مَحَابِّهِ عَلٰى مَحَابِّكَ عِنْدَ غَلَبَاتِ الْهَوٰى

'যখন নিজের অন্তরের বাসনাগুলো পূরণ করার প্রচণ্ড ইচ্ছা হবে, তখন প্রকৃত মাহবুব (আল্লাহ)-এর ইচ্ছাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সে মোতাবেক আমল করা উচিত। নিজের ইচ্ছাগুলোকে এভাবে কুরবানি করার দ্বারা মানুষ

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৮

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসা পেয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, অন্তর তো চায় একটু আরাম করি; কিন্তু হঠাৎ কোনো দীনি কাজ এসে পড়ল অথবা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করার দ্বারা কোনো দীনি ফায়দা হবে বলে মনে হলো, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আরামকে পরিত্যাগ করবেন। দেখবেন, এই কুরবানির কারণেই অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বাড়তে থাকবে।

৫. আল্লাহর ৯৯ নাম ও সিফাতের মধ্যে চিন্তাভাবনার দ্বারা।

আল্লাহর ভালোবাসা সমৃদ্ধ হওয়ার পঞ্চম আমলটি উল্লেখ করে বলা হয়,

مُطَالَعَةُ الْقَلْبِ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ

'আল্লাহর নাম ও গুণাবলির মধ্যে চিন্তাভাবনা করা।'

ভাবতে হবে, আল্লাহ রব্বুল ইযযত কেমন এবং কোন-কোন গুণে গুণান্বিত। স্পষ্ট কথা হলো, যার মধ্যে যত বেশি পরিমাণ গুণ থাকবে, বান্দা তার সঙ্গে তত বেশি মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাছাড়া আল্লাহ তো নিজ গুণাবলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অদ্বিতীয়। সুতরাং আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সিফাত ও গুণাবলি নিয়ে চিন্তা করলে মুমিন বান্দার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা আরো বেশি পরিমাণে তৈরি হবে।

৬. আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্যে চিন্তা করার দ্বারা।

আল্লাহর মহব্বত বাড়ানোর ষষ্ঠ আমল ও উপায় হলো–

مُشَاهَدَةُ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ وَآلَائِهِ

'আল্লাহর করুণা, ইহসান ও নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা করা।'

আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অগণিত। তিনি আমাদেরকে চাওয়া ব্যতীতই অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি আমাদেরকে

দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তা হলে আমরা অন্ধ হতাম।

যদি বাকশক্তি না দিতেন, তা হলে আমরা বোবা হতাম।

যদি শ্রবণশক্তি না দিতেন, তাহলে বধির হতাম।

যদি মাথায় চুল না দিতেন, তবে টাক হতাম।

যদি হাত-পা সুস্থ না হতো, তাহলে পঙ্গু হতাম।

যদি পোশাক না দিতেন, তা হলে উলঙ্গ থাকতাম।

যদি খাবার-পানি না দিতেন, তা হলে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকতাম।

যদি ঘরবাড়ি না দিতেন, তা হলে আশ্রয়হীন ও যাযাবর হয়ে জীবন যাপন করতাম।

যদি সন্তান না দিতেন, তা হলে আমরা নিঃসন্তান থাকতাম।

যদি সম্পদ না দিতেন, তা হলে মিসকিন থাকতাম।

যদি সুস্থতা না দিতেন, তা হলে রুগ্ন থাকতাম।

যদি সম্মান না দিতেন, তা হলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত থাকতাম।

আজ আমরা যে-সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন অতিবাহিত করছি, তা কেবল সেই দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহেই হচ্ছে। আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সেই দয়া ও অনুগ্রহগুলো নিয়ে চিন্তা করি। কত নেয়ামত তিনি আমাদেরকে দান করেছেন! অন্তরও তো চায় নিজের অনুগ্রহশীল দয়াময় প্রভুর সঙ্গে মহব্বত করতে। কেননা,

اَلْاِنْسَانُ عَبْدُ الْاِحْسَانِ

'মানুষ অনুগ্রহকারীর গোলাম হয়ে যায়।'

৭. ভাঙা মন দ্বারা।

আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি করার সপ্তম আমল ও উপায় হলো–

وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِهَا اِنْكِسَارُ الْقَلْبِ بِكُلِّيَاتِهِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالٰى

'বান্দা যখন এভাবে ভাঙা মন নিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দরবারে হাজিরা দিতে থাকবে, তখন আল্লাহর মহব্বতও তার অন্তরে জায়গা করে নিতে থাকবে।

৮. নির্জনে অশ্রু ঝরিয়ে দু'আ করার দ্বারা।

অষ্টম আমলটি কী?

তা হলো–

اَلْخَلْوَةُ بِهِ وَقْتَ النُّزُوْلِ الْاِلٰهِيِّ لِمُنَاجَاتِهِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِهِ

'নীরবে-নির্জনে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করবে এবং বেশি-বেশি কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত করবে।'

নির্জনতার এই দু'আগুলোতে কী চাইবেন? আল্লাহর নিকট তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসা চাইবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এর শিক্ষাও দিয়েছেন।

কী দু'আ শিখিয়েছেন?

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত প্রার্থনা করছি।'

تیرے عشق کی تنہائی چاہتا ہوں

مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں

'তোমার প্রেমের নির্জনতা চাই,

আমার সরলতা দেখো যে, কী চাই আমি।'

এজন্য মানুষের উচিত, তারা যেন আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসা বেশি-বেশি প্রার্থনা করে। এরপর এমন কাজ করে, যা তার সন্তুষ্টি পাওয়ার কারণ হবে।

৯. আল্লাহপ্রেমীদের সান্নিধ্য গ্রহণের মাধ্যমে।

নবম যে-আমলটির মাধ্যেমে আল্লাহর মহব্বত অর্জিত হয়, তা হলো–

مُجَالَسَةُ الْمُحِبِّيْنَ الصَّادِقِيْنَ

'খাঁটি আল্লাহপ্রেমীদের ছোহবত অবলম্বন করা।'

দেখুন, লোহার টুকরাকে যখন চুম্বকের কাছে নেওয়া হয়, তখন লোহার মধ্যেও চুম্বকের বৈশিষ্ট্য চলে আসে। এমনিভাবে আল্লাহওয়ালাদের অন্তরও চুম্বকের মতো। তারা আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসায় চুম্বকের মতো হয়ে যায়। আর এ-কারণে যেকোনো লোকই এসে যখন তাদের সাহচর্য গ্রহণ করে, তখন তাদের অন্তরেও সেই চুম্বকত্ব চলে আসে। যেমন– জলন্ত প্রদীপের সঙ্গে প্রদীপ লাগাও; দেখবে সেটাও আলোকিত হয়ে গেছে।

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کردے

یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

'নিজের অন্তরটাকে প্রজ্বলমান হৃদয়ের কাছাকাছি করে দাও।

এই আগুন নিজে-নিজে লাগে না, লাগাতে হয়।'

এ আগুন নিজে নিজেই লাগে না। কোনো আলোকিত প্রদীপের সঙ্গে প্রদীপ ঘষতে হয়। এরপর আল্লাহ অন্তরের বাতি জালিয়ে দেন।

তো বলছিলাম, আল্লাহপ্রেমীদের অল্প কিছুক্ষণের সাহচর্য মানুষের অন্তরের আঁধার বিদূরিত করে দেয়। অন্তরে যে অন্ধকার ও ময়লা জমে যায়, তাতে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য এমনই একটি নেয়ামত। এ-কারণে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'[১]

দেখুন, এই كُوْنُوْا শব্দটি আমরের সিগা (নির্দেশবাচক ক্রিয়া)। আদেশের সুরে বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহপ্রেমীদের সঙ্গে বসো, যেন মহব্বতের স্বাদ তোমরাও উপলব্ধি করতে পার।

১০. আল্লাহর পথে আসা বাধা ডিঙানোর দ্বারা ।

আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করার দশম আমল ও উপায় হলো–

مُبَاعَدَةٌ كُلِّ سَبَبٍ يَحُوْلُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ اللهِ

'প্রত্যেক এমন বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যা বান্দার অন্তর ও আল্লাহর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে।'

তা যা-ই হোক তাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। কারণ, তা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

আমাদের মাশায়েখগণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন–

وَهِيَ مَحَبَّةٌ تَنْبُتُ مِنْ مُطَالَعَةِ الْمِنَّةِ وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَنْمُوْ عَلَى الْإِجَابَةِ بِالْفَاقَةِ

'এই ভালোবাসা অন্তরে অঙ্কুরিত হয় তখন, যখন আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের মধ্যে চিন্তাভাবনা করা হয়। আর তা-অন্তরে দৃঢ়ভাবে জমে যায় তখন, যখন মানুষ সুন্নতের অনুসরণ করে। আর এই ভালোবাসা কবুলিয়্যাতের দিকে ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত থাকার দ্বারা।'

মানুষ যখন নফল রোযা রাখে, তখন আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা অন্তরে আরো ভালোভাবে জমে বসে। এর কারণ হলো, পেট ভরা থাকলে প্রবৃত্তির চাহিদা বেড়ে যায়। আর প্রবৃত্তির চাহিদা মানুষকে মাখলুকের

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

আসক্তির দিকে টেনে নেয়। পক্ষান্তরে খালি পেট ও ক্ষুধার্ত থাকার কারণে প্রবৃত্তির চাহিদা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, আনন্দ-ফূর্তি ফিকে হয়ে যায় এবং অন্তর অটোমেটিকলি আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। পাশাপাশি ক্ষুধার্ত থাকার কারণে মানুষের মধ্যে বিনয়-নম্রতাও এসে যায়।

এক বুযুর্গ ক্ষুধার্ত থাকার খুব ফজিলত বর্ণনা করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, হযরত! বড় আশ্চর্যের কথা! এটিও কি একটি ফজিলতের ব্যাপার হলো? বুযুর্গ উত্তরে বললেন, হাঁ! যদি ফেরাউনও কখনো ক্ষুধার কষাঘাত সহ্য করত, তা হলে সে কখনো খোদা হওয়ার দাবি করত না। বাস্তবতাও তা-ই যে, যে ক্ষুধার্ত থাকে সে বিনয়ী ও সংযমী থাকে। সে তার অতীত ও মর্যাদার কথা স্বরণ রাখে যে, আমি কতটুকু পানির মধ্যে আছি।

আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার তিনটি নিদর্শন

বান্দা যখন আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত করে, তখন আল্লাহও বান্দার সঙ্গে মহব্বত করতে থাকেন। এখন কীভাবে বোঝা যাবে যে, কোন বান্দার সঙ্গে আল্লাহ মহব্বত করেন, তাকে ভালোবাসেন? তো ওলামায়ে কেরাম এমন তিনটি নিদর্শন লিখেছেন, যা দ্বারা খুব সহজেই বোঝা যাবে, আল্লাহ অমুক বান্দার সঙ্গে মহব্বত করেন।

১. পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা : প্রথম নিদর্শন হলো–

اَلْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ

পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাঈল (আ.)কে ডাকেন।'

আল্লাহ জিবরাঈল (আ.)-এর ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পন করে রেখেছেন। যেমন–

নবীগণের হেফাযত করা।

ঈমানদারদের সাহায্য করা।

রাসূলগণের কাছে ওহী নিয়ে অবতরণ করা।

এমনিভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর অপর একটি দায়িত্ব হলো ঘোষণা করা। তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে ঘোষণা প্রদান করেন। আমাদের মসজিদগুলোতে যেমন আযান হয়, নামাযের ঘোষণা হয় এবং ঘোষক বা মুআয্যিন যে সে হয় না, বরং এর জন্য লোক নির্দিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন জিবরাঈল (আ.)কে ডাক দেন।

فَقَالَ: إِنِّيْ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ

'এরপর আল্লাহ জিবরাঈল (আ.)কে বলেন, 'আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি (সে-ও আমাকে ভালোবাসে)। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।'

তারপর জিবরাঈল (আ.) তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। কারণ, সে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র।

ثُمَّ يُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ

এরপর তিনি ঊর্ধ্বাকাশে ঘোষণা করে বলেন, 'আল্লাহ তাঁর অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তারপর আসমানবাসী ফেরেশতারা উক্ত বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এমনিভাবে তিনি (জিবরাঈল আ.) যমীনে এসেও এরূপ ঘোষণা করেন। তারপর দুনিয়াবাসী লোকদের অন্তরও তার প্রতি ঝুঁকে যায় এবং তাকে ভালোবাসতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাকে কবুলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করেন। এভাবে সবার অন্তরগুলোকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়া হয়। আর তারা যে শুধু ওপরে-ওপরে ভালোবাসে তা কিন্তু নয়, বরং হৃদয়ের গভীর থেকে তাকে ভালোবাসে। সবগুলো মন তার দিকে ঝুঁকতে থাকে আর সে অন্ত রসমূহের জন্য চুম্বক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটিই আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসার নিদর্শন।

২. পরীক্ষা : আল্লাহর ভালোবাসার দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, তিনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে কখনো-কখনো পরীক্ষাও করেন। আর এই পরীক্ষার ব্যাপারটা বুঝেও আসে। আপনি পাঁচ টাকা দিয়ে তরমুজ ক্রয় করে টোকা মেরে দেখেন, ভেতরে কাঁচা, না পাকা। এমনিভাবে পনেরো টাকা দিয়ে মাটির পাত্র ক্রয় করে তাতে টোকা মেরে দেখেন, পাত্রটা কাঁচা, না পাকা।

আমরা যেমন দশ-পনেরো টাকার জিনিসকে টোকা মেরে দেখি, তা কাঁচা, না পাকা, আল্লাহও টোকা মেরে দেখেন, বান্দা কাঁচা, না পাকা! দুধ পানকারী লোকটি পাগল নয় তো আবার? এ-কারণে আল্লাহ তার এমন প্রিয় বান্দাদের প্রতি কখনো-কখনো বিপদাপদ পাঠিয়ে দেন এবং দেখেন, এমন কঠিন-মুহূর্তে আমার বান্দা কী করে? এ-সংক্রান্ত একটি হাদীছ আছে। হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ عَظْمَ الجَزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ

'বড় পরীক্ষার বিনিময়ে বড় পুরস্কার পাওয়া যায়। আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের প্রতি (পরীক্ষাস্বরূপ) বিপদাপদ পাঠিয়ে দেন। তারপর যে (এই অবস্থাতেও) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর যে অসন্তুষ্ট হয়, (হায়! আল্লাহ এ কী করলেন?) তো আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

৩. খাতেমা বিল খায়ের (অন্তিম মুহূর্তে নেকির ওপর থাকা) : যাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা থাকে, তাদের তৃতীয় নিদর্শন হলো,

اَلْمَوْتُ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ

'আল্লাহ এমন লোকদেরকে সর্বদা উত্তম মৃত্যু দান করেন।'

তাদের খাতেমা বিল খায়ের হয়। যেমন– হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدَهُ قَالُوا : وَمَا عَسَلَهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِهِ حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهُ جِيْرَانُهُ وَمَنْ حَوْلَهُ

'আল্লাহ বান্দাকে যখন ভালোবাসেন, তখন তাকে মধুময় করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'মধুময়' হওয়ার অর্থ কী? তখন নবীজি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাকে ভালো কাজের তাওফীক এমনভাবে দান করেন যে, আশপাশের লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (আর এই জনপ্রিয়তার অবস্থায়ই আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন।)

বোঝা গেল, উত্তম মৃত্যুও এ-কথার প্রমাণ বহন করে যে, এই বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি রয়েছে। আমাদের খুব কাছের বন্ধুদের একজন, যিনি আমাদের খুব খোঁজখবর রাখতেন; আমাদের এক বন্ধুর পিতাও হন; এই ফকিরকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তার মনের একটাই ইচ্ছা ছিল, প্রতি বছর হজ করবে; প্রতি রমযানে ওমরাহ করবে। তিনি জীবনে ৫৩ বার হজ করেছেন। তার মাথার সমস্ত চুল সাদা ছিল। আর এই অধমের সব চুল ছিল কালো। তিনি অধমকে বলতেন, জনাব! আপনি আমার বন্ধু। একথাটা শুনলে আমার খুব লজ্জা লাগত! এমন বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বন্ধু বলছেন! কিন্তু বলতেন, 'আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি'।

তার নেক জীবন ও তাকওয়ার প্রতিদানে আল্লাহ তাকে মসজিদে নববীতে, ইতেকাফ অবস্থায়, রিয়াদুল জান্নায়, আসরের নামাযের সময়, সেজদাহরত অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। তো যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, তাদের তিনি এমন সৌভাগ্যের মৃত্যু দান করে থাকেন।

আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার ৬টি আলামত

আমরা কীভাবে বুঝব, বান্দা আল্লাহকে মহব্বত করে, ভালোবাসে? তো এরও কয়েকটি আলামত রয়েছে।

১. আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ : সর্বপ্রথম আলামত হলো,

حُبُّ لِقَاءِ اللهِ

'অর্থাৎ– যে বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা হবে, তার মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সীমাহীন আগ্রহও থাকবে।'

হাদীছে এসেছে,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ

'যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ রাখে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন।'

২. নির্জনে মুনাজাত : দ্বিতীয় আলামত হলো,

أَنْ يَكُوْنَ أُنْسُهُ بِالْخَلْوَةِ وَمُنَاجَاتِ اللهِ تَعَالَى

'বান্দার কাছে নির্জনে বসে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে খুব ভালো লাগে।'

এই কথাটি সাদামাটা শব্দে এভাবেও বলা যায় যে, সেই বান্দার জায়নামাযের সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে যায়। নয়তো, জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসা তো অনেক বড় বিপদ বলেই মনে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুরাকাবা করেছেন? তো উত্তর আসে, জি, দু-তিন মিনিট মোরাকাবা করি। এই যে মোরাকাবা আমাদের কাছে বোঝা মনে হয়, তেলাওয়াত বোঝা মনে হয়, নামায বোঝা মনে হয় এতে অনুমান করা যায় আমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত কতটুকু! মহব্বত যখন বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন জায়নামায ছাড়তে ইচ্ছেই হবে না।

শুধু বসে থাকতেই মন চাইবে।

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے

'মন খুঁজে ফিরছে আবারও সেই অবসরের রাত-দিন।

সেই চিন্তা-ই মাথায় নিয়ে আমি বসে থাকি।'

এমন লোক তখন লম্বা মুরাকাবা করে, খুব নফল পড়ে, রাত জেগে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে। তাদের নিকট কোলাহল থেকে নির্জনতা-ই বেশী ভালো লাগে।

৩. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা : তৃতীয় আলামত কী?

أَنْ يَّكُوْنَ الْعَبْدُ صَابِرًا عَلَى الْمَكَارِهِ

'যে বান্দা বিপদে ধৈর্যধারণ করবে।'

অর্থাৎ– তখন সে এ কথার মিসদাক হয়ে যায়-

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

অর্থাৎ– যদি বিপদও এসে পড়ে, তাতে নিরাশ হয় না; বরং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি রাজি ও খুশি থাকে আর মনে-মনে বলে, হে আল্লাহ!

ترا غم بھی مجھ کو عزیز ہے

کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

'তোমার ভাবনা আমার খুবই প্রিয়। কারণ, সে তো তোমারই দেওয়া বস্তু।'

৪. প্রিয়তমের স্মৃতিচারণে হৃদয় আন্দোলিত হওয়া : চতুর্থ আলামত হলো,

اَلْمُحِبُّ الصَّادِقُ إِذَا ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا وَجِلَ قَلْبُهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'প্রকৃত প্রেমিকের সামনে কেউ যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন তার অন্তরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় এবং চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। যখনই কেউ তার সামনে আল্লাহর কথা আলোচনা করে, তখন তার অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

اک دم بھی محبت چھپ نہ سکی
جب تیرا کسی نے نام لیا

'যখন কেউ তোমার নামটা উচ্চারণ করে, তখন একটা মুহূর্তও তোমার ভালোবাসা আমার থেকে আলাদা হতে পারে না।

প্রকৃত ভালোবাসার এটাও একটা আলামত যে, যখন অন্তরে আল্লাহর স্মরণ আসে, তখন চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কবি কি সুন্দর বলছেন-

آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑیں
آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں

'তোমার কথা মনে পড়তেই চোখদুটা সিক্ত হয়ে গেল।
অশ্রু তোমার স্মরণের কতই-না নিকটে!

৫. আল্লাহর কালামের সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে যাওয়া : আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার পঞ্চম আলামত হলো,

مَحَبَّةُ كَلَامِ اللهِ

'আল্লাহর কালামের সঙ্গে মহব্বত।'

এমন বান্দা কুরআন তেলাওয়াত করতে খুবই পছন্দ করে।

مَنْ أَحَبَّ مَحْبُوْبًا كَانَ كَلَامُه أَحَبَّ شَيْئٍ إِلَيْه

'বান্দা যাকে ভালোবাসে, তার কথাই তার কাছে সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। এ-কারণেই আল্লাহর কালাম তার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে।

৬. নিজের রিয়াজত ও সাধনাকে স্বল্প মনে করা : ষষ্ঠ আলামত হলো–

أَنْ يَسْتَقِلَّ فِيْ حَقِّ مَحْبُوْبِهِ جَمِيْعَ أَعْمَالِهِ وَلَا يَرَاهَا شَيْئًا

'সে যতটুকু ইবাদতই করে, যে-পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা-ই করে, করতে-করতে অবশেষে একথা বলে যে, 'আমি তো কিছুই করলাম না।'

এর প্রমাণ হলো নবীজির ইরশাদ,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! হক আদায় করে যেভাবে ইবাদত করা উচিত ছিল, আমি সেভাবে ইবাদত করতে পারিনি।'

হযরত ইমামে আযম আবূ হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত ঈশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তারপর হারাম শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাওয়াফ করলেন, মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন। কিতাবে লেখা আছে, উক্ত দু-রাকাতে পুরো কুরআন মজীদ খতম করে সালাম ফেরালেন। এরপর হাত তুলে দু'আ করলেন–

إِلٰهِيْ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

আমাদের বড়রা এত ইবাদত-মুজাহাদা করার পরও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনার ইবাদতের হক আদায় করে ইবাদত করতে পারিনি!

'মহব্বত' প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

আসুন, এবার মহব্বত প্রসঙ্গে ওলামায়ে মুহিব্বীন কী বলেছেন, তাদের বক্তব্যগুলো শোনা যাক। এতে মহব্বতের ধরন ও প্রকৃতি বোঝা সহজ হবে। কেউ-কেউ বলেছেন,

١ . اَلْمَحَبَّةُ : اَلْمَيْلُ الدَّائِمُ بِالْقَلْبِ الْهَائِمِ

'মহব্বত হলো তৃষিত হৃদয় নিয়ে অন্তর সর্বদা প্রিয়তমের প্রতি ঝুঁকে থাকা।

هَائِمٍ অর্থ পিপাসিত, তৃষিত। যেমন– কুরআন মাজীদে আছে,

فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ

অর্থাৎ- অন্তর তৃষ্ণিত থাকে ॥ আর সেই তৃষ্ণার কারণেই সে সর্বদা প্রিয়তমের দিকে মনোযোগী হয়ে থাকে ॥[১]

২. اِيْثَارُ الْمَحْبُوْبِ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَحْبُوْبِ

'মহব্বত' হলো, যা কিছু বান্দার নিকট আছে, তার সবটুকুই সে নিজের প্রিয়তমের জন্য উৎসর্গ করে ॥'

৩. مُوَافَقَةُ الْحَبِيْبِ فِى الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيْبِ

'সে প্রিয়তমের আনুগত্য করে ॥ চাই সে সামনে থাকুক কিংবা পেছনে ॥'

৪. مَحْوُ الْمُحِبِّ لِصِفَاتِهِ وَاثْبَاتُ الْمَحْبُوْبِ لِذَاتِهِ

'প্রেমিকের ব্যক্তিগত সকল গুণাগুণ বিলীন হয়ে যায় এবং প্রিয়তমের গুণাগুণ ও স্বভাব তার মধ্যে এসে যায় ॥

৫. مُوَطَّأَةُ الْقَلْبِ لِمُرَادَتِ الْمَحْبُوْبِ

'প্রিয়তমের ইচ্ছাসমূহের অনুকূলে মনকে মানিয়ে নেওয়া ॥'

৬. خَوْفُ تَرْكِ الْحُرْمَةِ مَعَ اِقَامَةِ الْخِدْمَةِ

'মানুষ প্রিয়তমের সেবা করে, কিন্তু ভালোবাসার কারণে এ ভয়েও থাকে, পাছে তার সম্মানে কোনো ত্রুটি না হয়ে যায় ॥'

৭. اِسْتِقْلَالُ الْكَثِيْرِ مِنْ نَفْسِكَ وَاسْتِكْثَارُ الْقَلِيْلِ مِنْ حَبِيْبِكَ

'প্রেমিক প্রিয়তমের জন্য যা কিছুই করুক তাকে সে কমই মনে করে ॥ কিন্তু প্রিয়তম যদি সামান্য কিছুও করে, তবে তাকে অনেক কিছু মনে করে ॥

৮. اِسْتِكْثَارُ الْقَلِيْلِ مِنْ جِنَايَتِكَ وَاسْتِقْلَالُ الْكَثِيْرِ مِنْ طَاعَتِكَ

'গুনাহ সামান্য হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা আর নেকি বড়-বড় করলেও তা- ক্ষুদ্র মনে করা ॥

৯. مُعَانَقَةُ الطَّاعَةِ وَمُبَايَنَةُ الْمُخَالَفَةِ

'আনুগত্যের সঙ্গে গলা মিলায় এবং অবাধ্যতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ॥ ফলে সে আর মাহবুবের অবাধ্যতা করতে পারে না ॥

---

১. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৫৫

১০. دُخُوْلُ صِفَاتِ الْمَحْبُوْبِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ صِفَاتِ الْمُحِبِّ

'প্রেমিকের স্বভাব-গুণের মধ্যে প্রিয়তমের স্বভাব-গুণ আসতে থাকে। অর্থাৎ– যার সাথে ভালোবাসা হয়, তার স্বভাব, ঢং ও আখলাক প্রেমিকের মধ্যে প্রবেশ করে।

১১. اَنْ تَهَبَ كُلَّكَ لِمَنْ اَحْبَبْتَ فَلَا يَبْقٰى لَكَ فِيْ شَيْءٍ

'তুমি তোমার সর্বস্ব প্রিয়তমের জন্য উৎসর্গ করার কারণে নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকা।

যেমন– হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় নিজের সব কিছু এনে চাঁদার জন্য হাজির করেছেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো, ঘরে কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।'

১২. اِقَامَةُ الْعِتَابِ عَلَى الدَّوَامِ

'প্রিয়তমের ভর্ৎসনা তার ওপর স্থায়ী হওয়া।'

অর্থাৎ– যদি প্রিয়তম ক্রোধের মধ্যেও থাকে, তাহলে সে এই ক্রোধকে সয়ে নেয়। প্রিয়তমের সৌন্দর্য যেমন ভালো লাগে, তার তেজও ভালো লাগে। যেমন– কেউ একজন বলেছিল, 'প্রিয়তম যখন হাসে, তখন তো তাকে সুন্দর লাগেই, যখন রাগান্বিত হয়, তখন আরো বেশি সুন্দর লাগে।

কবি বলেন–

نہ شوخی چل سکی باد صبا کی
بگڑنے میں بھی زلف ان کی بنادی

'প্রভাতবায়ুর দুষ্টুমিও তার কাছে অচল। এলোমেলো করার পরিবর্তে দুষ্টু বায়ু উল্টো তার চুলগুলো গুছিয়ে দিল।'

১৩. أَنْ تَغَارَ عَلَى الْمَحْبُوْبِ أَنْ يُحِبَّهُ مِثْلَكَ

'প্রিয়তমের ব্যাপারে এই মর্যাদাবোধ থাকা যে, মহব্বত শুধু আমার সাথে হবে। আমি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে মহব্বত হতে পারবে না।'

১৪. اِرَادَةٌ غُرِسَتْ اَغْصَانُهَا فِي الْقَلْبِ فَاَثْمَرَتِ الْمُوَافَقَةُ وَالطَّاعَةُ

'মনে ভাবনা জাগে আর অমনি মনের মাঝে বৃক্ষ ডালপালা গজায়। তারপর তার আনুগত্যের ফল ফলায়।'

١٥. أَنْ يَنْسَى الْمُحِبُّ حَظَّهُ فِيْ مَحْبُوْبِهِ

'প্রিয়তমের নিকট তার কোনো চাহিদা থাকে না।'

١٦. مَجَانَبَةُ السَّلْوِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

'মানুষ সর্বাবস্থায় প্রশান্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

অর্থাৎ– প্রেমিকের অন্তর কখনো-কখনো অশান্ত হয়ে ওঠে। তার ভয় হয়, পাছে প্রিয়তম অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। আমার কোনো ভুল না হয়ে যায়। অন্তর অস্থির-অশান্ত হয়ে থাকে। এরই অপর নাম মহব্বত বা ভালোবাসা।

١٧. تَوْحِيْدُ الْمَحْبُوْبِ بِخَالِصِ الْاِرَادَةِ وَصِدْقِ الطَّلَبِ

'অত্যন্ত আন্তরিকতা ও গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রিয়তমের একত্ববাদকে স্বীকার করে নেওয়া।

١٨. سُقُوْطُ كُلِّ مَحَبَّةٍ مِنَ الْقَلْبِ اِلَّا مَحَبَّةُ الْحَبِيْبِ

'প্রিয়তমের ভালোবাসা ব্যতীত অন্তর থেকে অন্য সব কিছুর মহব্বত দূর হয়ে যাওয়া।

١٩. غَضُّ طَرْفِ الْقَلْبِ عَمَّاسِوَى الْمَحْبُوْبِ غَيْرَةً وَعَنِ الْمَحْبُوْبِ هَيْبَةً

'মর্যাদাবোধের কারণে প্রেমিক প্রিয়তমের ওপর হতে দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে ফেরায় না। আবার প্রিয়তমের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করে না তার প্রভাব ও প্রতাপের কারণে। প্রকৃত মহব্বতে এমনটা-ই হয়।

٢٠. اَلْمَحَبَّةُ نَارٌ فِي الْقَلْبِ تَحْرِقُ مَاسِوَى مُرَادِ الْمَحْبُوْبِ

'মহব্বত অন্তরের এমন জ্বলন্ত আগুন, যা মহব্বতের লক্ষ্য ব্যতীত অন্য সব কিছুকে জ্বালিয়ে দেয়।

٢١. اَلْمَحَبَّةُ بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ وَتَرْكُ الْاِعْتِرَاضِ عَلَى الْمَحْبُوْبِ

'মহব্বত চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রশ্নক্ষেপণ পরিহার করার নাম।'

٢٢. سُكْرٌ لَايَصْحُوْ صَاحِبُهُ اِلَّا بِمُشَاهَدَةِ مَحْبُوْبِهِ

'মহব্বত এমন একটা নেশা ও উন্মাদনা, যা প্রিয়তমের সাক্ষাৎ ব্যতীত বান্দাকে হুঁশেই আসতে দেয় না।

٢٣. اَنْ لَايُؤْثِرَ عَلَى الْمَحْبُوْبِ غَيْرَهٗ

'বান্দা প্রিয়তম ব্যতীত অন্য কাউকে গুরুত্ব দেয় না।'

٢٤. اَلدُّخُوْلُ تَحْتَ رِقِّ الْمَحْبُوْبِ وَعُبُوْدِيَّتِهٖ

'প্রিয়তমের গোলামি ও বন্দেগিতে চলে আসা।'

٢٥. اَلْمَحَبَّةُ سَفَرُ الْقَلْبِ فِيْ طَلَبِ الْمَحْبُوْبِ

'মহব্বত প্রিয়তমের সন্ধানে হৃদয়ের পথে চলা।'

٢٦. اِنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مَالَايَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ وَلَاتَزِيْدُ بِالْبِرِّ

'মহব্বত এমন জিনিস, যা অকৃতজ্ঞতার কারণে হ্রাস পায় না। আবার পুণ্যের কারণে বাড়েও না।

কবি বলেন–

الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو

ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں وفا ہو

'প্রেমাস্পদ মান্য করুক বা অবাধ্য হোক, তাতে ভালোবাসায় কোনো ঘাটতি আসে না। সবকিছুতেই স্বাদ আছে যদি মনে আনুগত্য থাকে।'

٢٧. اَلْمَحَبَّةُ أَنْ يَكُوْنَ كُلُّكَ بِالْمَحْبُوْبِ مَشْغُوْلاً وَكُلُّكَ لَهٗ مَبْزُوْلاً

'প্রকৃত মহব্বতের দাবি হলো, তুমি প্রিয়তমের ধ্যানে পরিপূর্ণ ডুবে যাবে এবং এ-কাজে নিজেকে পূণ সমর্পণ করবে।

প্রকৃত ভালোবাসার ধরন হাদীছের আলোকে

এবার আসুন, আমরা ভালোবাসার এই ধরনটি একটু হাদীছের আলোকে পর্যালোচনা করি।

হযরত যুন্নুন (রহ.) বলেন–

أُوْحِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى : يَامُوْسٰى ! كُنْ كَالطَّيْرِ الْوَحْدَانِيْ يَأْكُلُ مِنْ رُءُوْسِ الْاَشْجَارِ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ اِذَاجَنَّهُ اللَّيْلُ اَوٰى اِلٰى كَهْفٍ من الْكُهُوْفِ اِسْتِئْنَاسًا بِيْ

وَاسْتِيْحَاشًا مِمَّنْ عَصَانِيْ يَامُوْسٰى ! اِنِّيْ اَلَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ اَنْ لَا اُتِمَّ لِمُدْبِرٍ عَنِّيْ عَمَلًا، وَلَاُقَطِّعَنَّ اَمَلَ كُلِّ مُؤْمِلٍ غَيْرِيْ، وَلَاُقَصِّمَنَّ ظَهْرَمَنِ اسْتَنَدَ اِلٰى سِوَايَ وَلَاُطِيْلَنَّ وَحْشَةَ مَنِ اسْتَأْنَسَ بِغَيْرِيْ، وَلَاُعْرِضَنَّ عَنْ مَنْ أَحَبَّ حَبِيْبًا سِوَايَ يَامُوْسٰى اِنَّ لِيْ عِبَادًا اِنْ نَاجَوْنِيْ اَصْغَتُّ اِلَيْهِمْ، وَاِنْ نَادَوْنِيْ اَقْبَلْتُ عَلَيْهِمْ وَاِنْ اَقْبَلُوْا عَلَيَّ اَدْنَيْتُهُمْ، وَاِنْ دَنَوْا مِنِّيْ قَرَّبْتُهُمْ، وَاِنْ تَقَرَّبُوْا مِنِّيْ اِكْتَنَفْتُهُمْ، وَاِنْ وَالَوْنِيْ وَالَيْتُهُمْ، وَاِنْ صَافُوْنِيْ صَافَيْتُهُمْ، وَاِنْ عَمَلُوْا لِيْ جَازَيْتُهُمْ، اَنَامُدَبِّرُ اُمُوْرِهِمْ وَوَسَائِسُ قُلُوْبِهِمْ وَاَحْوَالِهِمْ لَمْ اَجْعَلْ لِقُلُوْبِهِمْ رَاحَةً اِلَّا فِيْ ذِكْرِيْ

'আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ করলেন, হে মূসা! আপনি একটি নিঃসঙ্গ পাখির মতো হয়ে যান, যে গাছের ডাল হতে ফল খায়, স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন পানি পান করে, যখন রাত হয়, তখন কোনো গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে ভালোবাসা অবস্থায় আর যে আমার সঙ্গে নাফারমানি করে, তার ব্যাপারে ক্ষতির অশঙ্কা নিয়ে।

হে মূসা! আমি নিজের ওপর অবশ্যক করে নিয়েছি, আমার দিকে পিঠ প্রদর্শন করে যে চলে যাবে, আমি তার কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে দেব না। আর যে গাইরুল্লাহর নিকট কিছু পাওয়ার বিশ্বাস রাখে, আমি তার আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হতে দেব না। যে আমি ব্যতীত গাইরুল্লাহর দিকে ঝুঁকে যাবে, আমি তার মেরুদণ্ড ভেঙে দেব। যে গাইরুল্লাহর সঙ্গে মহব্বত রাখবে, আমি তার আতঙ্ক কেটে যেতে দেব না এবং যে আমি ব্যতীত অন্যকে প্রিয়তম বানাবে, আমি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করব না।

হে মূসা! আমার কিছু বান্দা এমন আছে, যখন তারা মুনাজাত করে, তখন আমি তাদের দিকে ঝুঁকে যাই। যখন তারা আমার নিকটবর্তী হয়, আমি তাদের দিকে মনোনিবেশ করি। যখন তারা আমার নিকটে আসে, আমি তাদের আরো নিকটে চলে আসি। তারা যখন আমার নিকটে আসে, তখন তাদের আমি নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে নিই। তারা আমার নিকটে আসতেই আমি তাদের ঢেকে নিই। (অর্থাৎ– আমার রহমত তাদের ঢেকে নেয়)। যদি তারা আমার তত্ত্বাবধানে আসে, আমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে যাই। তারা যদি আমার সঙ্গে আন্তরিক হয়, আমিও তাদের প্রতি আন্তরিক হই। তারা যদি আমার জন্য নেক আমল করে, তাহলে তাদের আমি পুরস্কার

দান করি। আমিই তাদের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করি। আমিই তাদের অন্ত র ও অবস্থার নেগরানি করি। আমি আমার যিকির ব্যতীত প্রশান্তিদায়ক আর কোনো কিছুই রাখিনি। যদি প্রশান্তি থাকে, তবে আমার যিকিরের সঙ্গেই আছে। অর্থাৎ– প্রকৃত ভালোবাসায় বান্দার অবস্থা হয় এমন যে, চতুর্দিক থেকে তার দৃষ্টি সরে আসে এবং একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনের দিকে তাওয়াজ্জুহ সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) একদিন একব্যক্তিকে বললেন–

يَاأَخِيْ تُحِبُّ اَنْ تَكُوْنَ لِلّٰهِ وَلِيًّا وَيَكُوْنَ لَكَ مُحِبًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : دَعِ الدُّنْيَا وَأَقْبِلْ عَلٰى رَبِّكَ بِقَلْبِكَ يُقْبِلْ عَلَيْكَ بِوَجْهِهٖ، فَإِنَّهٗ بَلَغَنِيْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْحٰى اِلٰى يَحْيٰى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، يَايَحْيٰى اِنِّيْ قَضَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ أَنَّهٗ لَايُحِبُّنِيْ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِيْ أَعْلَمُ ذَالِكَ مِنْ نِيَّتِهٖ اِلَّا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ وَفُؤَادَهُ الَّذِيْ يَعْقِلُ بِهٖ ، فَاِذَا كُنْتُ كَذَالِكَ بَغَّضْتُ اِلَيْهِ أَنْ يَّشْتَغِلَ بِغَيْرِيْ وَادَمْتُ فَكْرَهٗ وَاَسْهَرْتُ لَيْلَهٗ وَاَظْمَأْتُ نَهَارَهٗ ، اَنْظُرُ اِلَيْهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ نَظْرَةً ، فَأَرٰى قَلْبَهٗ مَشْغُوْلًا بِيْ فَازْدَادَ مِنْ حُبِّهٖ وَ اَمْلَأُ قَلْبَهٗ نُوْرًا حَتّٰى يَنْظُرُ بِنُوْرِيْ ، فَكَيْفَ يَسْكُنُ يَا يَحْيٰى قَلْبُهٗ وَاَنَا جَلِيْسُهٗ وَغَايَةُ اُمْنِيَّتِهٖ ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَاَبْعَثَنَّهٗ مَبْعَثًا ثُمَّ اُمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِيْ : هٰذَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَصَفِيُّهٗ ، دَعَا اِلٰى زِيَارَتِهٖ فَاِذَا جَاءَنِيْ رُفِعَتِ الْحِجَابُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ

'ভাই! তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, তুমি আল্লাহর ওলী হয়ে যাও এবং আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন? তিনি বললেন, হাঁ। ইবনে আদহাম বললেন, তাহলে তুমি দুনিয়া ত্যাগ করো। দুনিয়া ত্যাগ করা অর্থ এই নয় যে, তুমি বৈরাগী হয়ে যাও। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করাকেই দুনিয়াত্যাগ বলে এবং তুমি অন্তর দিয়ে আল্লাহমুখী হও। আল্লাহও সন্তুষ্টি নিয়ে তোমার দিকে তাকাবেন। ('তুমি আল্লাহকে অন্তর দাও' কথাটি এজন্য বলা হয় যে, আল্লাহ বান্দার নিকট অন্তর চান, তিনি অন্তরের ব্যাপারী। অথচ বাস্তবতা হলো, বান্দার হাত তো থাকে আল্লাহর দিকে আর অন্তর থাকে অন্য কোথাও।)

আমি শুনেছি, আল্লাহ হযরত ইয়াহয়া (আ.)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ করেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বান্দা যদি অন্তর থেকে প্রকৃত অর্থে আমাকে ভালোবাসে, তাহলে আমি তার কান হয়ে যাব, যা দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চোখ হয়ে যাব, যা দিয়ে সে দেখবে। আমি তার অন্তর হয়ে যাব, যা দিয়ে সে চিন্তা করবে। যখন অবস্থা এ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, তখন আমি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে তার সম্পর্ককে অসহ্য আর তার ধ্যানকে দীর্ঘ করে দিই। (অর্থাৎ– রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে) যার অন্তরে আমার জন্য গভীর ভালোবাসা থাকে, এমন বান্দার দিকে আমি দৈনিক সত্তরবার ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাই। আল্লাহু আকবার!

যদি আল্লাহ রব্বুল ইযযত একবার আমাদের অন্তরের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকান, তবে তো আমাদের বেড়া পার হয়ে যাবে। কবি বলেন–

بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلہ دل کا

'ব্যস, এক পলকেই সিদ্ধান্ত স্থির হলো যে, মুগ্ধতা নিয়ে তাকাও– মনের কোনো অভিযোগই আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

'যে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার দৃষ্টি একবার পড়বে, সে কখনো অপছন্দের পাত্র হতে পারে না। যাকে তিনি একবার ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখবেন, সে কবুল হয়ে যাবে। আমাদের মু'আমালা তো আল্লাহর এক পলক কিংবা অর্ধপলক দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।'

তারপর যখন দেখি, তার অন্তর শুধু আমার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে, তখন তার ভালোবাসাকে আরো বৃদ্ধি করে দিই এবং তার অন্তরকে আমার নূর দিয়ে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিই যে, সে আমার নূর দিয়েই দেখে। (একেই বলে বাতেনি নূর, নূরে ফিরাসাত তথা ঈমানি ফিরাসাত)

হে ইয়াহয়া! সেই অন্তর কীভাবে প্রশান্ত হতে পারে, আমি যার সঙ্গী হই এবং সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হই?

এরপর তিনি আরো আশ্চর্যের কথা বললেন–

'আমার ইযযতের কসম, আমার ক্ষমতার কসম, যে আমার এমন পছন্দের বান্দা হবে, তাকে আমি কেয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাব যে, লোকেরা তাকে দেখে ইর্ষা করতে থাকবে। তারপর আমি ঘোষককে আদেশ করব, ঘোষণা করে দাও–

'এই ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু ও পছন্দের বান্দা। তিনি তাকে নিজের দিদার করাতে ডেকেছেন। তারপর সেই বান্দা যখন আমার কাছে আসবে, আমি তার ও আমার মাঝের সকল পর্দা সরিয়ে দেব।' (এবং আমার দিদারে তাকে ধন্য করব।))

সুবহানাল্লাহ! কল্পনা করুন, কি আনন্দঘন মুহূর্ত হবে সেটি! এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে কার মনইবা চায় না! আসুন, আমরাও আমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এমনভাবে বসিয়ে নিই, যেন আমরাও আল্লাহর পর্দাহীন দিদার লাভে ধন্য হতে পারি।

ভালোবাসার অন্তর নিজেই কথা বলে

যখন আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের গভীরে বসে যায়, তখন বান্দাকে কিছু শিখিয়ে দিতে হয় না।

কবি বলেন–

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھاتی ہے

তখন অন্তর নিজে-নিজেই কথা বলে, শিখিয়ে দেওয়া লাগে না। ভালোবাসা-ই তাকে বলায়।

এ-কারণেই বান্দা

কখনো দোহাই দিয়ে কথা বলে।

কখনো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

কখনোবা আল্লাহর নিকট মুনাজাতে লিপ্ত হয়।

মোটকথা, প্রতিটি শব্দ থেকে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসা গুঞ্জরিত হতে থাকে।

রাবেয়া বসরি (রহ.)-এর খোদাপ্রেমের কাহিনি

রাবেয়া বসরি (রহ.)-এর নাম হয়ত আপনারা শুনেছেন। তিনি আল্লাহর একজন মাকবুল বান্দী ছিলেন। একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) তাঁর নিকট গেলেন এবং কথা প্রসঙ্গে তার উপস্থিতিতেই বলে উঠলেন–

اَللّٰهُمَّ اَرْضَ عَنِّيْ

'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।'

রাবেয়া বসরি (রহ.) বললেন–

اَمَا تَسْتَحْيِيْ مِنَ اللهِ أَنْ تَسْئَلَهُ الرِّضَا وَاَنْتَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ

'আশ্চর্য! তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি আল্লাহর নিকট তার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছ! অথচ তুমি নিজেই আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট নও!'

অর্থাৎ– তুমি চাচ্ছ, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। অথচ তুমি নিজেই তো আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নও! তিনি যখন একথা বললেন, তখন হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বললেন,

اَسْتَغْفِرُ اللهَ

'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।'

قَالَ جَعْفَرُ : فَقُلْتُ لَهَا : مَتٰى يَكُوْنُ الْعَبْدُ رَاضِيًا عَنِ اللهِ تَعَالٰى

জা'ফর বলেন, আমি রাবেয়া বসরি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, বান্দা কখন তার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট বলে প্রমাণিত হবে?

فَقَالَتْ : اِذَا كَانَ سُرُوْرُهُ بِالْمُصِيْبَةِ مِثْلَ سُرُوْرِهِ بِالنِّعْمَةِ

তিনি উত্তর দিলেন, 'বান্দা যখন (আল্লাহর পক্ষ হতে আসা) বিপদে ততটা খুশি প্রকাশ করে, যতটা সে (আল্লাহর পক্ষ হতে আসা) নেয়ামত পেয়ে খুশি হয়।'

এই হলো মহব্বত! এই হলো ভালোবাসা! আল্লাহু আকবার!

ইবনুল জাওযী (রহ.) একজন বড় মাপের মুহাক্কিক ও সচেতন আলেম ছিলেন। তিনি রাবেয়া বসরিয়া (রহ.)-এর নিকট গেলেন। মজার কথা শুনুন! আজ যারা (লা মাযহাবীরা) বলে, আমরা কারো কথা মানি না, তারা কিন্তু ইবনুল জাওযী (রহ.)কে নিজেদের ইমাম মানে। তাদের এই ইমাম কিন্তু সেকালের বুযুর্গদের নিকট যেতেন। (অথচ তার অনুসারীরা বুযুর্গদের ব্যাপারে কি সঠিক কাজ করছেন? না)

যাহোক তিনি বললেন–

دَخَلْتُ عَلٰى رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةَ فِيْ بَيْتِهَا وَكَانَتْ كَثِيْرَةَ الْبُكَاءِ فَقَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَهَا آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ فِيْهَا ذِكْرُ النَّارِ فَصَاحَتْ ثُمَّ سَقَطَتْ

'আমি রাবেয়া আদবিয়্যাহ (বসরিয়্যাহ)-এর নিকট তার বাড়িতে গেলাম। তিনি খুব ক্রন্দনকারিণী এক নারী ছিলেন। (ভালোবাসায় মানুষ

প্রিয়তমের স্মরণে কাঁদবে না তো কী করবে?) তখন তার সম্মুখে একব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করল, যাতে জাহান্নামের আগুনের আলোচনা রয়েছে। তিনি (আগুনের আলোচনা শুনে) চিৎকার করে উঠলেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর অবস্থাও এমনই ছিল।

হাদীছে পাওয়া যায়, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এক সাহাবি এসে পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়ত বাঁধলেন। নবীজি দাঁড়িয়ে যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

'আমার কাছে আছে শিকল ও প্রজ্বলিত আগুন। আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।'[১]

এই আয়াত শুনে সাহাবি সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাদের পক্ষে এমন আয়াত শোনার পর সহ্য করা অসম্ভব হয়ে যায়।

এবার রাবেয়া বসরিয়া (রহ.)-এর একটি বিস্ময়কর কথা শুনুন। একটু অন্তরের কানে শুনবেন। মহব্বতওয়ালারা কেমন বিস্ময়কর কথা বলে থাকেন! তিনি তার মুনাজাতে বলছিলেন–

إِلٰهِي! أَتُحْرِقُ بِالنَّارِ قَلْبًا يُحِبُّكَ

'হে প্রভু আমার! আপনি কি এমন অন্তরকে আগুনে জ্বালাবেন, যে আপনাকে ভালোবাসে?'

فَهَتَفَ بِهَا هَاتِفٌ! مَا كُنَّا نَفْعَلُ هٰكَذَا فَلَا تُظْنِّي بِنَا ظَنَّ السَّوْءِ

'সঙ্গে-সঙ্গে এক ঘোষক ঘোষণা দিল, (গায়েবি শব্দে উত্তর এল) আমি কখনো এমন করব না, আমার প্রতি তুমি কুধারণা পোষণ করো না।'

এই খোদাভীতি মানুষকে কাঁদতে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মানযূর (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন–

دَخَلْتُ عَلَى رَابِعَةَ وَهِيَ سَاجِدَةٌ، فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِمَكَانِيْ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَذَا مَوْضِعُ سُجُوْدِهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْتَنْقَعِ مِنْ دُمُوْعِهَا، فَسَلَّمْتُ، فَأَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَقَالَتْ يَابُنَيَّ لَكَ

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ১২, ১৩

حَاجَةٌ ؟ فَقُلْتُ : جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكِ، قَالَ : فَبَكَتْ وقَالَتْ ! سَتْرُكَ اَللّٰهُمَّ سَتْرُكَ، وَدَعَتْ بِدَعَوَاتٍ ثُمَّ قَامَتْ اِلَى الصَّلَاةِ وَانْصَرَفَتْ

'আমি রাবেয়া বসরিয়া (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি তখন নামাযে সেজদারত ছিলেন। যখন তিনি অনুভব করলেন, আমি এসেছি, তখন সেজদা হতে মাথা তুললেন। আমি তার সেজদার স্থানের (কপালের) দিকে তাকালাম। চোখের পানিতে তা কাদামাখা হয়ে আছে (সেজদায় তিনি এত কেঁদেছিলেন) তিনি (নামাযের) সালাম ফেরালেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা! কোনো প্রয়োজনে এসেছ কি? আমি বললাম, হাঁ! আপনাকে সালাম জানানোর জন্য এসেছি। একথা শুনে তার চোখ ভিজে গেল (যে, এ তো আমাকে আল্লাহওয়ালী মনে করে সালাম জানাতে এসেছে)। বললেন, হে আল্লাহ! তুমিই তো আমার পাপগুলো গোপন করে রেখেছ। (এ হলো আল্লাহওয়ালাদের হৃদয়ের অবস্থা। লোকেরা হাতে চুমু খায়, জুতা সোজা করে দেয় আর তাঁরা অন্তরে-অন্তরে অল্লাহর নিকট দু'আ করে, 'হে মালিক! এসব যা কিছু হচ্ছে, সবই আপনার সিফাতে সাত্তারীর (দোষ গোপন করা) সদকা। আপনি গোপন করেছেন বলেই এরা আজ মহব্বতপূর্ণ আচরণ করছে।) বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি আমাকে কিছু দু'আ দিলেন। তারপর পুনরায় নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

তো আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা দেখুন যে, তাঁর আসার পূর্বেও আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিলেন আবার তাঁর চলে যাওয়ার পরও আল্লাহর ধ্যানে মাশগুল হয়ে গেলেন।

প্রেমমাখা প্রার্থনা

তিনি রাতে কী দু'আ করতেন জানেন? সুবহানাল্লাহ! সে আরেক বিস্ময়কর ব্যাপার।

শুনুন তাহলে–

وذُكِرَ عَنْ رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا صَلَّتِ الْعِشَاءَ، قَامَتْ عَلَى سَطْحٍ لَهَا وشَدَّتْ عَلَيْهَا دِرْعَهَا وَخِمَارَهَا، ثُمَّ قَالَتْ : اِلٰهِيْ ! أَنَارَتِ النُّجُوْمُ، وَنَامَتِ الْعُيُوْنُ، وَغَلَّقَتِ الْمُلُوْكُ أَبْوَابَهَا وَخَلَا كُلُّ حَبِيْبٍ بِحَبِيْبِهٖ وَهٰذَا مَقَامِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ

'রাবেয়া আদবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তিনি ঈশার নামায শেষ করতেন, তখন নিজের ঘরের ছাদে উঠতেন, গায়ে ওড়না ও চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে নিতেন (যেমন– কেউ কোনো কাজ করার পূর্বে নিজের জামাকাপড় ভালোভাবে গুটিয়ে নেয়) তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! তারকারাজি আলো ছড়াচ্ছে, চোখগুলো ঘুমে ভেঙে পড়েছে, পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এবং সকল প্রেমিক তার প্রিয়তমের নিকট পৌঁছে গেছে। হে আল্লাহ! আমি এই মুহূর্তে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একথার অর্থ কী? অর্থাৎ– আপনি আমার প্রিয়তম আর আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। সুবহানাল্লাহ!

বলুন তো, আমরা কি কখনো এমন প্রেমময় অনুভূতি নিয়ে দু-চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়েছি? গভীর রাতে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে কখনো কি এভাবে বলেছি, হে আল্লাহ! রাত হয়ে গেছে। সবাই তার পছন্দের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। হে আল্লাহ! আপনার এই অধম বান্দাও আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে?

আসলে অন্তরে ভাব সৃষ্টি হলে মুখে এমন শব্দমালা ফুটে ওঠে। তার মুখের ভাষা-ই বলে দিচ্ছিল যে, তার অন্তরে কী পরিমাণ ভালোবাসা ছিল।

ثُمَّ تُقْبِلُ عَلٰى صَلَاتِهَا، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ السَّحَرِ وَمَطْلَعِ الْفَجْرِ قَالَتْ إِلٰهِيْ! هٰذَا اللَّيْلُ قَدْ أَدْبَرَ، وهٰذَا النَّهَارُ قَدْ أَسْفَرَ، فَلَيْتَ شِعْرِيْ! أَقَبِلْتَ مِنِّي لَيْلَتِيْ فَأُهَنِّئَنِيْ ؟ أَمْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ فَأُعَزِّيْ؟

'তারপর তিনি তার নামাযে মনোনিবেশ করতেন। যখন ভোর হতো এবং সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে আসত, তখন বলতেন, আহ! যদি জানতে পারতাম, আপনি আমার ইবাদত কবুল করেছেন কি-না! করলে নিজেকে ধন্যবাদ দিতাম। আর যদি জানতাম, আমার ইবাদত আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাহলে নিজের জন্য শোক করতাম (হায় আফসোস! আমার কষ্টের ইবাদত প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে।)'

সুবহানাল্লাহ! এমন শব্দ কাদের মুখ থেকে বের হয়? যার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা থাকে, এমন শব্দ তার মুখ থেকেই বের হয়। সামনে তো আরো আশ্চর্যের কথা বলেছেন।

فَوَعِزَّتِكَ، لَوْ طَرَدْتَنِيْ عَنْ بَابِكَ مَا بَرِحْتُ عَنْهُ لِمَا وَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مِنْ مَحَبَّتِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার ইযযতের কসম! আপনার দরজা থেকে যদি আমাকে তাড়িয়েও দেন, তারপরও আমি আপনার দরজা ছাড়ব না। কারণ, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

ادھر تو در نہ کھولیگا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا

حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری

'ওখানে তুমি দরজা খুলবে না। এখানে আমি দরজা ছাড়ব না।

এ তো নিজ-নিজ ক্ষমতা। কোথাও তোমার, কোথাও আমার।'

এ কেবল মহব্বত ও ভালোবাসার কারণেই সম্ভব যে, মানুষ তার প্রতিপালকের দরজায় আঁচল বিছিয়ে বসে। এমনকি আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করাও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

মহব্বত : মানসূর ইবনে হাল্লাজের দৃষ্টিতে

যখন মানসূর ইবনে হাল্লাজকে হত্যা করার সময় এল, তখন তার যে অবস্থা হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিতাবে আছে–

أَنَّهُمْ حَبَسُوْهُ ثمانية عشر يومًا فجاءه الشِّبلى فَقَالَ: يَامَنْصُوْر! مَاالمحبَّةُ؟ فَقَالَ: لاتسئلنى اليومَ واسئلنى غَدًا فَلَمَّاجَاءه الغَدُ وأخرجوه مِنَ السجن وَنَصَبُوْا النِّطعَ لِأَجْلِ قَتلِه مَرَّ الشِّبْلِيُ بَيْنَ يَدَيْه فَنَادى: يَاشِبْلِيُ! المَحَبَّةُ أَوَّلُهَاحَرَقٌ وآخِرُهَاقَتْلٌ

তাকে লোকেরা আঠারো দিন জেলখানায় বন্দি করে রেখেছিল। তার কাছে তার বন্ধু শিবলী এসে জিজ্ঞাসা করল, মানসূর! মহব্বত কী জিনিস? তিনি উত্তরে বললেন, আজ এ প্রশ্নটি করো না, কাল করো! পর দিন যখন তাকে জেলখানা হতে বের করা হলো এবং তাকে হত্যা করার জন্য আসন তৈরি করা হলো, তখন বন্ধু শিবলী এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। তখন মানসূর তাকে দেখে বললেন, শিবলী! 'মহব্বতের সূচনা হয় আগুনে জ্বলা দিয়ে আর এর সমাপ্তি হয় হত্যা দিয়ে।' অর্থাৎ– প্রিয়তমের নামে জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে। কী আশ্চর্য! প্রিয়তমের নামে জীবন উৎসর্গ করেও আল্লাহর ইহসান স্বীকার করে বলছে, আল্লাহ আমার ওপর দয়া করেছেন।

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'জীবন যেটা দিলাম, সে তোমারই দান ছিল। সত্য কথা হলো, হক আদায় হয়নি।'

আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মহারা এক যুবকের গল্প

আমাদের ভাগ্যে যদি আল্লাহর প্রকৃত মহব্বতের এক বিন্দু কিংবা অর্ধ বিন্দুও জুটে যায়, তাতেও আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এক যুবকের ঘটনা শুনুন।

مَرَّ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَابٍّ يُسْقِيْ بُسْتَانًا ، فَقَالَ الشَّابُّ لِعِيْسٰى ! سَلْ رَبَّكَ أَنْ يَرْزُقَنِيْ مِنْ مَحَبَّتِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَاتُطِيْقُ مِقْدَارَ ذَرَّةٍ فَقَالَ : نِصْفَ ذَرَّةٍ، فَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ ! اُرْزُقْهُ نِصْفَ ذَرَّةٍ مِنْ مَحَبَّتِكَ، فَمَضٰى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ مَرَّ بِمَحَلِّ ذَالِكَ الشَّابِّ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا : جَنَّ وَذَهَبَ اِلَى الْجِبَالِ ، فَدَعَا اللهُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُرِيَهُ اِيَّاهُ فَرَاٰهُ بَيْنَ الْجِبَالِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا عَلٰى صَخْرَةٍ شَاخِصًا طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَنَا عِيْسٰى ، فَأَوْحَى اللهُ اِلٰى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَيْفَ يَسْمَعُ كَلَامَ الْاٰدَمِيِّيْنَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِقْدَارَ نِصْفِ ذَرَّةٍ مِنْ مَحَبَّتِيْ فَوَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَالِكَ

'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একবার এক যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যুবক তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। সে হযরত ঈসা (আ.)কে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন তার ভালোবাসা থেকে একটা বিন্দুপরিমাণ ভালোবাসা আমাকে দান করেন। ঈসা (আ.) বললেন, তুমি একটা বিন্দুপরিমাণ ভালোবাসা বরদাশত করতে পারবে না। পুনরায় সে বলল, তাহলে অর্ধবিন্দু! ঈসা (আ.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাকে আপনার ভালোবাসা হতে অর্ধবিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা দান করুন। (দু'আ কবূল হয়ে গেল)

হযরত ঈসা (আ.) চলে গেলেন। বহু দিন পর পুনরায় হযরত ঈসা (আ.) সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যুবকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি লোকদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিল, সে তো

(আল্লহর ভালোবাসায়) পাগল হয়ে গেছে এবং ওই পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। হযরত ঈসা (আ.) দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তাকে দেখতে চাই। আমাকে তার অবস্থান দেখিয়ে দিন। তারপর তিনি দেখলেন, যুবক একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে মুনাজাত করছে। হযরত ঈসা (আ.) তাকে সালাম দিলেন। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। তিনি পুনরায় বললেন, 'আমি ঈসা! ততক্ষণে আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠালেন, 'হে ঈসা! সেই বান্দা কী করে মানুষের কথা শুনতে পারে, যার অন্তরে আমার ভালোবাসার অর্ধবিন্দু বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহু আকবার! ঈসা! আমার ইযযতের কসম খেয়ে বলছি, আমার জালালের কসম খেয়ে বলছি, এই অবস্থায় তাকে যদি করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিতও করা হয়, তবুও সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

চিন্তা করুন! আল্লাহর ভালোবাসায় কী পরিমাণ গভীরতা ও নিমগ্নতা তার ভাগ্যে জুটেছিল! আমাদের ভাগ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ভালোবাসাও জুটে যায়, তাহলে জীবন সার্থক হবে।

প্রতি প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়তমের আলোচনা

প্রেমিক তো শুধু তার প্রিয়তমকে চায়। এ ছাড়া অন্যকিছু সে বুঝতে চায় না। তাহলে একটি মজার কথকোপথন শুনুন।

قِيْلَ : لِبَعْضِ الْمُحِبِّيْنَ مِنْ أَيْنَ ؟

'কেউ একজন (আল্লাহপ্রেমিক) প্রশ্ন করল, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

قَالَ : مِنْ عِنْدِ الْحَبِيْبِ

'সে উত্তর দিল, হাবীবের (প্রিয়তমের) কাছ থেকে এসেছি।

قِيْلَ : وَإِلٰى أَيْنَ ؟

'প্রশ্ন করা হলো, যাবেন কোথায়?

قَالَ : إِلَى الْحَبِيْبِ

'সে উত্তর দিল, প্রিয়তমের নিকট।

قِيْلَ : مَا تَشْتَهِيْ

প্রশ্ন করা হলো, আপনার পছন্দ কী?

قَالَ: لِقَاءُ الْحَبِيْبِ

'বলল, প্রিয়তমের সাক্ষাৎ।

قِيْلَ: اِلٰى مَتٰى تَذْكُرُ الْحَبِيْبَ

'প্রশ্ন হলো, কতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রিয়তমের আলোচনা করতে থাকবেন?

قَالَ: حَتّٰى أَرٰى وَجْهَ الْحَبِيْبِ

'উত্তর দিল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রিয়তমের চেহারা দেখতে না পাব, ততক্ষণ তার আলোচনা করতেই থাকব।

সময় এসেছে ভেবে দেখার

হায় ! আজ যদি আমাদের অন্তরগুলোতেও আল্লাহর এমন ভালোবাসার স্থান হতো, তাহলে আমাদের জীবনের গতিপথ ভিন্ন দিকে হতো। আমাদের অবস্থা তো এমন–

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے

'ভালোবাসার নেশা বাকি নেই।
সেই অন্তর, সেই বাসনা বাকি নেই।
নামায, রোযা, কুরবানি, হজ,
সবই তো আছে– নেই শুধু তুমি!

আজকের এ যুগে একটা জিনিসের বড় অভাব। তা হলো, আমাদের বুকগুলোতে আলোড়িত হৃদয় নেই। একটা সময় ছিল, যখন যুবা-তরুণরা রাতের শেষ প্রহরে উঠত, আল্লাহর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কান্নাকাটি করত। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার ঢেউ উথলে উঠত। কিন্তু আজ সেই আলোড়িত হৃদয় নেই; নেই ভালোবাসার উষ্ণতা।

কবি বলেন–

حقیقت خرافات میں کھو گئ
یہ امت روایات میں کھو گئ
لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب
مگر لذت شوق سے بےنصیب
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں یکتا، امانت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
وہ سالک مقامات میں کھو گیا
بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے
مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

'বাস্তবতা কুসংস্কারের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে,
এই উম্মত ঐতিহ্যের পেছনে হারিয়ে গেছে।
খতীবের বয়ানে অন্তর আপ্লুত হয়,
কিন্তু তা উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত।
সেই সূফী-সাধু, যে কিনা সত্যের সেবায় ছিলেন মহাপুরুষ,
ভালোবাসায় অদ্বিতীয়, আমানতে অনুপম, অনারবদের কল্পনায় হারিয়ে গেল সেই সাধক।
মাকামাতে হারিয়ে গেল প্রেমের আগুন। এখন শুধুই অন্ধকার। এরা মুসলান নয়– ভস্মের স্তূপমাত্র।'

একটা সময় ছিল, যখন বুকের ভেতর অন্তর জ্বলন্ত কয়লার মতো উত্তপ্ত হতো আর এখন তা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহর নামও শোনে, যিকিরও করে; কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই। যেভাবে সর্দি-ঠান্ডার রোগী সুগন্ধ-দুর্গন্ধের পার্থক্য করতে পারে না, তেমনি আজ নফস শয়তান এবং খাহেশাতের কারণে আল্লাহপ্রেমের স্বাদও আমরা অনুভব করতে পারি না।

হায়! আমরা যদি আল্লাহপ্রেমের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারতাম, তা হলে এই নিকৃষ্ট দুনিয়াকে কত আগেই লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিতাম!

সৃষ্টিপ্রেমের এই হাল!

মজনুর নাম তো আপনারা শুনেছেন। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

رُاِیَ مَجْنُوْنُ لَیْلٰی فِی الْمَنَامِ، فَقِیْلَ لَهٗ: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ قَالَ غَفَرَلِیْ وَجَعَلَنِیْ حُجَّةً عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ

'লায়লার প্রেমিক মজনুকে মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? সে বলল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর আল্লাহপ্রমীদের জন্য আমাকে প্রমাণ বানিয়ে দিয়েছেন।'

দেখুন, যদি সামান্য একটা সৃষ্টিজীবের ভালোবাসায় সে এতটা আত্মহারা হতে পারে, তাহলে তোমরা স্বয়ং স্রষ্টার ভালোবাসায় কেন আত্মহারা হতে পারবে না? ভালোবাসার প্রভাব তার ওপর এতটাই প্রবল ছিল যে, লোকেরা তাকে মজনু (পাগল) বলে ডাকত; কিন্তু সে কোনো উত্তরই দিত না। একব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে বলল, আমি জানি, সে কীভাবে শুনবে। এই বলে সে মজনুর কাছে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে বলতে লাগল, লায়লা! লায়লা! সে সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, কে এই মানব, যে আমার লায়লার নাম উচ্চারণ করছে?

তো ভাই! সামান্য মাখলুকের প্রেমে যদি এত গভীরতা হয়, তাহলে মহান আল্লাহর সঙ্গে আমাদের প্রেমের গভীরতা কেমন হওয়া উচিত? মজনু বলে-

اُطُوْفُ عَلٰی جِدَارِ دِیَارِ لَیْلٰی

اُقَبِّلُ ذَاالْجِدَارِ وَذَاالْجِدَارِ

'আমি লায়লার ঘরের চারপাশে চক্কর দিচ্ছি– কখনো এই দেওয়ালে চুমু খাচ্ছি, কখনো ওই দেওয়ালে চুমু খাচ্ছি।

وَمَا حُبُّ الدِّیَارِ شَغَفْنَ قَلْبِیْ

وَلٰکِنْ حُبُّ مَنْ سَکَنَ الدِّیَارَا

'এই ঘরের ভালোবাসা আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করেনি; বরং ঘরে যে বসবাস করে, তার ভালোবাসা আমার হৃদয়কে খানখান করে দিয়েছে।'

হায়! যদি আমাদের অন্তরগুলোতেও আল্লাহ রব্বুল ইযযতের এই পরিমাণ ভালোবাসা হতো, যার দ্বারা সকল আমলের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারতাম– সেজদার স্বাদ, রুকুর স্বাদ, কুরআন শেখা ও শেখানোর স্বাদ, ইবাদতের স্বাদ! সুবহানাল্লাহ!

সরিষার দানাপরিমাণ মহব্বতের মর্যাদা

মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতো একটি কথা। ইয়াহয়া ইবনে মু'আয (রহ.) বলতেন–

مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِنَ الْحُبِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً بِلَا حُبٍّ

'সরিষার দানাপরিমাণ মহব্বত সত্তর বছরের মহব্বতহীন ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশী উত্তম।'

লম্বা সেজদা করার কারণ

মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) নামাযে লম্বা-লম্বা সেজদা করতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! এত লম্বা সেজদা? উত্তর দিলেন, হাঁ! প্রভুর কুদরতি কদমের সামনে মাথা রেখে দিই; মন আমার উঠাতেই চায় না। সুবহানাল্লাহ!

চিন্তা করুন, তাদের অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল!

আহলে মহব্বতের জন্য সুসংবাদ

একদিকে আল্লাহ হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠালেন–

يَادَاوُدُ! ذِكْرِيْ لِلذَّاكِرِيْنَ

'হে দাউদ! আমার স্মরণ যাকেরীনদের জন্য।'

وَجَنَّتِيْ لِلْعَابِدِيْنَ

' আমার জান্নাত ইবাদতগুজার বান্দাদের জন্য।'

وَزِيَارَتِيْ لِلْمُشْتَاقِيْنَ

'আমার সাক্ষাৎ আমার প্রেমিক লোকদের জন্য।'

وَاَنَا خَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّيْنَ

'এবং আমি সেই লোকদের জন্য খাস, যারা আমাকে মহব্বত করে।'

আল্লাহ করুন, আমরাও যেন আল্লাহর মহব্বতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

আল্লাহপ্রেমীদের প্রতি প্রেমমাখা সম্বোধন

সিররি সাকতি (রহ.) খুব বিস্ময়কর একটি কথা বলেছেন। কথাটি যখন আমি পড়েছি, তখন কয়েকবার পড়েও আমার মন পরিতৃপ্ত হয়নি। তিনি বলেন–

تُدْعَى الْاُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَنْبِيَائِهَا

'কেয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতকে তাদের নবীগণের সাথে ডাকা হবে।'

فَيُقَالُ: يَااُمَّةَ محمد! يَااُمَّةَ موسى! يَااُمَّةَ عيسى (عليهم الصلاة والسّلام)

'তাদেরকে (এভাবে) ডাকা হবে, হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! হে উম্মাতে মূসা! হে উম্মাতে ঈসা!'

وَيُدْعَى الْمُحِبُّوْنَ، فَيُقَالُ: يَااَوْلِيَاءَ الله! هَلُمُّوْا اِلَى اللهِ سُبْحَانَه

'এবং আল্লাহ স্বীয় প্রেমিকদের (এভাবে) ডাকবেন, হে আল্লাহর বন্ধুরা! এসো আল্লাহর দিকে।' সামনে এগিয়ে বলেন–

فَتَكَادُ قُلُوْبُهُم تَنْخَلِعُ فَرَحًا

'তাদের অন্তরগুলো আনন্দে লাফাতে থাকবে।'

আহ! এমন মহব্বত আমাদেরও নসিব হয়ে যাক। আমীন।

প্রেমছড়ানো কবিতা

'কাশফুল মাহযূব' নামক কিতাবে লেখা আছে, একব্যক্তি খুব আশ্চর্যজনক কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি পাঠ করতে-করতে কোথাও যাচ্ছিল। পঙ্‌ক্তিগুলো এমন–

وَاللهِ مَاطَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ

اِلَّا وَاَنْتَ فِيْ قَلْبِيْ وَوَسْوَاسِيْ

'আল্লাহর কসম! যখনই সূর্যোদয় হয়েছে, যখনই সূর্যাস্ত হয়েছে হে প্রিয়তম! তোমার ধ্যান আমার অন্তরে ছিল, তোমার ধ্যান আমার কল্পনায় ছিল।'

وَلَا ذَكَرْتُكَ مَخْزُوْنًا وَلَا طَرَبًا

اِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُوْنٌ بِأَنْفَاسِىْ

'সুখে-দুঃখে যখনই তোমাকে স্মরণ করেছি হে প্রভু! তোমার মহব্বত আমার নিঃশ্বাসে মিশে ছিল।

অর্থাৎ– আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তোমার মহব্বতের স্পর্শ ছিল।

وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ

اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِى الْكَاسِ

'আমি যখনই কঠিন পিপাসায় পানি পান করেছি হে প্রিয়তম! সেই পানিতে আমি তোমাকে তালাশ করেছি।'

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের এমন ভালোবাসা যদি পেয়েই যাই, তবে তো আর কোনো কথা-ই নেই!

ইশকের বড়ি কোথায় পাওয়া যায়!

এবার একটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন! একবার মাওলানা ফযলুর রহমান গান্জমুরাদাবাদী (রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ আলী মোঙ্গেরী (রহ.)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন-মাওলানা! আপনি কখনো ইশকের দোকান দেখেছেন? একথা শুনে মাওলানা কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দিলেন-হযরত! জ্বী, আমি ইশকের দোকান দেখেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোনটা? তিনি বললেন, একটা তো হলো শাহ গোলাম আলী দেহলবি (রহ.)-এর, অপরটা শাহ আফাক (রহ.)-এর।

এই আল্লাহওয়ালাগণ যেখানেই বসেন, সেটা-ই ইশকের দোকান হয়ে যায়। আগ্রহী ক্রেতারা আসে এবং ইশকের বড়ি ক্রয় করে ফিরে যায়। ইশকের এই বড়ি যদি কারো নসিব হয়েই যায়, তখন বান্দার ইবাদত-বন্দেগির ধরন পাল্টে যায়। এ হলো সেই ইশকে ইলাহী, যার কারণে মানবজাতি ফেরেশতাদের চেয়েও আগে বেড়ে যায়।

মাওলানা রুম বলেন–

اَلْاِنْسَانُ عَاشِقٌ

'মানুষ হলো প্রেমকাতর।'

এই ইশকের বদৌলতে মানুষ কখনো ফেরেশতাদেরও পেছনে ফেলে আগে বেড়ে যায়। তারপর আল্লাহর ধ্যানে নিজের বাকি জীবন কাটিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ইশকে তার মধ্যকার ইশকে আন্দোলন শুরু হতে থাকে।

মোরাকাবা নাকি প্রেমসুধা

মাওলানা ফজলুর রহমান গন্‌জমুরাদাবাদী (রহ.) স্বীয় শিষ্যদের যখন মোরাকাবা করানোর জন্য ডাকতেন, তখন বলতেন, এসো; প্রেমসুধা পান করো।

এ ধরনের মোরাকাবার দ্বারা আল্লাহর মহব্বত অর্জিত হয়ে যাবে। আর হয়ও তা-ই। যারা আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে আল্লাহর মহব্বতের একরকম প্রাচুর্য এসেই যায়।

পান করার পূর্বে পানকারী

এই অধম যখন হযরত মুর্শিদে আলম (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, পূর্বে কারো হাতে বাই'আত হয়েছিলেন? অধম উত্তর দিলাম, হাঁ! হযরত সায়্যেদ যাওহার হুসাইন শাহ (রহ.)-এর খেদমতে নয় বছর ছিলাম। তারপর হযরতের অনেক করুণা হলো। তিনি আমাকে বাই'আত করে নিলেন।

হযরতের সেখানে সারগোধার অধিবাসী নৌবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি হযরতের খুব কাছের মানুষ এবং আশেকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ফজরের নামাযের পর এই অধমকে বললেন, মোবারক হোক তোমার! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! কোনো সমস্যা হয়নি তো? তিনি বললেন, না-না, হযরত (রহ.) বলছিলেন, এই যুবক ইতিপূর্বে কোথাও হতে (প্রেমসুধা) পান করে এসেছে। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহওয়ালারা বলে দিতে পারেন, কারা পান করেছে আর কারা করেনি।

হায়! আমরাও যদি কারো সাহচর্যে থেকে আল্লাহর প্রেমসুধা পান করতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, মহব্বত কী জিনিস।

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعْدَ كَأْسٍ

فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَمَا رَوِيْتُ

প্রেমসুধা পান করেছি গ্লাসের-পর-গ্লাস

কিন্তু তারপরও না শেষ হলো সুধা, না তৃপ্তি পেলাম আমি।

প্রেমসুধার ভিখারী

আমাদের বুযুর্গানের খানকাসমূহে যুবকরাও পান করত, বৃদ্ধরাও পান করত। ইংরেজি শিক্ষিতরাও পান করত, খাতাকার-গুনাহগার পাপী-তাপী বান্দারাও এসে পান করত।

বৃদ্ধদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের আকাঙ্ক্ষা

খানকায়ে ফজলিয়া মিসকীনপুর-এ দুই বৃদ্ধ বসে ছিলেন। উভয়ের দাড়ি ধবধবে সাদা। একজন অপরজনের সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন। একজন অপরজনের কলার ধরে ধাক্কা দিচ্ছেন, ঠেলাঠেলি করছেন। প্রত্যক্ষদর্শী তা দেখে সীমাহীন আশ্চর্য হলো। এ কী! ভদ্র মানুষ! যাকেরীনদের মধ্যে গণ্য! বয়োবৃদ্ধ! মসজিদে অবস্থান করে! অথচ তারা কিনা এখানে হাতাহাতি করছেন! সে মনে-মনে বলল, আচ্ছা, ঘটনাটা কী তা জেনে নেওয়া যাক। তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন, তারা কথা কাটাকাটি করছে। সঙ্গে-সঙ্গে হাত-পাও বসে নেই। একজন বলছেন, আল্লাহ মেরা হায় (অর্থাৎ– আল্লাহ আমার) অপরজন অগ্নিশর্মা হয়ে তার প্রতিবাদ করে কলার ধরে বলছেন, না হে; আল্লাহ মেরা হায়, আল্লাহ মেরা হায়। এভাবে উভয়ের মাঝে হাতাহাতি চলছে। একজন বলছেন, আল্লাহ আমার, অপরজনও বলছেন আল্লাহ আমার।

সুবহানাল্লাহ! কি মধুর সংঘাত! উভয়ের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত কী পরিমাণ হবে ভেবে দেখুন, যার ফলে তারা একে-অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ ছিল বৃদ্ধদের অবস্থা।

শিক্ষিতদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের তামান্না

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহ.) ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। স্বীয় যমানার ডেপুটি কমিশনার লেভেলের একজন লোক ছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আপনি তো 'মিস্টার' ছিলেন। আপনার

'টার' কীভাবে 'মিস' হয়ে গেল? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এক আল্লাহওয়ালার খেদমতে হাজির হয়েছি। তিনি যখন হযরত থানবি (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলেন, তখন তার অন্তরের দুনিয়া পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। তিনি নিজের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে এমন একটি কবিতা বলেছিলেন, যা শুনে স্বয়ং তার শাইখও ভীষণ অভিভূত হন। তিনি বলেন–

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

সকল কামনাবাসনা মন থেকে বিদায় নিয়েছে।

এবার তুমি এসে পড়ো, এবার তো নির্জনতা তৈরি হয়ে গেছে।

হযরত থানুবি (রহ.) যখন এই কবিতাটি শুনলেন, তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যদি আমার নিকট এক লক্ষ রূপী থাকত, তবে এই কবিতাটির বিনিময়ে এক লক্ষ রূপীই পুরস্কার দিতাম।'

তিনি যখন চাকরি থেকে অবসরে গেলেন, তখন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিলেন–

پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی

اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی

اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم

ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم

'এখন তো দিনরাতের অবস্থা-ই অন্য রকম।

সদা যেন তার সাথে সাক্ষাতই সাক্ষাৎ।'

আহ! সদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্নতা ও তার প্রতি আসক্তির জীবন যদি আমাদেরও নসিব হয়ে যেত! এ বিষয়গুলো আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে গিয়ে শিখতে হয়।

আরো একটি বিস্ময়কর কবিতা তিনি বলেছেন–

بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے

ہم ثواب وعذاب کیا جانیں

کس میں کتنا ثواب ملتا ہے
عشق والے حساب کیا جانیں

বন্দেগি দ্বারা তো আপনিই আমাদের উদ্দেশ্য। ছাওয়াব-আযাবের হিসাব করে কী হবে! কোন আমলে কত নেকি পাওয়া যাবে, খোদাপ্রেমীরা কি এসবের খবর রাখে?

যেমন– বলা হয়, দু-রাকাত নফল পড়ো, হজ-ওমরার ছাওয়াব পাওয়া যাবে। তারপর ছাওয়াবের কথা শুনেই সবাই নামায পড়ে। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকে, ছাওয়াবের লোভে তারা ইবাদত করবে কেন? তারা তো আল্লাহর মুহব্বতে ডুবে গিয়ে তার ইবাদত করে থাকেন।

পাপী-তাপীদের মধ্যে প্রেমসুধা পানের আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহওয়ালাদের খেদমতে পাপী-তাপী বান্দারাও আসে এবং তাদের সান্নিধ্যে বসে আল্লাহপ্রেমের অমীয় সুধা পান করে ফিরে যায়।

এক কবি ছিলেন। নাম জিগার মুরাদাবাদী। তিনি খুব প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। একবার তিনি হযরত মাজযুব (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জিগার সাহেব তাঁর তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি দেখে বলতে লাগলেন, জনাব! আমি আপনার শাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই সাক্ষাৎ করুন। তিনি বললেন, তবে একটি শর্ত আছে, আমি তো পান করি। (তিনি মদপান করতেন। আসলে তা মদ তো নয়; বরং বিষ পান করতেন)। এটা ছাড়া তিনি থাকতেই পারতেন না। তিনি বললেন, আমি শাইখের সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করব, তবে সেখানে গিয়েও পান করব।

মাজযুব (রহ.) হযরত শাইখ (রহ.)-এর নিকট এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'ভাই! খানকা হলো পাবলিক প্লেস। এখানে তো পান করা যাবে না; তবে তাঁকে আমি আমার ঘরে মেহমান বানিয়ে নেব। মেহমান তখন যা ইচ্ছে করার অধিকার রাখবে। হোক না সে কাফের। মেহমান হওয়ার অধিকার তারও রয়েছে।

যাহোক, শাইখ (রহ.) জিগার মুরাদাবাদীকে নিজের বাড়িতে মেহমান করে নিয়ে গেলেন। যখন হযরতের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করল, তখন এক সাহচর্যেই তাঁর অন্তর্জগত বদলে গেল। সেখানেই মদপান থেকে তাওবা করলেন। জীবনে আর কখনো এই বিষ মুখে তুলবেন না। এমনকি অসুস্থ

হয়ে গেলেন। ডাক্তাররা বলল, একদম ছেড়ে দিলে মরে যাবেন; অল্প হলেও পান করতে হবে। তিনি উত্তর দিলেন, এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? আমি এখন প্রকৃত মহব্বতের সুধা পান করেছি। এই অপবিত্র জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়া এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন তিনি দাড়িও বড় করেছেন, নেক ও নেকির জীবন যাপন শুরু করেছেন। লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে তার কথা শুনে সাক্ষাতের জন্য ছুটে আসছে। সবার একটাই প্রশ্ন, জিগারের কী হয়ে গেল? তখন তিনি নিজের ব্যাপারেই এই পঙ্‌ক্তিটি রচনা করেন–

چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا

سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے

'চলো, জিগারের তামাশা দেখে আসি।

শুনেছি, ওই কাফেরটা নাকি মুসলমান হয়ে গেছে।'

তারপর আল্লাহর প্রেম তার হৃদয়-মনের ওপর ছেয়ে গেল। তিনি আল্লাহর প্রেমে কবিতা আবৃতি করতেন। এত সুন্দর-সুন্দর কবিতা যে, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করত, জনাব, আপনার মধ্যে এতটা আবেগ-তরঙ্গ তো কখনো দেখিনি! তিনি একথার ওপরও আবৃতি করলেন–

میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر

وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانہ پہ چھا گیا

'হে জিগার! এতটুকুই আমার প্রেমের গভীরতা।

সে আমার ওপর ছেয়ে গেছে আর আমি তার ওপর ছেয়ে গেছি।'

সময়ের মূল্যায়ন করুন

সেসব মাহফিল হতে আল্লাহর মহব্বত-ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা আমাদেরও করতে হবে। আল্লাহর নিকট মুনাজাত করুন, অন্তরকে মুক্ত করুন, মাখলুকের শয়তানি, নফসানি ও প্রবৃত্তির ভালোবাসাকে অন্তর থেকে বের করুন। আপনি যদি দুধের এমন পাত্র নিয়ে যান, যাতে ময়লা-আবর্জনা, নাপাকি-পায়খানা লেগে আছে, তাহলে কেউ তাতে দুধ ঢালবে না। এটা ঢালনেওয়ালার দোষ নয়। এই দোষ তো পাত্র নিয়ে গমনকারীর, যে পবিত্র পাত্র পেশ করল না। এই অন্তর থেকে প্রথমে গাইরুল্লাহর মহব্বত বের

করুন। যদি মুক্ত হৃদয় নিয়ে একাগ্রতার সাথে ওই সব লোকের সাহচর্যে বসেন, তবে এক বৈঠকই আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর এমন মহব্বত ও ভালোবাসা অন্তরে প্রবেশ করবে যে, আপনি নিজেই তার উষ্ণতা অনুভব করবেন।

কবি কত সুন্দর করে বলছেন–

عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں

ٹھہرو منصور مجھے دل کی دوا لینے دو

'ওহে প্রেমের সাধকরা! এই দোকানে না দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেয়ো না।

থামো মনসূর! আমাকে আত্মার দাওয়াই নিতে দাও।'

অন্তরের ওষুধ সংগ্রহ করুন। সময় সর্বদা এক রকম থাকে না। এই মুহূর্তের মূল্যায়ন করুন। আজ যারা পান করাবে, তারা অস্থির হয়ে পানকারীর পথপানে চেয়ে আছে। অথচ পানকারীদের অন্তর অন্য দিকে লেগে আছে। একটা সময় এমনও আসবে, যখন পান করতে চাইবে; কিন্তু পান করানেওয়ালা কাউকে কাছে পাওয়া যাবে না। সুতরাং সময়ের মূল্যায়ন করুন। আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করুন।

আপনার একটি সুদৃষ্টির ব্যাপার মাত্র

আমার আপনাদের এখানে আসা আল্লাহ কবূল করে নিন। আসুন! আমরা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করি। হে দয়াময় প্রভু! আমরা আমাদের ঘর ছেড়েছি, ব্যবসা ছেড়েছি। হে আল্লাহ! আমাদের অফিস-আদালত, ঘরবাড়ি, পরিবারপরিজন সবকিছু একটা সপ্তাহের জন্য ছেড়ে আপনার ঘরে এসে হাজির হয়েছি। উদ্দেশ্য একটিই। আপনি আমাদের ওপর মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান। হে দয়াময় প্রভু! আমাদের অন্তর কালো হয়ে গেছে, পাপের কারণে তা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি এমন অন্তরের দিকে সুদৃষ্টি দেন না ও হে মাওলা! আমাদের অন্তরগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিন। এগুলোকে গাইরুল্লাহর মহব্বত হতে মুক্ত করে দিন, আমাদেরকে আপনার দরবার হতে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আমরা একথা ভালো করেই জানি, যে আপনার দরবার থেকে খালি হাতে ফিরে যায়, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। আয় আল্লাহ! হতভাগা হওয়া থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের এই উপস্থিতি কবুল করে নিন। হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতের

এক পলক সুদৃষ্টি আমাদেরও নসিব করুন। হে আল্লাহ! আপনার একটি সুদৃষ্টি আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে।

আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁর সুদৃষ্টি দান করুন এবং তার প্রকৃত মহব্বত ও ভালোবাসা দান করুন, যেন বাকি জীবন শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চলতে পারি। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রহমতের নবীর চিরস্থায়ী মুজিযা

'এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এই যমযমে এত বরকত রেখে দিয়েছেন যে, এতে সকল প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয়নি যে, হারামে বসে থাকা কোনো ব্যক্তিকে একথা বলা হয়েছে, 'আজ যমযমের পানি শেষ হয়ে গেছে; আগামীকাল থেকে তা আবার চালু করা হবে।' বরং যখন চাও, যত চাও শীতল যমযম সেখানে সর্বদা প্রস্তুত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মুজিযা সর্বদা চালু আছে এবং প্রত্যেক হাজী সাহেব স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

অধম ঢোল বাজিয়ে একথা বলতে পারব যে, এমন কোনো কূপ সারা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার দ্বারা এত লক্ষ মানুষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। বড়-বড় টিউবওয়েল বসানো হয়, মোটর লাগানো হয়, কিন্তু পানির চাহিদা পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা যমযমের এই কূপকে জারি করে দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের প্রকাশ্য মুজিযা আমাদের দেখালেন।'

রহমতের নবীর চিরস্থায়ী মুজিযা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মুজিযার প্রদর্শন

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত মানুষকে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন-যাপন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আম্বিয়া (আ.)কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তারপর নবীগণের সাহায্যের জন্য তাঁদের বিভিন্ন রকমের বিস্ময়কর মুজিযা দান করেছেন। প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগোপযোগী এক বা একাধিক মুজিযা দান করা হয়েছে।

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে জাদুবিদ্যার ব্যাপক চর্চা ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে জাদুর মুজিযা দান করলেন যে, তাঁর হাতের লাঠি বিশাল অজগর সাপে পরিণত হয়ে যেত। ফলে যখন জাদুকরদের সঙ্গে তার মোকাবেলা হলো, তখন আল্লাহ হযরত মুসা (আ.)কে কামিয়াব করলেন। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

'আমি আল্লাহর হুকুমে বধির ও শ্বেতরোগীদের সুস্থ করি এবং মৃত মানুষকে জীবিত করি।'[১]

তিনি 'কুম বি-ইয্নিল্লাহ' বলতেন আর মৃত ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য জীবিত হয়ে যেত।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯

যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেসালাত লাভ করলেন, তখন আরবদের মধ্যে সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল। কাব্য ও কবিতার যুগ ছিল। ওকায নামক বাজারে মেলা বসত। কবিরা সেখানে শত-শত কবিতা আবৃতি করত। এক-একজন কবি শত-সহস্র কবিতা মুখস্থ আবৃতি করতে পারত। তারা নিজভাষায় এত পারদর্শী ছিল যে, কেবল নিজেদেরই 'আরব' বলত আর বাকি দুনিয়াকে বলত 'আযম' (বোবা)। তাদের দাবি ছিল, আরবদের মতো ভাষায় সাহিত্য ও সৌন্দর্য অন্য কোথাও নেই। এ-বিষয়ে তাদের খুব গর্ব ছিল।

সেই যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন মাজীদ দান করলেন। আর এটি ছিল এমন মুজিযা, যা মানুষকে নির্বাক করে দিয়েছিল। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

'হে মানব ও জিন জাতি! যদি সারা পৃথিবীর সকল জিন ও মানব মিলে কুরআনের মতো কালাম পেশ করার চেষ্টা করে, (তাহলে তারা ব্যর্থ হবে) কখনো তারা সক্ষম হবে না, যদিও তারা একে অপরকে সাহায্য করে।'[১]

যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হিংসা রাখত; তাঁকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, তাদের পক্ষে যদি এই চ্যালেঞ্জ কবূল করার ক্ষমতা থাকত, তবে তারা তা অবশ্যই করত। কিন্তু তা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে। কুরআন তাদের এতটুকু পর্যন্ত বলেছে,

فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

'যদি কুরআনের সমকক্ষ কোনো কালাম পেশ করতে না-ও পার, তবে এর মতো একটি সূরাই বানিয়ে দেখাও!'[২]

কিন্তু তারা এই ক্ষুদ্র চ্যালেঞ্জটুকুও গ্রহণ করতে পারল না। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, এ আবার কেমন কালাম! তাদের কাব্যরীতি এমন বিস্ময়কর কালাম পেশ করতে অক্ষম ছিল। অবশেষে তারা অকপটে স্বীকার করে নিল, এমন কালামের মতো কালাম পেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

---

১. সূরা ইসরা : আয়াত ৮৮

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৩

নবুওতও চিরস্থায়ী, মুজিযাও চিরস্থায়ী

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেকগুলো মুজিযা দান করেছিলেন। তাঁর নবুওত চিরস্থায়ী; কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং নবুওতের মতো তাঁর সকল মুজিযাও চিরস্থায়ী; সর্বদা থাকবে। বিষয়টি সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন।

জামারাত থেকে কঙ্কর অদৃশ্য হওয়ার মুজিযা

যারা হজে গিয়েছেন, তারা হয়ত স্বচক্ষে দেখেছেন, শয়তানকে যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়, তখন প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বিশাল সমাবেশ থাকে। যদি জিলহজের ১৩ তারিখ পর্যন্ত শুধু একজন হাজীর নিক্ষেপিত কঙ্করের হিসাব করা হয়, তাহলে তার সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তর। এ বছর সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ-লক্ষ হাজী আকাশপথে হজ করতে এসেছেন আর বিশ লক্ষ এসেছেন স্থলপথে। অর্থাৎ– সত্তর লক্ষ হাজীর সমাগম ছিল সেখানে। এবার আপনিই অনুমান করুন, সত্তর লক্ষ হাজীর প্রত্যেকেই সত্তরটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করলে সেখানে তো কঙ্করের স্তূপ লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। যখনই কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য যাওয়া হয়, ছোট্ট একটি স্তূপ দেখা যায়। আর একটি বুলডোজার এসে দু-তিন দফায় সব কঙ্কর সরিয়ে ফেলে।

এ-কথাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এত কঙ্কর নিক্ষেপ হয়, এসব যায় কোথায়? এগুলো দেখা যায় না কেন? এর কারণ কী? তখন নবীজি উত্তরে বললেন, যে-কঙ্করগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট কবূল হয়ে যায়, সেগুলো ফেরেশতারা উঠিয়ে নেন। আর বাকিগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়। এই মুজিযাকে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে থাকি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, লক্ষ-লক্ষ হাজীর নিক্ষেপিত এত কঙ্করে তো বিশাল স্তূপ লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে এসব দেখাই যায় না! আমাদের নবীজির এ মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

আবে যমযমের মুজিযা

আলল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি দান করেছেন। নবীজির জন্মের পূর্বেই তাঁর দাদা বন্ধ যমযমকে পুনরায় খনন করে জারি করেছিলেন। এই পানির মধ্যে বিস্ময়কর বরকত রয়েছে।

বিদায় হজে নবীজি যখন তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি তাওয়াফের পর যমযমের পানি পান করলেন এবং বালতিতে অবশিষ্ট পানিগুলো পুনরায় কূপে ফেলে দিলেন যেন পরবর্তিতে যত হাজী এই যমযম থেকে পানি পান করবে, তারা আমার উচ্ছিষ্ট পান করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। এমনটি তিনি উম্মতের প্রতি সীমাহীন মায়া ও মমতার টানে করেছিলেন।

এবার দেখুন, সরকার শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানি পৌঁছানোর জন্য শহরপ্রতি পাঁচ-ছয়টি কিংবা দশ-বারোটি করে টিউবওয়েল সরবরাহ করতে হয়। তারপর গিয়ে শহরবাসীর পানির প্রয়োজন পূরণ হয়। অথচ যমযমের তো একটিই কূপ। আর সেই কূপ থেকে পানি পানকারীদের সংখ্যা কত? সত্তর লক্ষ হাজী সাহেবান। কারণ, যেব্যক্তিই হজ করতে যায়, সে অবশ্যই যমযমের পানি পান করে। এ-ছাড়া মক্কা মুকাররমার অধিবাসীরা তো সবসময় যমযমের পানি পান করেই। বরং আমরা দেখেছি, মক্কার চারদিকে প্রায় একশো মাইল এরিয়ার লোকজন যমযমের পানি সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর সকল হাজী দেশে ফেরার সময় যমযমের পানি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে। এখন তো মাশাআল্লাহ মসজিদে নববীতেও যমযমের পানি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলছি, আমার একথা বুঝে আসে না যে, একটি কূপ থেকে এত পানি বের হওয়া কী করে সম্ভব!! লক্ষ-লক্ষ শহরবাসী পান করে, সত্তর লক্ষ হাজী পান করে, সঙ্গে করে বাড়িও নিয়ে যায়! এরপর একশো মাইল এরিয়ার প্রতিটি শহর ও গ্রামের অধিবাসীরাও এই পানি পান করে!

এটি কী জিনিস? এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এই যমযমে এত বরকত রেখে দিয়েছেন যে, এতে সকল প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয়নি যে, হারামে বসে থাকা কোনো ব্যক্তিকে একথা বলা হয়েছে, 'আজ যমযমের পানি শেষ হয়ে গেছে; আগামীকাল থেকে তা আবার চালু করা হবে।' বরং যখন চাও, যত চাও শীতল যমযম সেখানে সর্বদা প্রস্তুত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মুজিযা সর্বদা চালু আছে এবং প্রত্যেক হাজী সাহেব স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

অধম ঢোল বাজিয়ে একথা বলতে পারব যে, এমন কোনো কূপ সারা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার দ্বারা এত লক্ষ মানুষের চাহিদা পূরণ করা

সম্ভব। বড়-বড় টিউবওয়েল বসানো হয়, মোটর লাগানো হয়, কিন্তু পানির চাহিদা পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা যমযমের এই কূপকে জারি করে দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের প্রকাশ্য মুজিযা আমাদের দেখালেন।

সুতরাং এখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা হলো চিরস্থায়ী মুজিযা এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। তাঁর নবুওতও থাকবে, তাঁর মুজিযাও থাকবে।

আরো চারটি চিরস্থায়ী মুজিযা

একটি বিশেষ কথা এই অধম আজ বলতে চাচ্ছে। তা হলো, সেই মুজিযাগুলো ব্যতীত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো চারটি মুজিযা এমন আছে, যা সর্বদার জন্য সংরক্ষিত আছে, থাকবে এবং গোটা উম্মত তা প্রত্যক্ষ করবে।

প্রথম মুজিযা কুরআন মাজীদ : প্রথম মুযিজা হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন মাজীদ। এটি একটি সংরক্ষিত কালাম, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

'নিশ্চয়ই এই নসীহতনামা আমিই অবতরণ করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।'[১]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার কালাম হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, এ-কারণে তা আজও সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বিগত চৌদ্দশো বছরের দীর্ঘ সময়ে কোনো মুহূর্ত এমন কাটেনি, যাতে কোথাও আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও-না-কোথাও ধারাবাহিভাবে সর্বদা কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত অবশ্যই হয়েছে। তা হলে এটি কী? এটি আল্লাহ রব্বুল ইযযতের কালামের মুজিযা।

কুরআনকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা

কুরআন কারীমকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র এ-যাবত অনেক হয়েছে। যেমন–

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৯

তাতারীদের ষড়যন্ত্র : তাতারীরা যখন মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করল, তখন তারা দজলা ও ফোরাত নদীতে এত কিতাব নিক্ষেপ করেছিল যে, সেখানে একটি কিতাবের পুল তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং প্রায় এক মাস যাবত নদীর পানি কালো হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। কিতাবসমূহ হতে কালি বের হতে থাকে আর পানি কালো হতে থাকে। তাদের ইচ্ছা ছিল, এই কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম দুনিয়া থেকে মিটে যাক। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! তারা নিজেরা তো মিটে গেল, কিন্তু কুরআন মিটল না। কুরআন পৃথিবীর বুকে আজও সমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র : তারপর আবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল যখন এ-অঞ্চলটি অখণ্ড ভারতবর্ষ ছিল। ইংরেজরা যখন এ-অঞ্চলের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিল, তখন তারাও চেষ্টা করেছিল, মুসলমানদেরকে তাদের কুরআন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা সফল হতে পারেনি। কুরআন আজও আগেরই মতো চিরজীবন্ত, চিরভাস্বর হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যাচ্ছে।

কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র : এরপর তৃতীয় দফা ষড়যন্ত্র করা হয় ওই সময়, যখন গোটা এশিয়া মহাদেশে কমিউনিজমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা নিজেদের দেশে কুরআনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ– এর তেলাওয়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কুরআনের ভাষা আরবিকেও নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়েছিল যে, যদি কোনো ঘর থেকে আরবি লেখা সম্বলিত কোনো কাগজের টুকরাও পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হবে। সত্তর বছর এমনভাবে কেটে যায় যে, মুসলমানরা তাদের ঘরে কুরআন মাজীদ রাখতেও পারত না। যেখানেই কুরআনের কোনো নুসখা পাওয়া যেত, সেই ঘরের সকল ব্যক্তিকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হতো। প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম পার হয়ে যেত; কিন্তু কুরআন মাজীদকে প্রকাশ্যে ঘরে রাখা যেত না।

এক রুশ নারীর আহাজারি

একবার আমার তাশখন্দ সফর করার সুযোগ হয়েছিল। ওলামায়ে কেরামও আমার সঙ্গে ছিলেন। এক ভদ্রমহিলা দূর থেকে আমাদের দেখে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি মুসলমান?

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা মুসলমান।

মহিলা বলল, আপনার কাছে কি কুরআন আছে?

আমার পকেটে তখন ছোট সাইজের একটি কুরআনের কপি ছিল, যা সাধারণত সফরের সময় আমি সঙ্গে রাখি। তাকে সেটি দেখিয়ে বললাম, এই যে এটি কুরআন। সে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি এটি হাতে নিয়ে দেখতে পারি? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই; কেন পারবে না! আমি তাকে কুরআনের কপিটি দিলাম। সে তা হাতে নিয়ে পরম মমতাভরে চুমু খেল, চোখে-মুখে লাগাল, বুকের সঙ্গে লাগাল। ঠিক যেন বহুদিন পর কোনো আপনজনকে পরম মমতায় কোলে তুলে নিল। আমাদের মধ্যে একজন আলেম তাকে প্রশ্ন করল, আপনি এর সঙ্গে এমন মমতামাখা আচরণ কেন করছেন? উত্তরে সে বলল, আমার বয়স এ মুহূর্তে ঊনচল্লিশ বছর। আমার বাবা-মা মুসলমান ছিলেন। তারা আমাকে কালেমাও পাঠ করিয়েছেন। কিন্তু ঊনচল্লিশ বছরে এই প্রথমবার আমি কুরআন দেখছি!

তো সেখানে এ-রকম নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা দেখুন, আজ সেখানেও কুরআন আছে এবং কুরআনের হাফেযও আছে।

সমকালীন সরকারের বিস্ময়!

একবার রমজানুল মুবারকে আমাদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানকার সরকার তখন একটি আন্তর্দেশীয় কেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অংশগ্রহণের জন্য শর্ত ছিল, প্রতিযোগী হয় হাফেয হবে, না হয় কারী হবে। তাদের ধারণা ছিল, আমাদের দেশে হয়ত বড়জোর এক-দুশোজন হাফেয থাকবে আর তারা-ই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! তারা হতবাক হয়ে দেখল, প্রায় চৌদ্দ হাজার হাফেযে কুরআন সেখানে দরখাস্ত পেশ করেছে। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, এখানে তো কুরআনই ছিল না, তাহলে এরা হাফেয হলো কীভাবে?

হাঁ! এটিও কুরআনের একটি মুজিযা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুরআনের কোনো কপি নেই, অথচ হাফেযে কুরআনের অভাবও নেই!

ঈমানদীপ্ত দুটি ঘটনা

প্রথম ঘটনা : আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি ষ্টিল মিলে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মিলটি রাশিয়ার এক বড় কোম্পানির মালিকানায় ছিল। যেহেতু তিনি কোম্পানির ষ্টাফ ছিলেন, তাই তাকে ট্রেনিং-

এর জন্য মস্কো পাঠানো হয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে একবার জুমার দিন এসে গেল। তিনি স্থির করলেন, আমি মসজিদে গিয়েই জুমার নামায আদায় করব। লোকেরা উত্তর দিল, জনাব! এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু দুটি মসজিদ খোলা আছে যেন পর্যটকগণ এসে বিনোদন করে চলে যায়।

এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মসজিদে পৌঁছে গেলেন। মসজিদ সাফাই করে সেখানে নামায পড়তে শুরু করলেন। সেখানকার দারোয়ান বলল, আপনাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, তাহলে আমি এর কিছু জানি না। তিনি বললেন, ভাই! আমি সরকারি মেহমান, নিজের ঘরে যেমন মুসলমান ছিলাম, এখানেও মুসলমান আছি; আমাকে আমার প্রভুর ইবাদত থেকে কে বাধা দেবে?

যখন নামায শেষ হলো, একটি ছোট্ট শিশু এসে আমাকে ইশারায় ডেকে বলল, আপনাকে আমার আব্বু ডাকছেন। মসজিদ থেকে বের হতেই তাদের ঘর সামনে পড়ল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, আমি তাদের ঘরে প্রবেশ করলাম। তারা দরজায় খিল আটকে দিল। তখন তাদের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ ছিল। যেই দরজায় খিল লাগিয়ে দিল, তখন তাদের চেহারা শঙ্কামুক্ত হলো এবং হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, মুসলমান! আমরাও মুসলমান। তারা উর্দু-ইংরেজি জানত না আর আমি রাশিয়ান ভাষা বুঝতাম না। এ-কারণে আমরা ঈঙ্গিতে কথা বলছিলাম। যাহোক, তারা আমাকে খানা খাওয়াল, চা পান করাল। তারপর পরস্পরে কথায় লেগে গেল।

আমার সামনে কয়েকটি শিশু বসা ছিল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি কুরআন মাজীদ পড়তে পার? একজন উত্তর দিল, হাঁ পারি। আমি পকেট থেকে কুরআনের কপিটি বের করে তার সামনে রেখে বললাম, একটু পড়ে শোনাও! ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; কিছুই পড়ল না। আমি তাকে পুনরায় পড়ার জন্য বললাম; কিন্তু সে পড়তে পারল না। আমি ছেলেটির বাবার দিকে তাকালাম; তিনি মুসকি হাসছিলেন। আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বললাম, এখান থেকে পড়ো–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও।'[১]

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ৬

তিনি বলেন, যখনই আমি দু-একটি শব্দ পড়তে লাগলাম, ছেলেটিও পড়তে শুরু করল। আমি খুব আশ্চর্য হলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে তো কিছুই পড়তে পারেনি আর এখন শুরু করে তো থামার নাম নেই!

তারপর তার বাবা আমাকে বলল, আমরা এখানকার রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের কারণে ঘরে কুরআন মাজীদ রাখতে পারি না। তাই আমাদের মধ্যে যারা পুরাতন হাফেয তাদের নিকট আমাদের শিশুদের পাঠিয়ে দিই। তাদের কেউ দর্জির কাজ করেন; কেউ অন্য কিছু। তারা এই শিশুদের কাজ শিখানোর পাশাপাশি অল্প-অল্প করে কুরআন মাজীদও মুখস্থ করাতে থাকেন। যেমন– অন্ধ শিশুকে প্রতিদিন দু-তিন আয়াত করে মুখে-মুখে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়। আর এভাবে অল্প-অল্প করে আমাদের শিশুরা পুরা কুরআনের হাফেয হয়ে যায়। কিন্তু তারা যেহেতু কুরআন দেখে পড়তে জানে না, তাই নাযেরা পড়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আল্লাহু আকবার!

তারা বলল, যখন আমরা কুরআনের জ্বলন্ত মুজিযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন অন্তর থেকে আওয়াজ এল, হে লোকসকল! তোমরা কাগজে লেখা কুরআনের ওপর তো নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে; কিন্তু সীনার মধ্যে সংরক্ষিত কুরআনের ওপর কীভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে?

তো কুরআন মাজীদকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বহুবার হয়েছে। কিন্তু চৌদ্দশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও কুরআন তার আসল রূপে বিদ্যমান আছে। লিখিত আকারে কিতাবে এবং মুখস্থ আকারে হাফেযদের সিনায়। আজও দুনিয়ার লক্ষ-লক্ষ নারী-পুরুষ কুরআন মাজীদকে তাদের বুকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : একবার আমেরিকায় দু-তিনজন আলেম আমার নিকট আসেন। তারা বললেন, হযরত! এখানে একটি বহুধর্মীয় ইন্টারফেইথ কাউন্সিল আছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা আসেন এবং নিজ-নিজ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমাদের দু-একজন সেখানে যাতায়াত করতে শুরু করেন। তারা এত চালাক ও স্মার্ট যে, যখন তাদের কাছে কোনো দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যায়, তখন তার কাছে সাইন্সের বিষয়ে জানতে চায়। আর যদি কোনো সাইন্সপড়ুয়া ব্যক্তি তাদের কাছে যায়, তখন তার কাছে দীনি বিষয়ে প্রশ্ন করে। আর যদি এমন ব্যক্তি যায়, যে দীন ও সাইন্স উভয় বিষয়ে জ্ঞান রাখে, তখন তাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করে। এভাবে তারা খুব কৌশলে প্রত্যেক আগন্তুক ব্যক্তিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে। এখন

আমরা আপনার নিকট এসেছি, আমাদের সঙ্গে এসে এর উপযুক্ত জবাব দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করুন।

প্রথমে তো আমি ওজর পেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের পীড়াপীড়িতে রাজি না হয়ে পারলাম না। আমি সেখানে পৌঁছে জানিয়ে দিলাম, আমি নিয়মিত মিটিং-এ উপস্থিত থাকব। আপনাদের যদি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানার থাকে, তা হলে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তর জানা থাকলে আমিই বলে দেব, অন্যথায় আমাদের বড়দের নিকট জিজ্ঞাসা করে কিংবা কিতাবাদি অধ্যয়ন করে আপনাদের জানিয়ে দেব। এতে তারা নিশ্চিন্ত হলো আর আমি সেখানে যাওয়া শুরু করলাম।

আমি সেখানে একটি বিষয় লক্ষ করলাম যে, তাদের মধ্যে ইহুদি আলেম যে ছিল, যাকে 'রাবাঈ' বলা হয়, সে আমাকে খুব মনোযোগসহকারে দেখছিল। বিশেষ করে সে যখন আমার লাঠির দিকে তাকাত, তখন তাকে দেখে মনে হতো, সে ভীষণ মুগ্ধ! ভীষণ আলোড়িত! হয়ত সে মনে-মনে ভাবত, এ-সুন্নতটি তো আমাদের নবী হযরত মূসা (আ.)-এর। এই মুসলমান এর উত্তরসূরী হয়ে গেল আর আমরা হয়ে গেলাম বঞ্চিত!

একদিন সে আমাকে বলল–

"you always come with a different respective look"

' আপনি সর্বদা একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষের মতো মজলিসে উপস্থিত হন।'

সে বোঝাতে চেয়েছিল, আমার এই জুব্বা, পাগড়ি আর হাতের লাঠি ইত্যাদি দেখে তারা প্রভাবিত হয়েছে।

একদিন সেক্রেটারী সাহেব বললেন, আগামী মিটিং-এর এজেন্ডা কী হবে? আমি বললাম, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধির কাছে তাদের যে 'ওয়ার্ড অফ গড' (আল্লাহর কালাম) আছে, যা তাদের নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা তারা পাঠ করে শোনাবে। আইডিয়াটি তার কাছে খুব ভালো লাগল। সে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিল, আগামী মিটিং-এ প্রত্যেকেই নিজ-নিজ নবীর ওপর অবতীর্ণ কালাম পাঠ করে শোনাবেন। যখন পরবর্তী মিটিং শুরু হলো, তখন সে আমাকে বলল, জনাব! আপনিই আইডিয়া দিয়েছিলেন; এবার আপনিই শুরু করুন। আমি সূরা ফাতেহা পাঠ করলাম এবং ইংরেজি ভাষায় তার সরল অনুবাদ করলাম।

আমি সূরা ফাতেহা কেন পাঠ করলাম? এ-কারণে যে, আমরা কিতাবে পড়েছি, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা কিছু নাযিল করেছেন,

তার সবটুকু তিনি কুরআন মাজীদে নাযিল করেছেন। আবার যা কিছু পুরা কুরআনে নাযিল করেছেন, তা সূরা বাকারায় রেখে দিয়েছেন। আবার সূরা বাকারায় যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সবকিছু সূরা ফাতেহায় রেখে দিয়েছেন। এ-কারণেই একে 'ফাতিহাতুল কিতাব'ও বলা হয়। অর্থাৎ– এটি গোটা কুরআনে মাজিদের সারাংশ। যেহেতু গোটা কুরআনের শিক্ষা এই সূরার মধ্যে নিহিত আছে, তাই একেই পাঠ করলাম যেন সংক্ষেপে গোটা কুরআনের শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরলাম।

এরপর এক পাদ্রীর (খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নেতা) পালা ছিল। সে তার ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বাইবেল খুলে 'পাহাড়ি ওয়াজ' নামক অধ্যায় থেকে পাঠ করতে লাগল। বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে একটি পাহাড়ি ওয়াজ নামক অধ্যায় ছিল, যেটি সে খুব মজা করে পাঠ করছিল। সে যখন এক-দু মিনিট পাঠ করল, আমি সেক্রেটারীকে বললাম, আমি একটি পয়েন্ট শেয়ার করতে চাচ্ছি। সে বলল, হাঁ, বলুন। আমি বললাম, গত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিরা তাদের নিকট যে 'ওয়ার্ড অফ গড' (আল্লাহর কালাম) আছে, তা থেকে পাঠ করে শোনাবেন। এ-কারণেই আমি আরবি পাঠ করে শুনিয়েছি। কারণ, কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। এখন এর নিকট আমার জিজ্ঞাসা, এই যে বাইবেল, যা তাদের নিকট আছে, এটি কি ইংরেজি ভাষায়-ই নাযিল হয়েছিল; না কি অন্য কোনো ভাষায়? সে আমার প্রশ্ন শুনে বুঝে গিয়েছিল যে, আমি তাদের অত্যন্ত দুর্বল স্থানে হাত রেখেছি। সে নিরুত্তর রইল; কিছু বলল না। কারণ, যদি বলত, বাইবেল হিব্রু ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাহলে আমি বলতাম, 'আপনি তো ইংরেজি পড়ছেন! হিব্রু ভাষায় পড়ুন। তখন তার উত্তর একটাই হতো যে, তা তো আমাদের কাছে সংরক্ষিত নেই।'

কিছু সময় নীরবতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। এরপর ইহুদি রাবাঈ এগিয়ে এল। কারণ, এরপরই তার সিরিয়াল। তারও জানা ছিল, 'আমি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাওরাত নিয়ে এসেছি; হিব্রু ভাষার আসল তাওরাত তো আমার নিকটও নেই। এই ব্যক্তি তো আমাকেও একই প্রশ্ন করবে। সে আমাকে বলল, মিষ্টার আহমাদ! সে আমাকে আহমাদ নামেই ডাকত আর একে আমি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতাম। বলল, মিষ্টার আহমাদ! আমি একটি বিষয় আপনার সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, সমগ্র পৃথিবীতে যত ধর্ম রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের কাছেই 'আল্লাহর কালাম' আসল রূপে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া আর কারো কাছেই 'আল্লাহর কালাম' আসল রূপে সংরক্ষিত নেই।' আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ!

সেদিন অন্তর এত আনন্দিত হয়েছিল যে, ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; কাফেররা পর্যন্ত স্বীকার করছে, একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদ তার আসল রূপে সংরক্ষিত আছে। আর এটাই কুরআনের মুজিযা; আমাদের নবীজির মুজিযা; যতদিন পর্যন্ত নবুওত বাকি থাকবে, ততদিন মুজিযাও বাকি থাকবে; কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। যেই একে ধ্বংস করতে চাইবে, সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে; কুরআন ধ্বংস হবে না। কেউ যদি মাথা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করে, তাতে তার মাথাই ক্ষতবিক্ষত হবে; পাহাড়ের কিছুই হবে না। যাহোক, এটা হলো আল্লাহর কালামের চিরন্তন মুজিযা।

দ্বিতীয় মুজিযা হাদীছে রাসূল : দ্বিতীয় মুজিযা হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যাকে হাদীছ বলে। কারণ, হাদীছ মুবারক কুরআনে মাজীদের তাফসীর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আপনি তা-ই পাঠ করে শোনান, যা আপনার নিকট নাযিল করা হয়েছে।

নবীজি তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের তাফসীর ও ব্যখ্যা করে কুরআনের সাথে-সাথে হাদীছ ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিগত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে একটি মুহূর্তও এমন কাটেনি, যাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীছ পাঠ করা হয়নি।

হাদীছের হাফেযগণ

বরং প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক শতাব্দিতে আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা লক্ষ-লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করে হাফেযে হাদীছ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আমরা তো এখন 'হাফেয' শব্দটি ব্যবহার করি শুধু কুরআনের হাফেযদের জন্যে। কিন্তু প্রথম যুগে এই শব্দটি হাদীছের হাফেযদের জন্য ব্যবহার হতো। যেমন– হাফেয ইবনে তাইমিয়া, হাফেয ইবনে কাইয়্যিম, হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) প্রমুখ সবাই হাদীছের ওস্তাদ ছিলেন। কুরআনের হাফেয তো অনেকেই হয়। তারপরও নিকট অতীতেও এমন মহান ব্যক্তিগণ অতিবাহিত হয়েছেন। আমাদের আকাবিরগণের মধ্যে হযরত কাশ্মীরি (রহ.)-এর কয়েক হাজার হাদীছ মুখস্থ ছিল। তো এসব হাদীছ কিতাবেও সংরক্ষিত আছে, মানুষের মস্তিষ্কেও সংরক্ষিত আছে। এ-বিষয়ে তো অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু কথা সংক্ষেপ করে শুধু একটি ঘটনা শুনিয়ে সামনে এগুতে চাই।

একটি চমৎকার ঘটনা

হযরত আবূ যুর'আ (রহ.) একজন বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁর এক ছাত্রের বিবাহ হয়েছিল। শুরুর দিকে একদিন ঘরে পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। নববধূ রান্না করে স্বামীর অপেক্ষা করছিল। দেরি দেখে তার খুব রাগ হলো। মুখ ফুটে বলেই ফেলল, কারো প্রতি কোনো মনোযোগ নেই! যখন ইচ্ছা চলে যাও; কোনো অনুভূতিই নেই যে, পেছনে কেউ কি জীবিত আছে, না মারা গেছে!

এই যেমন স্ত্রীরা অধিকাংশই তাদের বিরক্তিকর গান গাইতে থাকে; ঘ্যানর-ঘ্যানর করে। সে-ও এমনই বলতে শুরু করল। যাহোক, স্বামী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল–

-দেখো, কোনো খারাপ কাজে তো আর যাইনি; হাদীছ শুনতে গিয়েছি।

তারও মুখে তেজ কিছু কম ছিল না। আছে না এমন! মরিচের মতো ঝাঁজ! বলে উঠল,

তোমার ওস্তাদই কিছু পারে না; তুমি কি পারবে? যখন ওস্তাদ সম্পর্কে মন্তব্য হলো, তখন স্বামীও রেগে গেলেন। বললেন,

যদি আমার ওস্তাদ এক লক্ষ হতে বেশী হাদীছ মুখস্থ না পারেন, তাহলে আমার পক্ষ হতে তোমাকে তিন তালাক।

এবার দেখুন কাণ্ড! কী থেকে কী হয়ে গেল!

যাক, রাত পোহাল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাথা ঠান্ডা হলো। উভয়ের মধ্যেই অজানা একটা ভয় কাজ করছিল। কারণ, মাসআলার হুকুম কারোরই জানা ছিল না। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল,

জি জনাব! তালাক কি হয়েই গেল?

স্বামী বলল, ভাই! এ কথাটি তো শর্তযুক্ত ছিল। আমাকে তো এ বিষয়টি আমার ওস্তাদজির নিকট জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি তিনি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ না পারেন, তাহলে তো তালাক হয়েই যাবে।

যাহোক, সকালে ওস্তাদজির নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল এবং জিজ্ঞাসা করল, আমি কি তাকে রাখব, না ছেড়ে দেব?

ওস্তাদে মুহতারাম মুচকি হেসে বললেন, আরে মিয়া যাও; স্ত্রীর কাছে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করো। আলহামদুলিল্লাহ! এক লক্ষ হাদীছ আমার এমনভাবে মখস্ত আছে যেমন সূরা ফাতেহা মানুষের মুখস্থ থাকে।

আসমাউর রিজাল শাস্ত্র

তো বলছিলাম, পবিত্র কুরআনও সংরক্ষিত; হাদীছ মুবারকও সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন, যারা 'রিজালুল হাদীছ' নামে পরিচিত। তারা একদিকে যেমন হাফেযে হাদীছ হয়েছেন, অপরদিকে হাদীছের সংকলনও করেছেন। তারা হাদীছকে অ-হাদীছ থেকে পৃথক করার জন্য, সহীহ হাদীছকে জাল হাদীছ থেকে আলাদা করার জন্য 'জরাহ-তাদীল' ও 'আসমাউর রিজাল'-এর মতো বিশাল শাস্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন। যদি কেউ দাঁড়িয়ে বলে, আমি হাদীছ জানি, তা হলে তাকে শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাইবাছাই করে বলে দেওয়া যাবে, এর হাদীছ গ্রহণযোগ্য কিনা। সুবহানাল্লাহ! এই দীনের হেফাযতের কেমন চমৎকার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করে দিয়েছেন! আজ লক্ষ-লক্ষ হাদীছ কিতাবের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে গেছে এবং সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে।

সারকথা, কুরআনও সংরক্ষিত, হাদীছ ও সংরক্ষিত। সুবহানালাহ!

তৃতীয় মুজিযা আরবি মাদরাসাসমূহ : তৃতীয় মুজিযা হলো, কুরআন ও হাদীছের পাঠদান যেখানেই হোক সেই স্থানের নাম 'মাদরাসা' হয়ে যায়। আর যেহেতু কুরআনও সংরক্ষিত, হাদীছও সংরক্ষিত, তাই তার সাথে-সাথে আরবি মাদরাসাগুলোও সংরক্ষিত আছে। কারণ, কুরআন-হাদীছ সংরক্ষিত হবে; অথচ তা সংরক্ষণের স্থান মাদরাসাসমূহ সংরক্ষিত হবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার।

একটি উদাহরণ দেখুন। পৃথিবীতে মানবদেহে জীবন নামের যে বস্তুটি আছে, তা তো দেহের মধ্যেই আছে। দেহ থাকবে, তো জীবন থাকবে; দেহ থাকবে না তো জীবনও থাকবে না।

সর্বপ্রথম মাদরাসা

এসব মাদরাসা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম মাদরাসা, যেটি নবীজি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলো আসহাবে সুফফার মাদরাসা। 'সুফফা' উঁচুস্থানকে বলে। মদীনার একটি উঁচু জায়গায় সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করতেন। তাকেই 'সুফফা' বলা হতো। সাহাবায়ে কিরাম সেখানে থাকতেন এবং নবীজি সেখানে এসে তাঁদের দীন শেখাতেন। তাঁকে তো পাঠানোই হয়েছে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। হাদীছে আছে।

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'অবশ্যই আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'

তো সেই মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ছাত্র ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। আর শেখানো হতো দীনি শিক্ষা। এটিই ছিল এই উম্মতের সর্বপ্রথম মাদরাসা। তারপর সাহাবায়ে কেরাম সেখান থেকে দীন শিখে দুনিয়াময় ছড়িয়ে গেলেন। তাবেঈনগণ তাদের থেকেই দীন শিখলেন। যে-সাহাবি যেখানে গিয়েছেন, সেটাই দীনের মাদরাসা হয়ে গেছে। সুতরাং মাদরাসা কোনো বিল্ডিং কিংবা ইমারতের নাম নয়; বরং যোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রের দ্বারাই মাদরাসা অস্তিত্ব লাভ করে। ছাত্র-শিক্ষক যদি কোনো খোলা আকাশের নিচেও গিয়ে বসে যায়, তা হলে সেটাই মাদরাসা। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ক্লাসে ছাত্র ছিল একজন, শিক্ষকও একজন। আর মাদরাসা ছিল একটা ডালিম গাছের ছায়া।

যাহোক, এই মাদরাসাগুলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। আজও সেই ধারাবাহিকতা আল্লাহর রহমতে অব্যাহত আছে। এই মাদরাসাগুলোর বরকতেই আজ শতাধিক হাফেযে কুরআনের 'পাগড়িপ্রদান' অনুষ্ঠানে আমরা সমবেত হয়েছি।

মাদরাসাসমূহ বন্ধের জঘন্য ষড়যন্ত্র

যুগে-যুগে মাদরাসাসমূহকে বন্ধ করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেও কেউ সফল হতে পারেনি। ইনশাআল্লাহ পারবেও না। যেমন–

এক. কমিউনিজমের ষড়যন্ত্র : সর্বপ্রথম রাশিয়ায় যখন কমিউনিজমের আগমন ঘটল, তখন তারা সকল দীনি মাদরাসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল, যেন মাদারাসা নামের কোনো প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার বুকে অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু ঘটল কী? ভবন নির্মাণ তো বন্ধ হলো; কিন্তু প্রত্যেক আলেমের এক-একটি ঘর এক-একটি মাদরাসায় পরিণত হলো। সেই আলেমের নিকট যুবকরা আসত আর তিনি তাদের দীন শিক্ষা দিতেন। আমাকেও সমরকন্দে এমন একটি ঘর দেখানো হয়েছে, যার কাহিনি খুবই বিস্ময়কর। আমাকে জানানো হলো, "যখন সরকারিভাবে মাদরাসা নিষিদ্ধ করা হলো, তখন আমরা এই ঘরটিকে একটি বড় হলরুম বানিয়ে ফেলি। ভেতরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পৌঁছে দিই। আর তার চতুর্দিকে বসবাসের জন্য অনেকগুলো রুম তৈরি করি। মূল ফটকের পাশের রুমটিকে শরাবখানার মতো ডিজাইন

করে সাজাই। এখানে-সেখানে কিছু খালি মদের বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখি। কয়েকটা উলঙ্গ নারীর ছবিও সেখানে ঝুলিয়ে রাখি। যখন পুলিশ তল্লাশি নিতে আসত, তখন শরাবখানার মতো রুমটি দেখে তারা মনে করত, এখানে মদ্যপ লোকেরা বাস করে। এরা ঘরকেই শরাবখানা বানিয়ে ফেলেছে। এরা তেমন বিপজ্জনক লোক নয়। এসব ভেবে তারা চলে যেত।

লোকটি বলল, আমরা ওই মদের বোতলগুলোর পেছনে একটি ছোট দরজা তৈরি করে রেখেছিলাম। শিক্ষক তার ছাত্রদের নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার পরই তা বন্ধ করে দেওয়া হতো। এই দরজা ছয় মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হত। তারা ভেতরেই খানাপিনা, লেখাপড়াসহ সব রকমের কাজকর্ম করত। বাইরে মা উঠান ঝাড়ু দিতেন, অথচ তার সন্তান ভেতরে লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকত। মা জানতেনই না; তার সন্তান ভেতরে কখন কী করছে! কাঁদছে, না হাসছে! খেয়েছে, নাকি ক্ষুধার্ত ঘুমিয়ে গেছে! মা-বাবা কুরবানি করেছেন। ছয় মাস পর তাদেরকে সেখান থেকে বাইরে আনা হতো। তখন এমনও দেখা যেত যে, একটি কচি শিশু সেখানে প্রবেশের সময় একটি অক্ষর চিনত না। আর বের হওয়ার পর সে তখন পুরা কুরআন মাজীদ দেখে-দেখে পড়তে পারে। সুবহানাল্লাহ!

মাদরাসা ধ্বংসকারীরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েও মাদরাসা ধ্বংস করতে পারেনি। প্রত্যেক আলেমই নিজের ঘরকে একটি মাদরাসা বানিয়ে ফেলেছিলেন। তো যাহোক মাদরাসা কোনোদিন ধ্বংস হবে না।

আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! এটাই আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা। এ-সকল মাদরাসা আল্লাহ করুন কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকুক। এগুলো এমন প্রতিষ্ঠান, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মকে দীন শেখানো হবে। সুতরাং আশা করা যায়, এসব দীনি প্রতিষ্ঠানকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

দুই. ইংরেজদের ষড়যন্ত্র : আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষে যখন হিন্দুস্তান-পাকিস্তান এক সাথে ছিল, ইংরেজরা শাসনক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল, তখন তাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, কীভাবে দীনি মাদরাসাগুলো ধ্বংস করা যায়। এ-লক্ষ্যে তারা সর্বপ্রথম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর মাদরাসা, যার নাম ছিল, 'মাদরাসায়ে রহীমিয়া' বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, একেবারে মাটির সঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছিল।

সেযুগে মাদরাসাসমূহ ওয়াকফের সম্পত্তি দিয়ে পরিচালিত হতো। কেউ কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এক কানি দু-কানি সম্পত্তি এক সাথে

ওয়াক্‌ফ করে দিত। মাদরাসার ভবন নির্মাণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির আয় দিয়ে ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণ করা হতো। অধিকাংশ মাদরাসাই এভাবে পরিচালিত হতো। আল্লাহ তা'আলার কী শান! সেই কাফের ইংরেজ এসে সেই ওয়াকফের সম্পত্তিগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মাদরাসার গলা চেপে ধরল। হাজারো মাদরাসা কিছু দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। সরকার বাহাদুর ভেবেছিল, আমি সব মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন রকম। ওলামায়ে কেরামের প্রতিটি ঘর এক-একটি জীবন্ত মাদরাসার রূপ নিল। নিজের ও প্রতিবেশীর বাচ্চাদের দীনি শিক্ষা ঘরে-ঘরেই আঞ্জাম পেতে লাগল। তবে মাদরাসা নামের কোনো ভবন ছিল না।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর এক বান্দা ছিলেন। তাঁর অন্তরে দীনের জন্য সীমাহীন দরদ ও মায়া ছিল। নাম হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)। তিনি ভাবলেন, আজ মুসলমানদের সম্পত্তিগুলো কুক্ষিগত করা হলো, তাদেরকে দুনিয়া থেকে মাহরুম করা হলো। এটা যত বড় বঞ্চনা, তার চেয়ে হাজার গুণ বড় বঞ্চনা হলো পরবর্তী প্রজন্মের দীন থেকে মাহরুম হওয়া। এমন তো হতে দেওয়া যায় না! তারপর এই দরদ ও ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি তার শশুর বাড়ির এলাকায় 'দেওবন্দ' নামক একটি গ্রামে ছোট্ট একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি মূলত একটি ডালিম গাছের নিচে ছিল। এক ওস্তাদ, এক শাগরেদ। ওস্তাদের নামও 'মাহমুদ' শাগরেদের নামও 'মাহমুদ'।

একটি ডালিম গাছের নিচেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সেই ডালিম গাছ আজও অক্ষত আছে। এই অধম সেখানে গিয়ে মোরাকাবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমি সেই গাছটির পানে উদাস হয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, হে আল্লাহ! কী অপার আপনার মহিমা! এই ক্ষুদ্র ডালিম গাছের নিচ থেকে কীভাবে আপনি ইল্‌ম ও আমলের ফয়েজ জারি করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।[১]

---

১. এই স্মৃতিচারণে আমি নিজেও আবেগাপ্লুত হয়েছি। নিজের অজান্তে চোখের পাতা অশ্রুশিক্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন সেখানে ইল্‌মের সুধাপান করছিলাম, তখন একদিন হঠাৎই জানলাম, ডালিম গাছটি কেঁটে ফেলা হয়েছে। সময়টা তখন ২০০৩ ইংরেজি সনের ডিসেম্বর মাস। কারণ একটাই ছিল যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই=

অবশেষে এই তা'লীমী সেলসেলা বড়ই সাদাসিধেভাবে চলতে লাগল যে, কেউ বুঝতেই পারল না, এটিও একটি মাদরাসা।

শুরুতে তো মাদরাসার রান্নাঘরের ব্যবস্থাও ছিল না। এলাকার হৃদয়বান লোকেরা একজন কিংবা দুজনের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে মাদরাসা চলতে থাকে। মাদরাসার পরিচালকও আটটি উসূল নির্ধারণ করেছেন, যাকে 'উসূলে হাশতেগানাহ' বলা হয়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম উসূল হলো 'মাদরাসার জন্য স্থায়ী কোনো আয় গ্রহণ করা যাবে না।'

আল্লাহর শান দেখুন! আজ আমাদের ঈমান কত দুর্বল! আমরা দু'আ করি, হে আল্লাহ! মাদরাসার জন্য একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দিন'। অথচ আমাদের আকাবিরের অবস্থা ছিল একেবারেই ভিন্ন। তারা বলতেন, মাদরাসার জন্য কোনো স্থায়ী আয় গ্রহণ করা যাবে না। কেউ একজন প্রশ্ন করল, এমন কেন? তারা উত্তর দিলেন, এতে যদি দৃষ্টি আল্লাহ থেকে সরে গিয়ে মানুষের প্রতি নিবদ্ধ হয়, তা হলে আল্লাহর সাহায্য হতে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। তো এভাবেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে মাদরাসা চালু হয়ে যেত।

ইল্‌ম ও ফনের মারকাযসমূহ

তখন ইসলামি উলূমের তিনটি মারকায ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল দিল্লিতে। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহ.)-এর খান্দানের লোকেরা সেখানে কুরআন-হাদীছের বাতি আলোকিত করেছেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ফারসি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) লিখেছেন তাফসীর। তাঁর দুজন পুত্র ছিলেন। একজন হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) এবং অপরজন শাহ আব্দুল কাদের (রহ.)। তাঁরা

=গাছকে কেন্দ্র করে কিছু বিশ্বাসগত বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল। কারো-কারো অবস্থা তো শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাই হযরত ওমর (রাযি.) যেভাবে কুরআনে বর্ণিত 'শাজারায়ে বাই'আতে রেদওয়ান' নামক গাছটি এই যুক্তিতে কেটে ফেলেছিলেন যে, 'এ নিয়ে মানুষের মধ্যে বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে' তদ্রূপ উম্মতের বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে দেওবন্দের ডালিম গাছটিও কেটে ফেলা হয়। আমি স্বচক্ষে সেই গাছটির কর্তিত মূলটি দেখেছি। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মনটা শান্ত হয়ে গেল। কারণ, এই কাজটি একটি মহান উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। –অনুবাদক)

উভয়েই কুরআনের তরজমা লিখেছেন। একজন কুরআনের শব্দে-শব্দে অনুবাদ করেছেন। অপরজন করেছেন পারিভাষিকভাবে। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বলতেন, 'হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.)-এর অনুবাদ ছিল ইলহামী।' আমাদের এই মজলিস যেহেতু ওলামায়ে কেরামের মজলিস, তাই একজন তালেবে ইল্‌ম হিসেবে দু-একটি উদাহরণ পেশ করছি।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটির অনুবাদে অধিকাংশ মুফাসসির লিখেছেন–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

নিশ্চয়ই নেকিসমূহ দূর করে গুনাহসমূহকে।'[১]

আর হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন 'নেকিসমূহ মিটিয়ে দেয় গুনাহসমূহকে'। উভয় অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, 'দূর করা' অর্থ দূরে সরানো, যা ফিরেও আসতে পারে। আর 'মিটিয়ে দেওয়া' অর্থ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, ধ্বংস করা, যার ক্ষতি আর কখনো ফিরে আসতে পারবে না। এ আয়াতের হাশিয়ায় তিনি লিখেছেন, যে পরিমাণ ময়লা সেই পরিমাণ সাবান। সাবান যেমন ময়লা-আবর্জনাকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি নেকিও গুনাহের অন্ধকারকে ধ্বংস করে দেয়। এটি একটি ইলহামী কথা ছিল, যার ফলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

অন্যত্র কুরআনের আরেকটি আয়াত লক্ষ করুন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

সকল মুফাসসির এই আয়াতের অর্থ করেছেন–

جو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم گاہوں کو

(যারা নিজেদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাযত করে।')

পক্ষান্তরে হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) এর অর্থ করেছেন,

جو تھامتے ہیں اپنی شرم گاہوں کو

(যারা নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে সংযত রাখে।)

এবার লক্ষ করুন, 'হেফাযত করা' সেই অর্থ দিচ্ছে না, যা 'সংযত রাখে' শব্দটি দিচ্ছে। অর্থাৎ– গুনাহের প্রবণতা ভেতরে থাকা অবস্থায়ও নিজেকে

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

সংযত রাখে। তাহলে বোঝা গেল, 'সংযত রাখা'-এর অর্থটি বাস্তবতার অনেক নিকটবর্তী।

এবার আরেকটি আয়াত লক্ষ করুন–

أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

এই আয়াতের অর্থ সবাই করেন 'তোমরা নারীদের স্পর্শ কর।'[১]

কিন্তু হযরত শাহ সাহেব এর অর্থ করেছেন–

یا تم ہاتھ لگاو عورتوں کو

অর্থাৎ– 'অথবা তোমরা নারীদের সংস্পর্শে আস।'

সুবাহানাল্লাহ! এমন অর্থ করেছেন যে, এতে সকল ইখতিলাফ শেষ হয়ে যায় এবং অর্থ নিজে-নিজেই বুঝে আসে। তো এ হলো ইলহামী তরজমা, যা হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) করেছেন।

যাহোক, কুরআন-হাদীছের একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লিতে আর আরেকটি কেন্দ্র ছিল 'লাখনৌতে, যা যিকির ও উসূলে ফিকহের মারকায হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এমনিভাবে আরেকটি মারকায ছিল খায়রাবাদে। ইল্‌মে নাহুর জন্য তা প্রসিদ্ধ ছিল। যাহোক এ কয়েকটি পৃথক-পৃথক স্থান ছিল, যা ইল্‌মিভাবে কেন্দ্র হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

দারুল উলূম দেওবন্দের কবূলিয়্যত

কিন্তু আল্লাহর শান দেখুন! যখন মুসলমানরা স্বাধীন হলো, তখন দারুল উলূম দেওবন্দ একটি ইউনিভার্সিটির রূপ নিয়ে ওইসব উলূমকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিল। পৃথক-পৃথক ইল্‌মি মারকাযগুলো সব এসে এখানে জমা হলো এবং কেন্দ্রীয় মারকায হওয়ার যোগ্যতা কেবল দারুল উলূম দেওবন্দের ভাগ্যেই জুটল। পরবর্তী কালে ফুজালায়ে দারুল উলূম হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে গিয়ে একই ধরনের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করল। আজ দেশে যতগুলো বড়-বড় মাদরাসা আছে, এগুলো সব ফুজালায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের হয়ত সরাসরি উদ্যোগ কিংবা তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা হযরত কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর দ্বারা ইল্‌ম ও আমলের এমন একটি চারা লাগিয়েছেন, যার ছায়া আজও সারা পৃথিবীতে

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৪৩

বিস্তৃত হয়ে আছে। কবূলিয়্যাতের অবস্থা এমন যে, পেশোয়ার থেকে শুরু করে কলিকাতা এবং বাংলাদেশের ছাত্ররাও ইল্‌ম অর্জনের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করে। এর সর্বপ্রথম মুহতামিম ছিলেন হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন (রহ.)। আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাকে কবূল করেছেন। সমগ্র পৃথিবী আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করে, অখণ্ড ভারতবর্ষ দারুল উলূমের সন্তানদের কারণেই স্বাধীন হয়েছিল।

এক কবি বলেন–

کوہسار یہاں دب جاتے ہیں
طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے
شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں
یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں یک شعلہ ہے یک سرو یہاں منارہ ہے

এখানে এসে ভূমিধসও দমে যায়, তুফানও থেমে যায়। এই ফকিরি কুঁড়েঘরের সামনে শাহী মহলগুলোও অবনত হয়ে যায়। এটি ইল্‌মও ফনের দোলনা, ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এখানের প্রতিটি ফুলই স্ফুলিঙ্গসম, প্রতিটি শিরই সুউচ্চ মিনারসম।

মাদরাসা কেন ধ্বংস হবে না

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাদরাসা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা কেন নেই? এর অনেকগুলো কারণ আছে। এর মধ্যে একটি বড় কারণ হলো, এদেশে যারা ঈমানদার আছেন, তাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত ঈমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাদরাসা ধ্বংস হবে না। কারণ, একজন লোক, চাই তিনি যত বড় ক্ষমতার অধিকারী-ই হন, এত বড় জামাতকে ঈমান থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

মাদরাসাগুলো কীভাবে চলে?

এবার মাদরাসা চলে কীভাবে বুঝুন।

ধরুন, আল্লাহ রব্বুল ইযযত একব্যক্তিকে একটা ছেলে দান করলেন। এখন তার মন চাচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে কিছু খরচ করব। লক্ষ করুন, তাকে কিন্তু সদকার কথা কেউই বলেনি, সন্তান লাভের আনন্দে সে নিজেই এটা চাচ্ছে। তো করে কী? দানের টাকাগুলো নিয়ে মাদরাসায় যায় এবং মুহতামিম সাহেবের হাতে তুলে দেয়।

এমনিভাবে কারো স্ত্রী মারা গেল। এখন তার খুব ইচ্ছে হয়, আমি আমার স্ত্রীর জন্য কিছু ইসালে ছাওয়াব করব। সে কী করে? একটা বকরি ক্রয় করে মাদরাসায় পাঠিয়ে দেয়। কেউ হয়ত অসুস্থ হলো। সে বলল, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ করে দিন। আমি আপনার রাস্তায় এক বস্তা গম সদকা করব। তো এভাবে খুশিরও শেষ নেই; দুঃখেরও শেষ নেই। ঈমানদার লোকেরা যখন আল্লাহকে বিশ্বাস করে এভাবে দান করতেই থাকবে, তখন তো মাদরাসাওয়ালাদের সকল প্রয়োজন ঘরে বসেই পূরণ হয়ে যাবে। তাহলে বলুন, ঈমানদারদের কে বাধা দেবে? সুতরাং ঈমানদারও থাকবে, মাদরাসাও থাকবে।

আমি আমার জানাশোনা একটি মাদরাসার কথা বলছি। সেখানে মুহতামিম সাহেব কোনো রশিদ বইও তৈরি করেননি। তারা ঘরে বসে তা'লীমের কাজ করছেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সেখানে পাঠিয়ে তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করছেন। হযরত বিন্নুরী (রহ.)-এর ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি প্রথম-প্রথম মাদরাসার জন্য যাকাতের টাকা নিয়ে নিতেন। তারপর এমন একটা সময় এল যে, তিনি যাকাতের কোনো টাকাই গ্রহণ করতেন না। স্পষ্ট বলে দিতেন, আমাকে যদি দিতে হয়, তো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মাল দাও, যাকাত তো মালের ময়লা। এটা দিও না। লোকেরাও তাকে পরিষ্কার মাল দিতেন এবং আলহামদুলিল্লাহ! তাতেই মাদরাসার সকল প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। শেষ মুহূর্তে তো তার প্রতি আল্লাহর এত দয়া হলো যে, প্রচুর অর্থ আমদানি হতো। প্রয়োজন পূরণ হয়ে উদ্বৃত্তও থাকত। এরপর তিনি নিয়ম করে দিলেন, আমি কেবল রমযান মাসেই অর্থ গ্রহণ করব। এছাড়া অন্য সময়গুলোতে কোনো টাকা-পয়সা গ্রহণ করব না। যার ইচ্ছে হয় পাঞ্জাবের অন্যান্য মাদরাসাগুলোতে দিতে পার। তাহলে বলুন, পরিস্থিতি যদি এ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস কে করবে?

আল্লাহ যাকে রাখতে চাইবেন তাকে কে ধ্বংস করবে?

فانوس بن کے جسکی حفاظت خدا کرے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

ফানুস হয়ে যার হেফাযত স্বয়ং আল্লাহ করেন, তাহলে বলুন, ওই প্রদীপ কীভাবে নিভতে পারে, যাকে আল্লাহ নিজে জ্বালিয়ে রাখেন?

তো কুরআনও সংরক্ষিত, হাদীছও সংরক্ষিত। সাথে-সাথে মাদরাসাসমূহও সংরক্ষিত। যতক্ষণ নবীজির আদর্শের রাজত্ব কায়েম থাকবে, ততক্ষণ মাদরাসাও কায়েম থাকবে। কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।

তো এই তিনটি বিষয় বুঝে গেছেন আশা করি।

চার : ওলামায়ে কেরাম : এবার চতুর্থ কথা হলো, মাদরাসা তো সংরক্ষিত আছেই। যারা তাতে শিখবেন-শেখাবেন ইল্‌মকে আগে পৌঁছাবেন, সেসব ওলামায়ে কেরামও তো থাকতে হবে। শিক্ষাদানকারী ওলামা হযরত যদি না থাকেন, তবে শুধু ইমারতকে তো আর মাদরাসা বলা যায় না। সুতরাং মাদরাসার হেফাযত করতে হলে প্রথমে ওলামায়ে কেরামের হেফাযত করতে হবে। এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ একটি মুজিযা যে, তাঁর ইল্‌মের উত্তরাধিকারী সর্বদা দুনিয়ায় জীবিত ছিল এবং মানবহৃদয়ে তা চিরকাল জীবিত থাকবে।

আমাদের তরী যদি ডুবে যায়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌মি ওরাসাত দুনিয়ায় অক্ষত থাকবেই। কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না। এর কারণ কী? এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, নবীজি মদীনার 'মসজিদে ইজাবাহ'য় তিনটি দু'আ করেছিলেন, যার মধ্যে দুটি দু'আ কবুল হয়েছিল।

একটি হলো, হে আল্লাহ! পূর্ববর্তী উম্মতের চেহারায় যেমন 'মাস্‌খ' তথা বিকৃতির আযাব পাঠিয়েছিলেন, আমার উম্মতের গুনাহের কারণে এমন কোনো আযাব আপনি দয়া করে দেবেন না। নবীজির এই দু'আটি কবুল হয়েছিল।

তিনি দ্বিতীয় দু'আটি করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ওপর এমন কোনো অত্যাচারী যালেমকে চাঁপিয়ে দেবেন না, যে তাদের ধ্বংস করে দেবে। মেহেরবান আল্লাহ তাঁর এই দু'আটিও কবুল করেছেন।

তো এই দু'আটি যদি কবুল হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম জাতি হিসেবে কি কেউ আমাদের ধ্বংস করতে পারবে?

আমার প্রিয় ছাত্ররা! না দীনকে কেউ মিটাতে পারবে, না মুসলমানদের কেউ মিটাতে পারবে।

স্মরণ রেখো! যদি আমাদের তরী ডুবে যায়, তা হলে গোটা পৃথিবীর জাহাজ ডুবে যাবে। কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কেউ আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। আমরা-ই শেষ উম্মত! নবীজি ইরশাদ করেন–

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنْتُمْ خَاتَمُ الْأُمَمِ

'আমি শেষ নবী আর তোমরা শেষ উম্মত।

ওলামায়ে কেরাম খাবেন কোত্থেকে?

সুতরাং কুরআনও সংরক্ষিত, হাদীছ ও সংরক্ষিত, মাদারেসও সংরক্ষিত এবং চতুর্থ নম্বরে ওলামায়ে কেরাম; তারাও সংরক্ষিত। আপনারা এখন কেউ হাফেয হচ্ছেন, কেউ কারী, কেউ আলেম। সুতরাং আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনাদের হেফাযত স্বয়ং আল্লাহ করবেন। তিনিই আপনাদের মুহাফিয ও রক্ষক। কারো যদি ভুল ধারণা হয় যে, এরা কোত্থেকে উপার্জন করবে? কোনো কাজই তো এদের জানা নেই! না খেয়ে মরতে হবে! একজন এসে আমাকে বলল, জনাব! এই ছাত্ররা কোথা হতে খাবে? আমি বললাম, কেন? নবীগণ যেখান থেকে খেয়েছেন এরাও সেখান থেকে খাবে। আরে ভাই! নবীগণ কোথা থেকে খেতেন? তোমাদের ফ্যাক্টরী থেকে? না; বরং তাদেরকে আল্লাহ খাওয়াতেন। অতএব এসব তালেবে ইল্মদেরও আল্লাহই খাওয়াবেন। এ কেমন ভ্রষ্ট কথা! আল্লাহ কি মেহেরবান নন? তাঁর কাজে যারা আত্মনিবেদন করবেন, তাদের তিনি অবশ্যই রিযিক দেবেন এবং তাদেরকে বিশেষ যত্নের সাথে হেফাযতও করবেন।

আলেমদের ধ্বংসের চেষ্টা করা অনর্থক

এদেশে প্রথমে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইংরেজরা সকল ওলামায়ে কেরামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আপনি ইতিহাসের পাতা খুলে দেখুন। তারা আলেমদের খুঁজে-খুঁজে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। জি.টি রোডের দু-পাশের গাছগুলোতে তাদের ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। শাহী মসজিদের চত্বরে ফাঁসির কাষ্ঠ

স্থাপন করে চব্বিশ ঘণ্টা ফাঁসির প্রদর্শনী করেছিল। পদ্ধতিটা ছিল এমন যে, একজনকে ফাঁসিতে ঝুলানো হতো। যতক্ষণ তার লাশ নড়াচড়া করত, ছটফট করত ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মৃত্যুর তামাশা দেখত। যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যেত, তখন তাকে নামিয়ে আরেকজনকে ঝুলানো হতো। চব্বিশটা ঘণ্টা-ই মৃত্যুর এই নির্মম প্রদর্শনী চলত। কয়েক মাস যাবৎ এই কার্যক্রম চালু ছিল। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, এরপর যেন আর কেউ তার সন্তানদের হাফেয-আলেম বানানোর কল্পনাও না করে।

কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আর ঈমানদার জনতা তাদের দীনের ওপর আরো বেশি দৃঢ়তা প্রদর্শন করল। লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজেদের সন্তানদের দীনি শিক্ষা দিল এবং হাফেযে কুরআন, কারী ও আলেম তৈরির ধারা অব্যাহত থাকল। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ওলামায়ে কেরামও সংরক্ষিত। তাদের রবই তাদের হেফাযত করেন। আমি কাশ্মিরে স্বচক্ষে একটি গাছ দেখেছি, যার ডালে সেখানকার ওলামায়ে কেরামকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হয়েছে। ইতিহাসের সেই নির্মমতার সাক্ষী হয়ে আজও সেই গাছটি দাঁড়িয়ে আছে।

সারকথা ওলামায়ে কেরামও সংরক্ষিত। আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেসব ওলামায়ে কেরামের সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও খোদাভীরুতার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। সালাম জানাই তাদের হৃদয়ে সুপ্ত আল্লাহপ্রেমকে, যাঁরা শত জুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দীনকে বুকের সাথে লাগিয়ে রেখেছেন। প্রমাণ করে গেছেন, হে অত্যাচারীরা! তোমরা আমাদের দেহ থেকে জীবন তো বের করতে পারবে; কিন্তু অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর সাহসিকতা

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) যখন মাল্টায় ছিলেন, তখন তাঁকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এমনকি হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন, আমি হযরতকে বললাম, হযরত! এমন কোনো শব্দ কেন বলে দিচ্ছেন না, যাতে ইংরেজ শয়তান আপনাকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করে দেয়। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন, আমার একথা শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, হুসাইন! তুমি কী মনে করছ আমাকে? আমি হযরত বেলালের রূহানী সন্তান, ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর রূহানী সন্তান। মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.), হযরত শাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.) প্রমুখ আমার রূহানী পিতা। এরা

আমার দেহ থেকে প্রাণ তো বের করতে পারবে; কিন্তু আমার অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।'

তারা ছিলেন দৃঢ়তার হিমালয়।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর দুঃসাহসিক জবাব

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর যোগ্য উত্তরসূরী হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)কে একবার এক ইংরেজ অফিসার ডেকে বললেন, তুমি স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছ এবং আমাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার কথা বলছ! তুমি কি জান এর পরিণতি কী?

হযরত মাদানী : হাঁ, আমি জানি।

অফিসার : বলো তো কী?

হযরত মাদানী : এটা (হাতের আঙুল দিয়ে কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে একটি সাদা কাপড় ছিল, কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন)

অফিসার : এ দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছ?

হযরত মাদানী : অর্থাৎ– এর পরিণতি মৃত্যু। আর সেজন্যই আমার কাফনের কাপড় আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

অফিসার : এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। যাকে আমরা ফাঁসি দেই, তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা আমরাই করি।

হযরত মাদানী : ইংরেজ জালেমদের কাফন নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে আমার লজ্জা হয়।

হাঁ ভাই! এই ছিল আমাদের আকাবিরে দীনের ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তা। তাদের রক্তঝরা কুরবানির বিনিময়ে আজও দীন সংরক্ষিত আছে। আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

তালেবে ইল্‌মরা গোটা জাতির মুহসিন

মনের কানে একটি কথা শুনুন। এই যে চাটাইতে শয়নকারী, বিরস শুকনো রুটি আহারকারী তালেবে ইল্‌মরা আছে, এরাই গোটা জাতির মুহসিন ও কর্ণধার। গোটা জাতির ওপর এদের ইহসান ও অনুকম্পা রয়েছে। কারণ কী? একটু যৌক্তিকভাবে বিষয়টি শুনুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ চার কারণে আগমনকারী বিপদাপদ দূর করে দেন।

এক. যখন মুআয্যিন আযানের শব্দমালা উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহর এই বড়ত্বের ঘোষণা আল্লাহর নিকট এতই প্রিয় যে, আযানের শব্দমালার উসিলায় জনপদ থেকে তিনি বিপদাপদ দূর করে দেন। মনে রাখবেন, এই তালেবে ইল্মরাই আগামীতে আল্লাহর নাম সমুন্নত করবে।

দুই. মুমিন বান্দা যখন ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে– লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, তখন এই তালবিয়ার শব্দমালা আল্লাহর নিকট এত ভালো লাগে যে, এগুলো শুনতেই তিনি জনপদ থেকে আগত বালা-মসিবত দূর করে দেন।

তিন. কোনো মুজাহিদ যখন দীনকে সমুন্নত করতে গিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জে ওঠে, তখন সেই আওয়াজ যতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, ততটুকু পর্যন্ত জনপদকে আলল্লাহ বালা-মসিবত থেকে মুক্ত করে দেন।

চার. হাফেযে কুরআন যখন কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করে, তখন এই আলহামদুলিল্লাহর উসিলায় আল্লাহ তা'আলা তার ওপর আগমনকারী বিপদাপদ দূর করে দেন।

আজকের সমাজে যদি হাফেযে কুরআন আর ওলামায়ে কেরাম না থাকতেন, তাহলে সমাজের নগ্নতা-অল্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, গান-বাজনা ইত্যাদি আমাদেরকে কোনো-না-কোনো আযাবের মধ্যে পতিত করেই ফেলত। আজও যে আমরা বেঁচে আছি, তা কাদের কারণে? এসব হাফেযে কুরআন ও ওলামায়ে কেরামের কারণে। সুতরাং এই তালেবে ইল্মরা গোটা জাতির মুহসিন। ওলামায়ে কেরাম এ-জাতির মুহসিন। এদের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের কৃতকর্মগুলোকে ঢেকে রেখেছেন। আজ যে তারা আনন্দ করছে; আসলে তা এক ধরনের সুযোগ। আযাবকে স্থগিত করে রাখা হয়েছে এসব তুলাবা ও ওলামা হযরতের কারণে।

কোন-কোন জিনিসের দর্শন ইবাদত

হাদীছে এসেছে, কয়েকটি জিনিসের দর্শন লাভ করা ইবাদত।

এক. বাইতুল্লাহর দর্শন ইবাদত।

দুই. যমযমের কূপের ভেতর দৃষ্টিপাত করা ইবাদত।

তিন. কুরআনের অক্ষরগুলো দেখা এবং তেলাওয়াত করা ইবাদত।

চার. মা-বাবার চেহারাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে দেখা ইবাদত।

পাঁচ. ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাথে কোনো আলেমের চেহারার দিকে তাকানোও ইবাদত। হাদীছে এসেছে–

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا

'তোমরা হয়ত আলেম হও, না হয় তালেবে ইল্‌ম হও, না হয় শ্রোতা হও, নয় তাদের মহব্বতকারী হও।'

কেউ আলেম হলো না, তালেবে ইল্‌মও হতে পারল না, তা হলে কমপক্ষে আলেমের সঙ্গে মহব্বতকারী তো হতে পারে। তা হলে বলুন, আপনারা কি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, আমরা এসব তুলাবা ও ওলামা হযরতের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক রাখব? আল্লাহ আপনাদের এই মহব্বতকে কবূল করুন। আমীন।

হাশরের মাঠে আলেমগণের সম্মাননা

হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামকে দাঁড় করিয়ে বলবেন–

يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَا! لَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ لِيُعَذِّبَكُمْ

'হে আলেমসম্প্রদায়! আমি তোমাদের সিনায় এজন্য ইল্‌ম রাখিনি যে, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে আযাবে পতিত করব।'

اِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

'তোমরা যাও; আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিলাম।'

আল্লাহর পথে

ওলামায়ে কেরামের সম্মানে আরেকটি হাদীছে আছে,

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

'যেব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই আছে।'

সুতরাং যেসব তালেবে ইল্‌ম ঘর থেকে বের হয়ে মাদরাসায় এসেছে এরা সবাই কোথায় আছেন? আল্লাহর পথে আছেন। আর এই শব্দগুলো কার মুখ থেকে বের হয়েছে? নবীজির মুবারক মুখ থেকে বের হয়েছে, এরা সবাই আল্লাহর পথে আছে। যত সময়ই পার হচ্ছে, আল্লাহর পথেই পার হচ্ছে।

অতীত পাপসমূহের কাফফারা

অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ لِمَنْ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى

'যে ইল্‌ম শিখল, তার এই শিক্ষা লাভ করা অতীতের সকল পাপসমূহের জন্য কাফফারাস্বরূপ।'

যাহোক, এসব ওলামা ও তুলাবাদের হিম্মত ও সাহস ভাঙার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র চলছে। আমি আপনাদের বলছি, বুকে সাহস রাখুন। হিম্মত হারাবেন না। আপনার দায়িত্ব হলো কুরআনের হেফাযত করা, দীনের হেফাযত করা। প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই দেবেন।

সাহস হারাবেন না

সাহস হারাবেন না। সারাটা জীবনকে কুরআন ও হাদীছের উত্তম আদর্শ শেখা ও শেখানোর মধ্যে লাগিয়ে দিন। কবি বলেন–

بڑے پسند ہیں قافلے نبھا سکو تو ساتھ دو
یہ زندگی کے فاصلے، مٹا سکو تو ساتھ دو
ہزار دکھ یہاں ہزار آزمائشیں
ہزار دکھ، ہزار بار، اٹھا سکو تو ساتھ دو

'আমাদের এই কাফেলা বড়ই চমৎকার। নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে আমাদের সঙ্গে এসো। জীবনের এই দূরত্ব যদি মিটাতে পার, তবে আমাদের সঙ্গে এসো। এখানে হাজারো দুঃখ-কষ্ট, হাজারো পরীক্ষা। এই কষ্ট বারবার আসবে। সহ্য করতে পারলে এসো, আমাদের কাফেলায় এসো।'

নিয়ত করুন, কুরআনকে বুকে জড়িয়ে জীবন পার করে দেব। কুরআন শিখা ও শেখানোই হবে জীবনের একমাত্র কাজ। এই পথ থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না।

কুফরি শক্তিকে নস্যাৎ করে দিন

সারা পৃথিবীর কুফরি শক্তিগুলো চায়, ইসলাম ও মুসলমান চিরতরে দুনিয়া থেকে মিটে যাক।

কবি ইকবাল এ সম্পর্কে বলেন–

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا

روح محمد اس کے جسم سے نکال دو

'ক্ষুধার জ্বালা সহ্যকারী সেই মানবগুলো যারা মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না, তোমরা তাদের দেহ থেকে মুহাম্মদী প্রাণগুলো বের করে দাও।'

কিন্তু এমন কখনো হয়নি, হবেও না। ইনশাআল্লাহ আমাদের অন্তর থেকে সুপ্ত ঈমান কেউ বের করতে পারবে না। কোনো দিনও না। সুতরাং আমাদের করণীয় হলো,

তাকওয়া ও পবিত্রতার জীবন যাপন করি।

নিরাপত্তার জীবনকে আপন করে নিই।

আখলাক ও মহব্বতের জীবনকে আপন করে নিই।

সমাজে বসবাসের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী চলে উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করি।

আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত হয়ে বসবাস করি।

আসুন, নববী আদর্শের দৃষ্টান্ত হয়ে যাই

আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

যেখানেই যাবেন, এমনভাবে চলবেন, যেন আপনাদের দেখে মানুষের মধ্যে নবীজির কালেমা, তার শিক্ষা ও আদর্শের স্মরণ তাজা হয়ে যায়। এমনভাবে খানা খাবেন, যেন নবীজির সুন্নত স্মরণে এসে যায়। এমনভাবে লেনদেন, কথাবার্তা, চলাফেরা করবেন, যেন আপনাদের দেখে তাদের অন্তরে নবীযুগের আদর্শ মনে পড়ে যায়। আপনারা এমনভাবে নিজেদের ভেতর-বাহির সমৃদ্ধ করে তুলুন, মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা আপনাদের মস্তিষ্কের পরীক্ষা নেবে, তখন যেন তা ইল্‌ম ও মারেফাতের আলোয় আলোকিত পাই। যখন অন্তরের পরীক্ষা নেবে, তখন যেন তাতে আল্লাহর মহব্বতের উত্তাল তরঙ্গ চোখে পড়ে। যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরীক্ষা নেয়, তবে যেন তা সুন্নতের অলংকারে অলংকৃত থাকে। নিজেকে এভাবে গড়ে দেখুন আল্লাহ আপনার প্রতি কী পরিমাণ রহমত বর্ষণ করেন!

মাওলানা হওয়ার অর্থ কী?

মাওলানা-মৌলভী হওয়ার অর্থ চেয়ে-চেয়ে আহার করা নয়; বরং মাওলানা হওয়ার অর্থ হলো,

ইমাম আবূহানীফা (রহ.)-এর ফাসাহাত তথা শক্তিশালী বর্ণনাশৈলী।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর সাহসিকতা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ইস্তিকামাত তথা দৃঢ়তা।

ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর ইত্তেবায়ে সুন্নাত বা সুন্নতের পাবন্দী।

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর অন্তরের স্বচ্ছতা।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর ইল্‌মি গভীরতা ও দূরদর্শিতা।

শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর বিচক্ষণতা।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের তামান্না।

হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর হেকমত ও প্রজ্ঞা।

হযরত থানুবি (রহ.)-এর তাছাওউফ তথা আত্মশুদ্ধি।

হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর আত্মনিবেদন।

আত্মোৎসর্গকারী কাফেলাটি

এরা হলেন দীনের জন্য আত্মোৎসর্গকারী একটি কাফেলা, যারা দীনের জন্য নিজের সর্বস্ব কোরবান করেছিলেন। তাদের কুরবানির বদৌলতে আজও এ-অঞ্চলে দীন টিকে আছে। তাদের যোগ্য উত্তরসূরীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারাও শত দুঃখ-বেদনা সহ্য করে দীনকে বুকে জড়িয়ে আছে। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এই কাফেলা নিজের রক্ত-ঘাম ও জান-মাল উৎসর্গ করে দীনের খেদমত করে যাবে।'

আমার আযীয তালাবা!

দেখো, রেলগাড়ির কয়েকটা বগি থাকে। একটা ফার্স্ট ক্লাসের বগি, আরেকটা সেকেন্ড ক্লাসের বগি এবং আরেকটা হয় থার্ড ক্লাসের বগি। ফার্স্টক্লাসের বগিতে এয়ারকন্ডিশনও থাকে, উন্নত আসবাবপত্রও থাকে, পরিবেশও হয় চমৎকার। যথেষ্ট আরাম-আয়েশের স্থান সেটি। পক্ষান্তরে থার্ড ক্লাসের বগির অবস্থা থাকে খুবই খারাপ। মরিচা পড়ে যায়, অপরিষ্কার, আসবাবপত্র অনুন্নত। কিন্তু এই থার্ড ক্লাসের বগিটি যদি ফার্স্ট ক্লাসের কড়ার

সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকতে পারে, তখন যেখানেই ইঞ্জিন পৌঁছাবে, ফার্স্ট ক্লাসের বগির সাথে-সাথে থার্ড ক্লাসের বগিটাও সেখানে পৌঁছে যাবে।

একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই উম্মতের উদাহরণ হলো রেলগাড়ির একটা বগির মতো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এর ইঞ্জিনের মতো। আর এই ইঞ্জিনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির স্টেশনের দিকে ছুটে চলছে। সাহাবায়ে কেরাম এই উম্মতের ফার্স্ট ক্লাসের বগি, আউলিয়ায়ে কেরাম হচ্ছেন সেকেন্ড ক্লাসের বগি আর আমি-আপনি হলাম এই উম্মতের থার্ড ক্লাসের বগি। আমাদের ঈমান-আমলের অবস্থা তো খুবই খারাপ; কিন্তু যদি আসলাফ তথা পূর্বসূরীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়, সেই নেসবতকে ধরে রাখার জন্য জান-প্রাণ মেহনত করি, তা হলে আশা করা যায়, তাদের ইঞ্জিন যে জান্নাতের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটবে, আমরাও সেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারব। আল্লাহ রব্বুল ইযযত আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির জীবন দান করুন। সুতরাং হে আসলাফের অনুসরণকারী জাঁনেসার কাফেলা!

কুরবানি ও আত্মদানের স্মৃতিগুলো যারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ,

আল্লাহর ইশ্‌ক ও মহব্বতের সন্ধানে যারা ছুটে চলছ,

পূর্বসূরীদের নেসবতগুলোকে হৃদয়ে স্থাপনকারী বন্ধুরা! এখন ইল্‌ম ও হেকমত-এর আলো জ্বালাও।

চারদিকে শুধু আঁধার আর আঁধার!

মানুষের হৃদয় জয় করার উপায়

আজ বড় বেশি প্রয়োজন হলো, আমরা মাদরাসার মধ্যে তাকওয়া, তাহারাত ও উন্নত আখলাকের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুব বেশি নজর দেব, যেন ছাত্ররা নবীজির আদর্শগুলো শেখার সাথে-সাথে আমলি জীবনেও তা নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং আমরা

ঘরে থাকব ভালো সন্তান হিসেবে।

ভালো ভাই হিসেবে।

উত্তম স্বামী হিসেবে।

আদর্শ বাবা হিসেবে।

উত্তম বন্ধু হিসেবে।

উৎকৃষ্ট মুমিন হিসেবে।

যেন বাবা-মা আমাদের চলাফেরা দেখে প্রান খুলে দু'আ করে। আজ যদি এভাবে সবার হক আদায় করে চলতে পারেন, তা হলে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার মাকবূল ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

কবুলিয়্যাতের চিন্তা করুন

আমরা যদি মাদরাসার নূরানি পরিবেশে থেকেও গুনাহ ছাড়তে না পারি, তা হলে আমাদের চেয়ে বঞ্চিত আর কেউ থাকবে না। আল্লাহর পথে থেকেও আল্লাহর দরবারে আমাদের কোনো আমলই কবূল হবে না। এ তো দু-ধরনের মাহরুমী। চাটাই আর শক্ত মাটিতে বসে-বসে হাঁটু ও টাখনুতে দাগ ফেলে দিলাম; অথচ আমাদের কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবূল হলো না! বলুন, এর চেয়ে বড় মাহরুমী আর কী হতে পারে? না দুনিয়ার সাধ নিলাম, না আখেরাতের কিছু পেলাম!

হে আল্লাহ! দুনিয়া তো আমাদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, আপনি আমাদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন না। আপনি ব্যতীত আমাদের যে আর কেউ নেই। আয় আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারেই আশার আঁচল বিছিয়েছি, আপনার দরবারেই মাথা ঝুঁকিয়েছি, আপনার কুরআনকে বুকে জড়িয়ে আপনার দরবারেই হাঁটু গেড়ে বসেছি। দয়াময় প্রভু! আমরা যেমনই হই নিজগুণে ক্ষমা করে আমাদের কবূল করে নিন।

হে করুণাময়! পাপের কারণে আপনার দরবার থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। আপনার রহমতের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কালিমাযুক্ত অন্তরগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিন। আমাদেরকে আপনার গোলামির আদর্শ জীবন দান করুন। কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন আপনার নবীর সামনে আপনার মুখোমুখি হব, তখন যেন বলতে পারি। হে আল্লাহ-

تیرے گھر کو جبینوں سے بسایا ہم نے

تیرے قران کو سینوں سے لگایا ہم نے

'তোমার কা'বাকে সেজদা দিয়ে আবাদ করেছি।

তোমার কুরআনকে বুকে জড়িয়ে রেখেছি।'

যেসব তালেবে ইল্‌ম কুরআনের হাফেয হয়ে গেছে, তাদের এখন গন্তব্য হলো আলেমে দীন হওয়া। হাফেযে কুরআনের সাথে-সাথে এবার আলেমে

কুরআনও হতে হবে। আলেমে কুরআনও হতে হবে এবং আশেকে কুরআন হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির জীবন দান করুন। পাপাচার ও অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং একজন শান্তিকামী খাঁটি মুসলিম হয়ে বসবাস করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মশুদ্ধির চিন্তা

'ঠিক এভাবেই 'মাকামে ইহসান' তথা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার কল্পনার সাথে ইবাদত করতে চেষ্টা করা দীনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অতএব তা অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। কেউ একথা বলতে পারবে না, আমার জন্য এই কাইফিয়্যাত অর্জন করা আবশ্যক নয়। এটি দীন। যদি এ কাজকে গুরুত্ব না দেই, তা হলে দীনের একটা অংশ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। সুতরাং ওস্তাদের জন্য তা যেমন আবশ্যক, ছাত্রের জন্যও আবশ্যক, কেরানির জন্যও আবশ্যক, বাবুর্চির জন্যও আবশ্যক। কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। এখন এই মাকাম কীভাবে অর্জন করতে হবে? তো এ-ব্যাপারে আমরা কারো ওপর জোর করি না যে, এ কাজ এভাবে করো; এভাবেই বেশি ফায়দা!

আমাদের বুযুর্গদেরকে আল্লাহ অনেক গভীর অন্তরদৃষ্টি দান করেছিলেন। তাঁরাও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে এই নেয়ামত দান করেছেন।'

আত্মশুদ্ধির চিন্তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

ইসলামে মূলনীতি নির্ধারণ

আমরা পূর্বে থাকি কিংবা পশ্চিমে; উত্তরে কিংবা দক্ষিণে; দুনিয়ার যেকোনো অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখি। তারা কুরআনে মাজীদ থেকে দীনে ইসলামের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকে। এর মৌলিক কারণ কী? এর মৌলিক কারণ হলো, শরীয়তে মূলনীতি ঠিক করে দেওয়া আছে এবং এর আসবাব-উপকরণ উম্মতের ওলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, এখন এর অর্জনের যে-পদ্ধতিই আপনার যমানায় চালু আছে, তাকেই ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু ফয়সালা কে করবে? সেই যমানার ওলামা ও মাশায়েখগণ যারা আছেন, তারা নিজ-নিজ অঞ্চলে বাস্তবতা অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কথাটি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই।

দীনে ইসলাম আমাদেরকে ইল্‌মে শরীয়াহ শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছে, ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনা করেছে, ইল্‌মের ফজিলত শুনিয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ

'(দীনি) ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ।'

কিন্তু ইল্‌ম কীভাবে অর্জন করতে হবে এ-পথটি নির্ধারিত না করে উন্মুক্ত রেখেছেন। এই ময়দান খোলা ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, ভিন্ন-ভিন্ন যুগের চাহিদা ভিন্ন-ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

কখনো এই ইল্‌ম শুধু ওস্তাদ হতে অর্জন করা যায়। যেমন– সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) অর্জন করেছেন। আবার কখনো এ-লক্ষ্যে পৃথকভাবে কিতাবাদির প্রয়োজন পড়ে। যেমন এ যুগে । তো মূলনীতি ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, ইল্‌ম অর্জন করতে হবে। কিসের ইল্‌ম অর্জন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে এর পদ্ধতি কী হবে এসবের দায়দায়িত্ব যুগের ওলামায়ে কেরামের কাঁধে অর্পিত করা হয়েছে। সমকালীন ওলামায়ে কেরামই সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর যখন তারা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তখন সেটাই অধিকতর সঠিক কর্মপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও হাদীছের সুবিন্যস্ত কোনো কিতাব ছিল না। এখন যদি কোনো তালেবে ইল্‌ম বলে, আমি দেখতে চাই, কোনো সাহাবি কি হাদীছের কোনো কিতাব পড়েছেন? তা হলে সে এমন কোনো কিতাবের সন্ধান পাবে না। হাঁ; কতিপয় সাহাবার নিকট নিজস্ব কিছু নোট থাকতে পারে, যা তারা নিজেদের জন্য লিখেছেন। কিন্তু পৃথকভাবে সুবিন্যস্ত কোনো কিতাব এমন পাওয়া যাবে না, যেখানে নবীজির সকল 'কাওলী' ও ফে'লী' (কথা ও কাজসংশ্লিষ্ট) হাদীছ গুলো জমা করা হয়েছে। বরং একাজ পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম করেছেন। কারণ, তাদবীনে হাদীছ তথা হাদীছ সংকলনের যুগ শুরু হয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী হতে।

তারপর আজকের এযুগেও এর একটি উদাহরণ আছে, যাকে 'দরসে নেযামী' বলে। আল্লাহর কোনো এক নেক বান্দা সর্বপ্রথম এই পাঠ্যসূচিটি তৈরি করেছিলেন। এরপর আল্লাহ তাকে এমন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন যে, এই নেসাবে তা'লীম তথা পাঠ্যসূচি পড়েই অগণিত মানুষ আলেম বিল্লাহ হয়েছেন। আজ যদি কোনো শিশু এসে বলে, আমি আলেম হতে চাই, তা হলে আপনার পরামর্শ কী হবে? এটাই তো হবে যে, যাও; দরসে নেযামী পড়ো! কিন্তু 'দরসে নেযামী'-র শব্দটি না কুরআনে আছে, না হাদীছে আছে। কেউ যদি এসে বলে, আমি হাদীছ পড়তে চাই, তাহলে আপনি তাকে বলবেন, সিহাহ্ সিত্তাহ পড়ো। কিন্তু 'সিহাহ্ সিত্তা' শব্দটি না কুরআনে আছে; না হাদীছে আছে।

এখন কেউ যদি কোমর বেঁধে বসে যায় যে, আমি তো তা-ই করব, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। আমি তো তা-ই করব, যা নবীজি করেছেন; পরবর্তীদের আমল ও ইজতিহাদ এগুলো সবই বিদআত, তাহলে বলুন, বোখারি শরীফ পড়ার দলিল কথা থেকে আনব? তিরমিযী শরীফের কথা হাদীছে কী করে পাওয়া যাবে? তখন তাকে একথা বোঝাতে হবে যে, ভাই! শরীয়ত আমাদেরকে ইল্‌ম অর্জন করার আদেশও দিয়েছে আবার এর ফজিলতও বলে দিয়েছে; আর সেই কাঙ্ক্ষিত ইল্‌ম অর্জনের জন্য 'দরসে নেযামী' একটি উসিলা ও মাধ্যম। কারণ, সকল ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বিষয়ে বৈধতার পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন, তখন সে বিষয়টি শরীয়তেরই একটি অংশ হয়ে যায়। সুতরাং তাকে কাজে লাগানোর মধ্যে কোনও সমস্যা নেই।

আরও একটি উদাহরণ দেখুন। দেশের সেনাবাহিনী, যারা দেশের সীমান্ত প্রহরার কাজও করে আবার দীনের প্রতিরক্ষার কাজও করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ হত, তখন ঘোড়া ব্যবহার হতো, উট ব্যবহার হতো, তলোয়ার, বর্শা, তীর-কামান ব্যবহার হতো। কিন্তু এখন যদি জনাব সূফী সাহেব বলেন, আমি হলাম সেনাপ্রধান, সুন্নতপরিপন্থি কোনো কাজ আমিও করব না, আমার বাহিনীকেও করতে দেব না। এই বলে নিজের বাহিনীর সকলের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে তীর-তলোয়ার, ঢাল-বর্শা ইত্যাদি ধরিয়ে দেয়, তাহলে বলুন, প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কী দশা হবে? তাকে যদি বলা হয়, আপনি ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করুন, সে বলবে, এসব তো সুন্নতের খেলাফ! নবীজির যুগে তো এসব কিছুই ছিল না! তো কেউই তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না; বরং যথাযথভাবে প্রতিরক্ষা করতে হলে এ-যুগের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং সেই হিসেবেই জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এর জন্য শরীয়ত উসূল বাতলে দিয়েছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

'যতটুকু সম্ভব নিজেদের কাছে শক্তি-সামর্থ্য প্রস্তুত রাখো।'[১]

এখন যদি কেউ বলে, এটি হলো 'রুহানী শক্তি'। না ভাই! এখানে অভ্যন্তরীণ শক্তির কথা বলা হয়েছে। সেটা কীভাবে? আগে ইরশাদ হচ্ছে–

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬০

مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

'ঘোড়া পালন করো। অর্থাৎ– এমন শক্তি অর্জন করো, যেন তোমাদের দুশমন এবং আল্লাহর দুশমন তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে যায়।'[১]

তাদের যেন তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও না হয়। এ হলো কুরআনী উসূল। কুরআনের এই উসূলের আওতায় সেনা প্রধানের কাঁধে এই দায়িত্ব এসে যায় যে, তারা নিজের দেশের মানুষ ও ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য যুগোপযোগী আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা স্থির করবে। এখন কোনো সেনানায়ক যদি বলে, আমার স্যাটেলাইট টেকনোলজির প্রয়োজন, তাহলে তা-ও শরীয়তের আওতাভুক্ত বিষয় হবে। এর জন্যও ছাওয়াব পাওয়া যাবে। অথচ হাদীছের কোথাও স্যাটেলাইটের আলোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বুঝতে হবে, এটা লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটা মাধ্যম। আর উসিলা ও মাধ্যম যেহেতু নির্দিষ্ট আছে এবং ওলামায়ে উম্মতও একমত যে, এ বিষয়টি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত, তা হলে এ কাজ করা শরয়ীভাবে দায়িত্বে এসে যাবে।

মনের পরিচ্ছন্নতার আদেশ

উল্লিখিত উদাহরণদুটিতে যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে দেখবেন, শরীয়ত নিজেদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার আদেশও দিয়েছে এবং একে পছন্দও করেছে। মনের পরিচ্ছন্নতাকেই 'তাযকিয়া' বলে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

'নিশ্চয়ই সফল হয়ে গেছে সে, যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছে। যে নিজের মনকে বিলাসিতা হতে পবিত্র করে নিল, সে সফলতা লাভ করল।[২]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

'অবশ্যই সফল সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে পবিত্র করে নিল। আর ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে, যে তাকে অপবিত্র করল।'[৩]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬০
২. সূরা আ'লা : আয়াত ১৪
৩. সূরা শাম্‌স : আয়াত ৯, ১০

কিন্তু 'তাযকিয়ায়ে নফস্' তথা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায় কী? পদ্ধতি কী? এসবের দায়দায়িত্ব উম্মতের মাশায়েখগণের কাঁধে অর্পিত করা হয়েছে। এবার আপনারাই নির্ধারণ করুন কোন যুগে কেমন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

এযুগে অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা কীভাবে হয়?

আজ আমাদের অন্তরে যে-আবর্জনাগুলো জমে, তা কিন্তু পূর্ববর্তী লোকদের কল্পনায়ও আসত না। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন যে, একটি কাপড় ময়লা হয়ে গেল। তাতে শুধুই মাটি লেগেছে। একে পরিষ্কার করার জন্য শুধু সাবান-পানিই যথেষ্ট; অন্য কিছু লাগবে না। কিন্তু কেউ যখন তা পরিধান করে রঙের কাজ করে কিংবা প্রিন্ট করে এবং রঙ কাপড়ে লেগে যায়, তখন শুধু সাবান-পানিতে কাজ হবে না। কারণ, রং উঠাতে হলে তারপিন বা কেরোসিন লাগে। এ ছাড়া রং উঠবে না। এমনিভাবে কিছু পানি এমনও আছে, যা কাপড়ে লেগে গেলে শুধু সাবান-পানি দ্বারা পরিষ্কার হয় না। আগের দিনে দোয়াতের কালি ছিল এমন যে, কাপড়ে লেগে গেলে সাবান দিয়ে উঠানো যেত না। এরপর এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলল। অবশেষে এমন কেমিক্যাল আবিষ্কার করা হলো, যা দাগযুক্ত কাপড়ে লাগাতেই তা ধবধবে সাদা হয়ে যাবে।

দাগ দূর করার ডিপ্লোমা

এ মুহূর্তে গোটা ইউরোপে এটি একটি পৃথক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে যে, বিভিন্ন জিনিসপত্র হতে দাগ কী করে দূর করা সম্ভব। এর ওপর পরিপূর্ণ ডিপ্লোমা করা হয়। আমি একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি পড়েছেন? সে বলল, জিনিসপত্রের দাগ দূর করার ডিপ্লোমা। ইয়া আল্লাহ! বলে কী? আমি বললাম, ভাই! এটি কী জিনিস? সে ব্যখ্যা দিল, ঘরে বিভিন্ন ধরনের কার্পেট ও দামি পর্দা থাকে। এমনিভাবে পানাহারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আসবাবপত্র বা কাপড়চোপড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা দাগ লাগায়। এগুলো ধুলেও ওঠে না। এই দাগ উঠানো একটি পরিপূর্ণ সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে। আগের যুগে এসবের প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। না কার্পেট ছিল, না কার্পেটের দাগ। কাপড়চোপড়ও হতো সাদামাটা আর জীবনযাপনও ছিল সরলসোজা। কোনো দাগ যদি লেগেও যেত, তা হলে সামান্য ধোওয়াতেই পরিষ্কার হয়ে যেত। আর এখন তো আর তেমন অবস্থা নেই।

যাহোক এটা আজকের সময়ের প্রয়োজন। পূর্বে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তো কাপড়ের দাগ দূর করার জন্য আজকাল যেমন নতুন-নতুন কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হয়, ঠিক অন্তরের অবস্থাও এমন। অন্তরে ও মন-মস্তিষ্কে যেসব দাগ আজকাল লাগে, সেগুলো পরিষ্কারের জন্যও বিভিন্ন রকমের রূহানী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এটি ভিন্ন যুগ

আগের দিনগুলো ছিল বড়ই পবিত্র। হায়া-শরম মানুষের মধ্যে ব্যাপক ছিল। গুনাহ ও নির্লজ্জতা ছিল না বললেই চলে। এ থেকে অনুমান করুন, যদি কেউ সে যুগে পাগল হয়ে যেত, তা হলে সে খুব বেশি আযান দিতে থাকত। এতে লোকেরা বুঝে ফেলত, এ ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। কারণ, আযান সারাক্ষণ দেওয়ার জিনিস নয়। চিন্তা করুন! পাগলের পাগলামির মধ্যে পর্যন্ত হায়া ও শালীনতা ছিল! এ ছিল সে যুগের পাগলের অবস্থা! আর আজকাল আমাদের অনেক বুদ্ধিমানরাও অনায়াসে গালাগাল করতে লজ্জা পান না!

তো এটা হলো ভিন্ন যুগ। লজ্জার আরেকটি ঘটনা শুনুন। এক যুবক ইমাম আযম (রহ.)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, হযরত! নারী ও পুরুষের গুপ্তাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কী? এবার বলুন, বেটা যুবক হয়ে গেছে; এতদিনেও সে নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্য বুঝতে পারছে না। বিস্ময়ের ব্যাপার না? কিন্তু ঘটনা সত্যই ছিল। কারণ, যুগটাই ছিল এমন নিষ্পাপ ও পবিত্র যে, প্রয়োজনের পূর্বে তারা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না। আর এখন পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাদের কাছে যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস করুন, উত্তর পেয়ে যাবেন। আগের দিনের লোকদের মধ্যে মন পবিত্র রাখার ব্যাপারটাই ছিল আলাদা। এখন সে বিষয়ে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। এ-কারণে মনের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব শরীয়ত মাশায়েখগণের কাঁধে ন্যস্ত করেছে যে, সালেকীন ও আত্মশুদ্ধির সাধকদের এ পরিমাণ সাধনা করাতে হবে, যেন তাদের অন্তর ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাষার ব্যাকরণশাস্ত্র

আরবি ভাষার ব্যাকারণশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ হলো 'ইল্‌মুস সরফ' ও ইল্‌মুন নাহব্'। এক তালেবে ইল্‌ম যদি সরফের গর্দান মুখস্থ করে–

ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا فَهُوَ ضَارِبٌ

আর তাকে দেখে অপর ব্যক্তি মন্তব্য করে, আরে! এ কী করছে? সুন্নত পরিপন্থি কাজ! তাহলে আপনি তাকে কী বলবেন? তাকে অবশ্যই বলবেন, ভাই! তোমার মাথাটা ঠিক করো। এই তালেবে ইল্‌ম মূলত একটি শাস্ত্র ও ভাষাজ্ঞান অর্জন করছে। এর দ্বারা সে আরবি ভাষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা লাভ করবে যেন কুরআন ও হাদীছের ইল্‌ম অর্জন করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এটা আমাদের দীনি ও শরঈ প্রয়োজন। আজ সেই নাহব-সরফ আরো বিস্তারিত ও সুবিন্যস্তভাবে আমাদের সামনে এসে গেছে। এখন এটি একটি পরিপূর্ণ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। অথচ সাহাবায়ে কেরামের যুগে এই নাহব শাস্ত্র মাত্র তিনটি বাক্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত আলী (রাযি.) বলেছিলেন, 'সকল ফায়েল মারফূ হয়, সকল মাফউল মানসূব হয় এবং মুযাফ ইলাইহি মাজরুর হয়।' ব্যস! কথা এতটুকুই! এ দিয়ে তিনি ইল্‌মুন নাহব্ বুঝিয়ে দিয়েছেন। আজ তো মাশাআল্লাহ ইল্‌মুন নাহব্-এর ওপর পৃথকভাবে পরিপূর্ণ কিতাব তৈরি হয়ে গেছে। 'হেদায়াতুন্নাহব্' সে রকমই একটি কিতাব। ছাত্ররা পড়তে-পড়তে জীবন যাওয়ার উপক্রম! কেন এসব? এর উত্তর স্পষ্ট হয়ে গেছে।

যাহোক, উল্লিখিত সবগুলো বিষয় সময়ের সাথে-সাথে প্রয়োজন অনুসারে বাস্তবায়নে আনতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো শরীয়ত নির্ধারণ করেই দিয়েছে। যেমন–

ইল্‌ম অর্জন করা।

ইল্‌মের ফজিলত।

দুশমনের প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি।

এর কারণ কী? এর মাধ্যম কী হবে? প্রক্রিয়া কী হবে? এসবের ব্যাপারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে যে মুজাহিদ ও সেনারা রয়েছেন, তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন, যুগের ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণই এসব নির্ধারণ করবেন।

যিকির ও সুলুকের জন্য সহায়ক কিছু পদ্ধতি

সুলুক ও যিকিরের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, এর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যা তাদের জন্য চিকিৎসামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন– কাউকে বললাম, আপনি মোরাকাবা করুন! তো সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও বলে দেই যে, চোখ বন্ধ রাখবেন। কিন্তু এটি কোনো ফরজ কাজ নয়। 'মাথা ঝুঁকিয়ে রাখবেন। এটিও ফরজ নয়। কেন? আল্লাহওয়ালারা কি চোখ না খুলে যিকির করেন?

এসব আসলে নিয়মের খাতিরে তাদের বলা হয়। কারণ, আল্লাহর বান্দা নতুন-নতুন মোরাকাবা করছে। চোখ খোলা থাকলে মোরাকাবা রেখে তামাশা দেখতে থাকবে। তাই তাকে বলা হয়, চোখ বন্ধ রাখো; একাগ্রতা এসে যাবে। তো একাগ্রতা অর্জনের জন্য এমন আমল তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেছেন। হাদীছে আছে, যখন নবীজির ওপর ওহী অবতীর্ণ হতো, তিনি চাদর দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে নিতেন। আজ যদি আমরাও মোরাকাবার সময় রুমাল দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে নিই, তাহলে এটি কি শরীয়তপরিপন্থি কোনো কাজ হয়ে যাবে? কিছু তালেবে ইল্‌ম এমন আছে, তাদের যদি মোরাকাবা করতে বলি, তারা বলে- এটা তো হাদীছের কোথাও পাওয়া যায় না! আসলে কথাটা বুঝতে হবে যে, হাদীছে পাওয়া যায় 'মনকে পরিচ্ছন্ন করো! আবার এ-ও পাওয়া যায় যে, 'যিকির মানুষের অন্ত রকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এসব কথা তো পাওয়া যাবে; কিন্তু কোন্ বান্দার জন্য কোন্ পদ্ধতি উপকারী– উচ্চৈঃস্বরে, না নিম্নস্বরে! 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিকির, নাকি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির এসব বিষয় নির্ধারণের দায়িত্ব মাশায়েখগণের কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে। এবার তারা যে তরতীব বলে দেবেন, তা-ই করতে হবে; এতেই কল্যাণ নিহিত।

মৃত্যুর মোরাকাবা

কোনো-কোনো শাইখ মৃত্যুর মোরাকাবা করান। মৃত্যুর মোরাকাবা অর্থ হলো, বসে-বসে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করা। তারা বলেন, 'চিন্তা করো, আজ তো আমি নিজের ইচ্ছায় চোখ খুলতে এবং বন্ধ করতে পারি; একদিন আসবে, যখন এই চোখদুটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। শাইখ মৃত্যুর কথা কল্পনা করতে বলেন, যেন তাদের গাফলত ও উদাসীনতা দূর হয়ে যায়, আল্লাহর ধ্যান-নিমগ্নতা নসিব হয়ে যায় এবং সর্বক্ষণ আল্লাহমুখী হয়ে থাকার অভ্যাস হয়ে যায়। বলুন, এটি কি সুন্নতের পরিপন্থী কিছু?

রেসালাতের মাকসাদ ও তার বিভাগসমূহ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ায় আগমনের মৌলিকভাবে চারটি উদ্দেশ্য ছিল। সেই চারটি উদ্দেশ্যকে কুরআনে মাজীদ এভাবে বর্ণনা করছে–

يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

'যেন তিনি (প্রেরিত রাসুল মুহাম্মদ) তাদের সম্মুখে তাঁর কিতাব পাঠ করেন, তাদের তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ) করেন, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।'[১]

নবীজি আয়াতও তেলাওয়াত করতেন, সাহাবায়ে কেরামের তাযকিয়াও করতেন, তাদের ইল্‌মও শেখাতেন এবং হেকমতও শেখাতেন। তো উক্ত আয়াতে আল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে-চারটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি সেই চার কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করেছেন। এতে বোঝা গেল, এ চারটি কাজ দীনের ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগ বা শাখা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামেল ও মুকাম্মেল ছিলেন। সকল গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে উপযুক্ত সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ওই সকল বিভাগ ও শাখা-প্রশাখাগুলোতে বিস্তৃতি আসতে শুরু করল। এক সময় যা যা 'মুজমাল' ছিল, তা সময়ের সাথে-সাথে 'তাফসীল' হতে লাগল। ইল্‌মের বিভাগগুলো বিস্তৃত ও প্রশস্ত হতে লাগল যে, একজন যদি শুধু এক বিভাগে কাজ করতে-করতে নিজের গোটা জীবন নিঃশেষ করে দেয়, তবুও সেই বিভাগের কাজের হক আদায় হবে না।

যেমন– ইল্‌ম অন্বেষণকারীরা মাদরাসা নির্মাণ করল। তারা ইল্‌ম ও গবেষণার বিভাগটিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে লাগল যে, আমরা হলাম নবীজির ইল্‌মের ওয়ারিস; এটি আমাদের প্রিয়জনের উত্তরাধিকার। আমরা এই সম্পদকে বণ্টন করার মধ্যে জীবন ক্ষয় করে দেব। ফলে তাঁরা সারাক্ষণ পড়া ও পড়ানোর মধ্যে মশগুল থাকেন।

এমনিভাবে মাশাইখগণ তাযকিয়ার বিভাগটির নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছেন যে, আমরা যিকির করব, 'আল্লাহ-আল্লাহ' করব এবং বাতেনি রোগগুলোর চিকৎসাও করব। ফলে তাদের সাহচর্যে যারা আসে, তারা যতবড় পাপীই হোক, যতবড় অপরাধীই হোক আল্লাহ তাদের জীবনে পরিবর্তন এনে দেন, তাদের অন্তরগুলো আল্লাহপ্রেমে সিক্ত করেন। তো তারা এ বিভাগের কাজ করেন। এসব দীনেরই কর্মবিভাগ। এদের প্রত্যেকেই অসীম ছাওয়াবের মালিক হবে।

এমনিভাবে কেউ-কেউ বলেন, ঠিক আছে, আমরা আল্লাহর পথে বের হব, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করব, মানুষকে আল্লাহর দিকে, ঈমান ও

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪

আমলের দিকে আহ্বান করব, তো তারাও হকের ওপর থেকে দীনের কাজ করছেন। সুবহানাল্লাহ! এসবই দীনের কাজ। এগুলো দীনের কর্মবিভাগ। এগুলো আমাদের সকলের কাজ।

ভিন্ন বিভাগের কর্ম নিয়ে প্রশ্ন করবেন না

যদি আমরা নিজেদের কর্মব্যস্ততা কিংবা অদক্ষতার কারণে দীনের শুধু একটি বিভাগের কাজই করতে সক্ষম হই; অন্য বিভাগের কাজে সময় দিতে না পারি, তা হলে কাজ এক বিভাগেই করব, তবে অন্যদের প্রতি সম্প্রীতি ও ভালোবাসা রাখতে হবে। কারণ, তারাও তো দীনেরই কাজ করছেন। তালেবে ইল্মগণ যারা ইল্ম অর্জনের কাজ করছেন, তারা যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন, তাদেরকে ভালোবাসবেন; তাদের কাজের প্রতি প্রশ্ন ছুড়বেন না। যিকির ও আত্মশুদ্ধিওয়ালাদের দিকে প্রশ্ন ছুড়বেন না, বরং নিজের কর্মবিভাগে কাজ করতে থাকুন আর মনে অন্যদের প্রতি সম্প্রীতি পোষণ করুন, তাদের দু'আগুলোতে অংশগ্রহণ করুন; প্রয়োজনে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করুন। এমনিভাবে যিকিরওয়ালাদেরও উচিত, তারা যেন ওলামায়ে কেরামের বিরোধিতা না করেন। কারণ, তারাও দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। শরীয়তের হালাল-হারামের বিভিন্ন জটিল মাসআলা নিয়ে কাজ করছেন। নিজে শিখছেন এবং অন্যদের শেখাচ্ছেন। এটিও নবীওয়ালা কাজ। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'অবশ্যই আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'

এমনিভাবে যিকিরওয়ালারা তাবলীগওয়ালাদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়বেন না এবং তাবলীগওয়ালারাও যিকিরওয়ালাদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়বেন না যে, কী করছ ঘরে বসে-বসে? চলো, আল্লাহর রাস্তায় বের হও। সবাই আল্লাহর পথের কাজই করছেন। সুতরাং তাদের প্রতি সুধারণা ও সম্প্রীতিবোধ রাখতে হবে। একটি হাসপাতাল। এখানে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। এখানে যারা চিকিৎসাসেবা দান করেন, তারা সকলেই ডাক্তার। কেউ নাকের ডাক্তার, কেউ কানের ডাক্তার, কেউ হার্টের ডাক্তার। সকলের একটাই লক্ষ্য যে রোগীরা সুস্থ হয়ে যাক।

আজকাল তেমন মহান ব্যক্তিত্বদের খুঁজে পাওয়া তো খুবই কঠিন যেমনটি সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দীনের

সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত। যেমন– খুলাফায়ে রাশেদীন। মাশাআল্লাহ! তারা হুবহু রাসূলের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। যেসব মহান গুণ নবীজির মধ্যে ছিল, রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরও আল্লাহ সেসব গুণ দান করেছিলেন। তারা দীনের সবকটি বিভাগে পূর্ণ দক্ষতার সাথে কাজ করে গেছেন। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। কিন্তু আজকের অধঃপতনের এযুগে তেমন যোগ্য ও কামেল ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং যে-কর্মবিভাগের সঙ্গে যার সম্পর্ক বেশি, সে সেখানেই কাজ করতে থাকুক। এটিও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। যে যেখানে, যেভাবে, যে-ধরনের দীনের কাজ করছে, সবার সঙ্গে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখতে হবে। সবার জন্য কল্যাণের দু'আ করা উচিত এবং সবার প্রতি সুধারণা ও সবার জন্য শুভ কামনা থাকা উচিত।

দীনের প্রতিটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ

যদি কেউ বলে, অন্য সকল বিভাগের সবাই সেসব ছেড়ে শুধু এ-বিভাগের কাজ শুরু করুক, তা হলে বলতে হবে, তারা ভুল চিন্তায় আছে। কারণ, চোখের ডাক্তার যদি বলে, এই হাসপাতালের সব ডাক্তার চোখের ডাক্তার হয়ে যাও অথবা হার্টের ডাক্তার যদি বলে, এই হাসপাতালে সব হার্টের ডাক্তাররা থাকবে; কারণ, সমস্ত অঙ্গের মধ্যে হার্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হলে এই একমুখী সিদ্ধান্ত হবে ভুল সিদ্ধান্ত। তাকে বরং বোঝাতে হবে, হার্টের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নাক, কান, চক্ষুরও প্রয়োজন আছে। এমনিভাবে দীনের প্রত্যেক বিভাগের লোকেরা নিজ-নিজ কাজ করতে থাকবে। দীনের প্রতিটি শাখারই গুরুত্ব আছে। ইল্‌মের গুরুত্ব স্বস্থানে স্বীকৃত। যিকির তার নিজস্থানে প্রতিষ্ঠিত। দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব স্বস্থানে স্বীকৃত এবং দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

যাহোক সবাই নিজ-নিজ স্থানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাহেরি ও বাতেনি ইল্‌মের ধারক ব্যক্তিবর্গ

আগের যুগের লোকেরা যে-সকল শিক্ষক ও আসাতেযায়ে কেরামের নিকট 'ইল্‌মে যাহের' অর্জন করতেন, সেই শিক্ষকবৃন্দেরই নিকট স্বীয় অন্তর পরিষ্কার করা শিখে নিতেন। যেমন– আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরদের একজন হলেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)। তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা প্রচুর। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহীর নিকট ইল্‌মও শিখেছেন;

হাদীছও পড়েছেন। আবার সাথে-সাথে বাতেনের ইসলাহও করিয়েছেন। সে-কালের আসাতেযা কেরামগণও ইল্‌ম, আমল ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। সকলেই কারো না কারো নেসবত তথা খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরা ছাত্রদের শুধু শব্দই পড়াতেন না, বরং ছাত্রদের মধ্যে ঈমানি শক্তি ও গুণাবলিও সৃষ্টি করতেন। সুতরাং তাদের সাহচর্যে থেকে যেসব ছাত্র ফারেগ হতেন, তারা মাশাআল্লাহ অন্তরকে পরিষ্কার করে বের হতেন। সেই দিনগুলো এখন আর নেই।

যিকির ও আত্মশুদ্ধির একটি পৃথক বিভাগ আছে

আমি মাদরাসার এক শিক্ষককে বললাম, আপনারা ছাত্রদের সবক তো পড়ানই, পাশাপাশি একটু-আধটু তাযকিয়া তথা তারবিয়াতও করিয়ে দিন। তাদেরকে বলুন, উৎসাহ দিন এবং শিখিয়ে দিন। তিনি উত্তর দিলেন, জনাব! তাদেরকে যদি আমরা একটা ব্যাপারে পরামর্শ দিই, তা হলে তারা আমাদের দশটা পরামর্শ দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। এ কাজ আপনাদের। আপনারা যদি বলেন, তা হলে তারা খুব সহজে মেনে নেবে। আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে, তাই আপনার দিকে তাকিয়ে তাদের পড়িয়ে দিই। তবে এরপর আর তাদের বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এতে বোঝা গেল, যিকির আত্মশুদ্ধি দীনের একটি পৃথক বিভাগের কাজ। এখানে প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাকে আত্মশুদ্ধির পথ ও পদ্ধতি শেখানো হয়। কীভাবে নিজের মনকে ইসলাহ করা যায়, কীভাবে উন্নত চরিত্র অর্জন করা যায়, অন্তরের রোগগুলোর চিকিৎসা কীভাবে করা যায় এবং কীভাবে ইবাদতের মধ্যে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা অর্জন করা যায় সেই আলোকিত পথের দিশা-ই এখানে দেওয়া হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মাকামে ইহ্‌সান'

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

مَاالْاِيْمَانُ؟

'ঈমান কী জিনিস?'

নবীজি উত্তর দিলেন।

জিবরাঈল বললেন,

صَدَقْتَ

'আপনি সত্য বলেছেন।'

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,

مَاالْإِسْلَامُ؟

'ইসলাম কী?

নবীজি উত্তর দিলেন।

জিবরাঈল বললেন,

صَدَقْتَ

'আপনি সত্য বলেছেন।'

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,

مَاالْإِحْسَانُ؟

'ইহসান কী?

নবীজি উত্তর দিলেন,

أَنْ تَعْبُدَاللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'(ইহসান হলো) তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি দেখতে না পাও, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।'

এ কথার উত্তরে জিবরাঈল (আ.) বললেন,

صَدَقْتَ

'আপনি সত্য বলেছেন।'

তারপর তিনি চলে গেলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) প্রশ্নোত্তরের এই দৃশ্য দেখে সীমাহীন বিস্মিত হলেন। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি কে ছিলেন? উত্তরে নবীজি বললেন, ইনি জিবরাঈল। তোমাদেরকে দীন শেখাতে এসেছিলেন।

তো এর অর্থ এই বোঝা গেল যে, এ তিনটি বিষয়ই দীনের অন্তর্ভুক্ত, দীনেরই অংশ। এখন যারা 'ইহসানের মাকাম' অর্জনের জন্য মেহনত-মুজাহাদা করে, তারা কি দীনের বাইরের কিছু করছেন?

হাদীছ বোঝার জন্য ওস্তাদ প্রয়োজন

আজকাল তো এমন কিছু লোকও পাওয়া যায়, যারা কারো কথা তো মানেই না; বরং বুক ফুলিয়ে বলে, আমরা কারো পিছে চলি না; কারো তাকলীদ করি না। আমরা তো আমাদের খাহেশাতের পেছনেই চলব। ফলাফল কী হলো? তারা বলে, জনাব! আমরা নিজেরাই কিতাবাদি পড়তে পারি; আমাদের কোনো ওস্তাদ কিংবা শাইখের প্রয়োজন নেই। কিতাব পড়ব। যা কিছু বুঝে আসবে, তার ওপরই আমল করব! অর্থাৎ– তাদের বক্তব্য প্রায় এমন হয়ে গেল যে, 'আজকের পর ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন নেই; ব্যস! আমরা শুধু বই পড়ব আর নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করে নেব! আরে ভাই! এভাবে তো দ্রুত ডুবে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না। তারা বলেও যে, আমরা হাদীছ পড়ব এবং তার ওপর আমল করব। আরে ভাই! পড়বেন তো হাদীছই, তবে ওস্তাদের প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। ওস্তাদ লাগবেই। কারণ, ওস্তাদ ব্যতীত যারা নিজে-নিজে পড়ে কিছু হতে চেষ্টা করছে, তাদের পদে-পদে পদস্খলনের শিকার হতে হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞেরও ভুল হয় : দুটি উদাহরণ

প্রথম ঘটনা : কেমেষ্ট্রির এক প্রফেসার ছিলেন। তার নাম ছিল চিমা সাহেব। এখন ইংরেজিতে চিমা chima লিখতেও শুরুতে ch আসে। এবং chemistary কেমেষ্ট্রি লিখতেও শুরুতে ch দিয়ে লিখতে হয়। তো বন্ধু একদিন বললেন, 'আরে! আমাদের চেমিষ্ট্রির প্রফেসর হলেন চিমা সাহেব (!) ...। প্রফেসর চিমা সাহেব শুনে বললেন, আরে ভাই! 'চেমিষ্ট্রি' নয় কেমিষ্ট্রি ! ভুল উচ্চারণ করছেন কেন? বন্ধু বললেন, আসলে 'কিমা' সাহেব (সঠিক উচ্চারণ চিমা) ch দিয়ে যদি 'কেমেষ্ট্রি' পড়তে হয়, তা হলে আপনার নামের শুরুতে ch আছে। সেই হিসাবে আপনাকে 'কিমা' সাহেব বলতে হয়। যাহোক, এখানে ওস্তাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, এখানে ওস্তাদই বলবেন, কোথায় ch দিয়ে 'চি' এর উচ্চারণ হবে আর কোথায় তা 'কে' এর উচ্চারণ হবে। নতুবা একা-একা তামাশা করা ছাড়া অন্য কিছু করা হয় না।

দ্বিতীয় ঘটনা : এধরনের ভুলভ্রান্তি অনেক সময় আহলে ইল্মদেরও হয়ে থাকে। একবার একজন বড় শাইখুল হাদীছ শহরে তাশরীফ আনেন। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে কথায়-কথায় বললেন, 'আচ্ছা ভাই! ঘটনা কী বলুন তো! করাচির লোকেরা 'সূরা তাব্বাত' বেশি পছন্দ করে, সূরা ইখলাস' কেন পছন্দ করে না?

সঙ্গীরা উত্তর দিল, না, হযরত! এমন কোনো বিষয় তো এখানে নেই। আপনার কাছে এমন মনে হলো কেন? শাইখ উত্তর দিলেন, 'আমি এয়ারপোর্ট থেকে মাদরাসায় আসতে যেখানেই নজর পড়েছে, সেখানেই লেখা ছিল تبت سنو (تبتশব্দটিকে প্রথম অক্ষরে যবর এবং যের উভয়টিই পড়া যায়। যবর পড়লে 'তাব্বাত' এবং যের পড়লে 'তিব্বত' পড়া যায়।) تبت سنو (সূরা তাব্বাত শুনো)। তো এতে আমি বুঝতে পারলাম, এখানকার লোকেরা সূরা তাব্বাত খুব পছন্দ করে। সঙ্গীরা উত্তর দিল, হযরত! এটা সূরা তাব্বাত শোনার আহ্বান নয়, বরং এটা একটা 'ফেস ক্রীম। এর নাম হলো 'তিব্বত স্নো'।

যাহোক, আহলে ইল্‌মগণেরও কখনো-কখনো ভুল হয়ে যায়। তখন ওস্তাদ বলে দেন, এটা এভাবে নয়– এভাবে। এ-কারণেই ওস্তাদের প্রয়োজন সর্বদা ছিল এবং থাকবেও আজীবন।

একটি প্রশ্নের উত্তর

একব্যক্তি আমাকে বলল, জনাব! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে বোখারি শরীফে কোনো বিষয় না দেখাতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো কিছুই মানব না। আমি বললাম, বোখারি শরীফ একটি শরঈ দলিল একথা শরীয়তের কোথাও আছে দেখান! আপনি তো বললেন, বোখারিতে থাকলে মানবেন, অন্যথায় না। আচ্ছা বলুন তো, 'বোখারিতে থাকলেই মানা যাবে; অন্যথায় মানা যাবে না' একথা কি কুরআনে আছে, না হাদীছে আছে? এ আবার কেমন কথা? প্রতি কথায় বোখারি শরীফ!

যাহোক সারকথা হলো, যিকিরের গুরুত্ব, যিকিরের প্রয়োজনীয়তা এসব উসূল ও কানূন আমরা কুরআনে পাব; কিন্তু এর ব্যখ্যা কী হবে? পদ্ধতি কী? কখন করতে হবে? এসব বিস্তারিত আলোচনা শরীয়ত যুগের মাশায়েখগণের কাঁধে অর্পিত করেছে। সুতরাং যে কথায় সকল মাশায়েখ ঐক্যমত পোষণ করবেন, সেটাই সঠিক হবে।

হাদীছে নিঃশব্দ ও সশব্দ যিকিরের ইশারা

অনেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির করেন। এটিও ঠিক আছে। হাদীছে এর প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনো-কোনো মাশায়েখ নীরবে বসে চিন্তা করেন, ভাবেন। এটিও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এই নিঃশব্দ ও সশব্দ উভয় পদ্ধতি-ই জায়েয।

মোরাকাবার আসল লক্ষ্য

এজন্য এই ধারণা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে যে, আমি তো আলেম, আমি তো মুফতী, আমি তো অমুক-তমুক। কিন্তু শায়খদের কাছে গেলেই আমাকে মোরাকাবা করিয়ে দেন। এমন ধারণা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মোরাকাবা তো একটা উসিলা ও উপায়মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ। আর এটি না ফরজ, না ওয়াজিব। কে বলল, এটি ফরজ? এ তো কেবল একটি উপায় ও পন্থামাত্র, যা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

এ-কারণেই আমাদের মাশায়েখগণ উল্লিখিত সবকগুলো অতিক্রম করে যখন শেষ সবকে পৌঁছেন, তখন তাদের উন্নতি কুরআন তেলাওয়াতে ও নামাযে পরিলক্ষিত হয়। তখন তারা এই সাধারণ মোরাকাবার পরিবর্তে ওইসব আমলের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হন।

আমাদের তাসাওউফের সবকসমূহের মধ্যে লেখা আছে, এই মোরাকাবায় পৌঁছে বেশি-বেশি নফল পড়ার মধ্যে অনেক ফায়দা হয়। এই সবকে পৌঁছে বেশি পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা অনেক ফায়দা হয়। তো আসল উদ্দেশ্য তো আমলের দিকে আসা। এসব তো কেবল কিছু উসিলা ও মাধ্যমমাত্র। যদি অন্তরে এমন কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, যখনই মাহফিল হয়, বলেন, 'মাথা ঝুঁকাও'! চক্ষু বন্ধ করো। আরে ভাই! এ তো একটি পদ্ধতিমাত্র; এছাড়া তো বান্দার মধ্যে একাগ্রতা আসে না। একেই মাধ্যম হিসেবেই শেখানো হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, 'তাযকিয়া' অর্জন করা বান্দার ওপর ওয়াজিব। এ থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই।

এক শাইখুল হাদীছের করুণ দশা!

একবার এক শাইখুল হাদীছের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি এমন মাদরাসার ফারেগ ছিলেন, যেখানে তালেবে ইল্‌মকে প্রথম দিন প্রথম বৈঠকেই কুরআনও শিক্ষা দেওয়া হয়, সঙ্গে-সঙ্গে বোখারি শরীফও পড়ানো হয়। প্রথম দিনই! তা-ও আবার শিশু বাচ্চা!

যাহোক, তিনি এলেন, বয়ান শুনলেন। পরে আমাকে বললেন, হযরত! অন্তরের পরিশুদ্ধিবিষয়ক আপনার কথাগুলো চমৎকার হয়েছে; হৃদয়ে গেঁথে গেছে! কিন্তু এসবের আলোচনা তো হাদীছের কোথাও নজরে পড়ে না।

আমি তাকে বললাম, যেগুলো হাদীছে পাওয়া যায়, প্রথমে সেগুলো অর্জন করো! আমরা তো একথা বলি না যে, যা হাদীছে নেই তা করে বেড়াও।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা! ইহসানের কাইফিয়্যাত অর্জন করার কথা কি হাদীছে আছে? সে বলল, হাঁ, আছে। আমি বললাম, পূর্ণ বিশ্বাস আছে তো এতে?

يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ শব্দগুলো যে হাদীছে এসেছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এটি দীনের অংশ। যদি একে অর্জন না করেন, তা হলে দীনের এই অংশ অর্জন করা হতে আপনি বঞ্চিত হবেন।

তিনি বললেন, হাঁ, এটি তো হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত।

আমি বললাম, আচ্ছা; তা হলে বলুন, আপনার কি নামাযে এই কাইফিয়্যাত অর্জিত হয়েছে? সে বলল, না। আমি বললাম, তা হলে আপনার দীন তো এখনো অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। একে দ্রুত পরিপূর্ণ করুন। আমরা কখন একথা বললাম যে, যা হাদীছে নেই, তা করুন। আমরা তো হরহামেশা বলে থাকি, যা আছে, তা-ই করে দেখান।

সে বলল, আমি তো এই আপদেই পড়ে আছি। এত বছর পার হয়ে গেল; হাদীছ পড়াচ্ছি; আমার অবস্থা শোধরাল না। না চোখ নিয়ন্ত্রণে আছে, না অন্তর, না নামায!

আমি বললাম, এ-কারণেই তাযকিয়া তথা ইহসানের মাকাম অর্জন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক ও ওয়াজিব। এটা কোনো নফল কাজ নয়।

যিকির ও আত্মশুদ্ধি কি নফল কাজ?

এখন একটা নতুন ফেতনা শুরু হয়ে গেছে। অনেক আলেম যিকির ও আত্মশুদ্ধির কাজকে নফল কাজ মনে করতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ– কেউ যদি বসে-বসে যিকির-আযকারের অজিফা আদায় করেন, তখন তারা বলে থাকেন, নফল কাজ করছে। তারা বিশ্বাসই করে না, এটা আমাদের জন্যও জরুরি। আরে ভাই! সত্য কথা বলছি, এছাড়া অন্তরের ময়লা-অবর্জনা পরিষ্কারই হয় না।

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ

প্রত্যেক বস্তুর পালিশ আছে। অন্তরের পালিশ হলো আল্লাহর যিকির।

কয়েকটা বিভ্রান্তির নিরসন

যদি তাদের বলা হয়, হযরত! মুরাকবার জন্য কিছু সময় বের করুন, তখন বলেন, মোরাকাবা আবার কোথা থেকে এল? এর শরঈ ভিত্তি কী? তো

শয়তান তৎক্ষণাৎ যে বিভ্রান্তি ও সংশয় অন্তরে ঢেলে দেয়, সে বিষয়টি একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আজকাল কাপড়ে যে দাগ লাগে, তা ক্যামিকেল লাগানো ব্যতীত শুধু সাবান দিয়ে দূরই হতে চায় না। আন্তরের দাগও এমন। যদি অল্প চেষ্টায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তা হলে আপনিও পরিষ্কার করে নিন। আমরা তো একে ফরজ বলিনি। আমাদের মাশায়েখগণ যে সবকগুলো বলে দিয়েছেন, তা লক্ষ-লক্ষ মানবসন্তান গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তাদের নেসবতের নূর দান করেছেন। সেই নেসবতের নূরের উজ্জ্বল প্রমাণ হলো, তারা সবর ও শোকরের জীবন লাভ করে ধন্য হয়েছে। তারা কাজা-কদর তথা ভাগ্য ও তাকদীরের ওপর অন্তরের প্রশান্তি অর্জন করেছে। তারা শরীয়তের কোনো বিধান মেনে নিতে দলিল যাচাইয়ের প্রয়োজন বোধ করে না; দলিল ছাড়া-ই সব মেনে নেয়। এখন এসব নেয়ামত যদি কোনো বান্দা অজিফা-সবক ব্যতীতই অর্জন করতে পারে, তা হলে তো সে বড়ই ভাগ্যবান। আমরা তার যোগ্যতাকে সালাম জানাই।

দেখুন ভাই! এক হলো, সিড়ি বেয়ে ছাদে ওঠা; আরেক হলো, এক লাফে ছাদে ওঠা। কেউ যদি আগে থেকেই ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে তো আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাব। শরীয়ত যখন আদেশ দিল, ছাদে উঠো, এবার যে এক লাফে পৌঁছতে পারে, সে তা-ই করুক। আর যে এভাবে লাফাতে পারে না, সে সিঁড়ি বেয়ে উঠুক। যদি সিঁড়ি বেয়েও উঠতে না পারে– হাঁটু কিংবা জয়েন্টে ব্যথা, তা হলে লিফটের সাহায্যে পৌঁছুক। কোনো সমস্যা নেই। এসব তো শুধু মাধ্যম। আসল তো হলো ছাদে পৌঁছা।

এই বিষয়গুলোও ঠিক এ-রকম। অজিফা হলো মাধ্যম। আসল হলো অন্তর পরিষ্কার করা। নিম্নস্বরে যিকির করা, উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা, মুরাকাবাসহ অন্যান্য মুজাহাদাসমূহ, যেমন– মনের বিরুদ্ধে কাজ করা, কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম বলা– এসব হলো সিঁড়ি বা ছাদে পৌঁছার মাধ্যম। হতে পারে, একেকজনের কাছে একেক প্রক্রিয়া ভালো লাগে। যে যেমনই হোক ছাদে সবাইকে পৌঁছতে হবে।

ঠিক এভাবেই 'মাকামে ইহসান' তথা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার কল্পনার সাথে ইবাদত করতে চেষ্টা করা দীনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অতএব তা অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। কেউ একথা বলতে পারবে না, আমার জন্য এই কাইফিয়্যাত অর্জন করা আবশ্যক নয়। এটি দীন। যদি এ কাজকে গুরুত্ব না দেই, তা হলে দীনের একটা অংশ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব। সুতরাং ওস্তাদের জন্য তা যেমন আবশ্যক, ছাত্রের

জন্যও আবশ্যক, কেরানির জন্যও আবশ্যক, বাবুর্চির জন্যও আবশ্যক। কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। এখন এই মাকাম কীভাবে অর্জন করতে হবে? তো এ-ব্যাপারে আমরা কারো ওপর জোর করি না যে, এ কাজ এভাবে করো; এভাবেই বেশি ফায়দা!

আল্লাহ আমাদের বুযুর্গদের অনেক গভীর অন্তরদৃষ্টি দান করেছিলেন। তাঁরাও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাদের এই নেয়ামত দান করেছেন। একটি বিষয় পরিষ্কার যে, যে-ওষুধ দ্বারা বান্দা উপকৃত হয়, সে অন্যদের উক্ত ওষুধটিই বাতলে দেয়। এই যে যিকির, অজিফা ইত্যাদি এসব হলো ওষুধ। আমাদের বড়রা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আমলের উন্নতি পেয়েছেন, তাই তাঁরা অন্যদেরও বলেছেন, ভাই! তোমরাও এই ওষুধটি ব্যবহার করো। তো আমরাও কিন্তু সেই ওষুধই ব্যবহার করছি।

যিকিরের প্রভাব কিন্তু অবশ্যই হয়ে থাকে। আর যেকোনো বস্তুকে তার ফলাফল দিয়ে চেনা যায়। জাগতিক শিক্ষার বিরোধিতা আমরা করি না। কিন্তু ফলাফল যখন খারাপ বের হয়ে আসে, তখন আমরা বলি, এসব স্কুল, কলেজ-ভার্সিটি ভালো নয়। তা না হলে ক্যামেস্ট্রি পড়া, ফিজিক্স পড়া, হিসাব বিজ্ঞান ও কম্পিউটার সাইন্স পড়া ইত্যাদি শরীয়তপরিপন্থি কিছু নয়। সমকালীন এই শিক্ষাগুলো যুগের প্রয়োজন। আর দীনি ইল্‌মসমূহ হলো জীবনের লক্ষ্য। আমরা যদি কখনো এর বিরুদ্ধে কিছু বলি, তা এজন্য যে, জাগতিক শিক্ষাগুলো যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে যাওয়ার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী সন্দেহ রোগে আক্রান্ত হয়ে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে-ধীরে দীন ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। তো আমরা পরিণতি দেখে বলে থাকি, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ভালো নয়। আমাদের যিকির ও আত্মশুদ্ধির ফলাফল দেখুন। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মাশায়েখগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই কাজগুলো করে তার উপকারিতা প্রমাণ করে গেছেন।

আকাবিরে দেওবন্দ-এর মধ্যেও যিকিরের প্রতি ইহতিমাম

আমাদের আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দ-এর জীবনী দেখুন। সেখানে যিকিরের প্রতি ইহতিমাম দেখতে পাবেন। আজও যদি দেওবন্দ যান, তা হলে মিয়া হাজী আবেদ হুসাইন (রহ.)-এর রুমটি পৃথকই দেখতে পাবেন। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর রুম ভিন্ন, মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর রুমও ভিন্ন। ভাই! এই ছোট-ছোট রুমগুলো

কেন বানানো হয়েছে? আমি প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর এল, তারা এখানে বসে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতেন।

আমার সৌভাগ্যের গল্প

এই অধম একবার থানাভবন উপস্থিত হলো। থানাভবনের যিনি মুহতামিম ছিলেন, তিনি আলেম ছিলেন। আমাকে বললেন, হযরত! আপনার শোওয়ার ইনতেজাম হয়ে গেছে! আমাকে একটা ছোট্ট কামরায় নিয়ে বলা হলো, 'এখনেই ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। সে আমাকে বলল, এই কামরাটি মূলত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ছিল। আজ আপনার জন্য এটি খোলা হয়েছে। তো সেই স্থানগুলো আজও আমাদের মাশায়েখগণের মুজাহাদার স্মৃতি বহন করছে।

সেই আকাবিরগণের যদি নির্জনতার প্রয়োজন হতো, তা হলে আজকের তালেবে ইল্মদের কি তার প্রয়োজন নেই? আসলে যিকিরকে প্রয়োজনীয় মনে না করার কারণে তার আমল আমরা করি না। অধিকাংশ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, তুমি কি মোরাকাবা কর? তারা বলে, জনাব! সময় পাওয়া যায় না। সময় তো পাওয়া যায়; কিন্তু অন্তরে তার গুরুত্ব নেই। তারা একে একটি নফল কাজ মনে করে। না ভাই! এর দ্বারা 'তাযকিয়া' হয়। 'তাযকিয়া'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত। যেসব অজিফা ও আমল দেওয়া হয়, এগুলো সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। হৃদয়জগত আলোকিত হয়।

অহংকার হতে মুক্তির উপায়

এসব অজিফা ও আমল যদি না করা হয়, তা হলে তাকাব্বুর তথা অহংকার হতে মুক্তি পাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই 'তাকাব্বুর' ভেতর থেকে সহজে বের হয় না। বান্দা যত বড় আলেমই হোক, তারপরও এটি থাকে। এর প্রমাণ কুরআন মাজীদ থেকেই শুনুন।

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

'আমি আমার আয়াতসমূহ হতে বিমুখ করে দেই তাদেরকে, যারা যমীনে অহংকার করে বেড়ায়।'[১]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৬

ইবাদতের পরও তাকাব্বুর এসে যায়। এ থেকে মুক্তি পাওয়াও খুব কঠিন। এর বিপরীত গুন হলো 'তাওয়াজু' তথা নম্রতা। 'তাওয়াজু' অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এবার বলুন, তা কীভাবে অর্জন করবেন? তো এই অজিফা, এই আত্মশুদ্ধি, এই মোরাকাবা ও পদ্ধতিগুলোই অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। বান্দা এরপর নিজেকে এ পরিমাণ মিটিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে 'তাওয়াজু' এসে যায় যেমন মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর মধ্যে এসেছিল। তিনি এতটা খ্যাতিবিমুখ ছিলেন যে, লোকজন তাঁকে চিনতেই পারত না। একবার বিতর্কের জন্য শাহজাহানপুর তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এক হোটেলের রুম বুকিং দিয়ে সেখানে আরাম করছিলেন। এদিকে অভ্যর্থনার জন্য আসা লোকজন তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে হোটেলে গিয়ে পৌঁছল। এক ছাত্র বলল, হযরত! আমরা আপনার অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে এসে বসে ছিলাম আর আপনি এখানে!

তিনি উত্তর দিলেন, এ-কারণেই তো আমি সেপথে আসিনি। আমার মধ্যে কি অভ্যর্থনা পাওয়ার যোগ্যতা আছে? এরপর তিনি আরো বিস্ময়কর একটি কথা বললেন। বললেন, 'কয়েটি শব্দ পড়েছি বলে দুনিয়া আমাকে চিনে ফেলেছে। অন্যথায় কাসেম নিজেকে এমনভাবে মিটিয়ে দিত যে, কেউ তাকে চিনতেও পারত না।

এটি হলো আসল মাকসূদ। অন্তরে এমন 'তাওয়াজু' থাকতে হবে, যা তাকে দুনিয়ার মোহ ও লালসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই মূল্যবান সম্পদ যিকির ব্যতীত অর্জন হয় না।

আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

হযরত খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরি (রহ.) 'খাইরুল মাদারিস' নামক একটি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। একবার তিনি হাদীছ পড়াচ্ছিলেন। মাঝখানে কোনো প্রশ্ন এসে গেল, যার কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। কিতাব দেখলেন। বার-বার, হাশিয়া-টীকাও দেখলেন। কিন্তু এর কোনো সঠিক জবাব তখন মাথায় এল না। তিনি বড়ই নিঃসঙ্কোচ ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদের বললেন, দেখো তো আমি এই-এই পড়েছি। এতে এই প্রশ্নটা জাগে; কিন্তু এর কোনো উত্তর আমার মাথায় আসছে না। ছাত্ররাও এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করল।

সেকালে খুব যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র পাওয়া যেত। তারাও এর কোনো উত্তর খুঁজে বের করতে পারল না। দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর হযরত

বললেন, তোমরা একটু বসো; আমি অমুক মাওলানার কাছ থেকে বিষয়টি জেনে আসি। সেই মাওলানা কিন্তু তাঁরই ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছেই দাওরা পড়েছেন। যোগ্যতা ভালো ছিল বলে তাঁকে নিজের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনিও তখন হাদীছের কোনো কিতাবের দরস দিচ্ছিলেন। হযরত যখন দারুল হাদীছ থেকে বোখারি শরীফ হাতে নিয়ে বের হলেন, তখন এক ছাত্র দৌঁড়ে গিয়ে সেই মাওলানাকে অবহিত করল, হযরত কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার কাছে তাশরীফ আনছেন! মাওলানা সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দরস বন্ধ করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। ওস্তাদ বোখারি শরীফ খুলে ছাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাওলানা! এখানে এই প্রশ্নটা জাগছে; আমার বুঝে আসছে না এর উত্তর কী হবে। একটু বুঝিয়ে দিন তো!'

মাওলানা সেই ইবারত পড়তেই তাঁর উত্তর মনে পড়ে গেল। মেধাবী ও যোগ্য আলেম ছিলেন। তিনি উত্তরটা এভাবে দিলেন, 'হযরত! আপনার কাছে যখন আমরা পড়েছিলাম, তখন এস্থানে এসে আপনি আমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

এ হলো 'তাওয়াজু' তথা নম্রতা। বুক ফুলিয়ে একথা বলেননি যে, 'দেখো! আমার কাছে আমার ওস্তাদজি মাসআলা হল করার জন্য এসেছেন। না, এটা তিনি করেননি। এটি-ই আদব। এমন বিনয় ও আদব কীভাবে আমাদের মধ্যে আসবে? আমাদের অবস্থা তো ফোলা বেলুনের মতো। বাতাসে ওড়ে আর বলে, আমিই সবার সেরা। আসলে ভেতরে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। তো সেই অহংকার কী করে চূর্ণবিচূর্ণ করা যায়, সেই চিকিৎসা-ই মাশায়েখগণ শিখিয়ে গেছেন– যিকির ও মুরাকাবা করো; সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটি বাস্তবতা

তারপরও যদি মনের খটকা দূর না হয় যে, তোমাদের প্রথম সবক, দ্বিতীয় সবক, তৃতীয় সবক এসব আমাকে হাদীছ থেকে দেখাও, তাহলে বলতে হবে, ভাই! সে তো দীনের বাস্তবতাই উপলব্ধি করতে পারেনি! বলুন তো! কেউ যদি পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা! তুমি তো কথায়-কথায় বোখারি শরীফের নাম নিচ্ছ। বলো তো, কোন হাদীছে 'বোখারি' নামটি উল্লেখ করে তা অনুসরনের হুকুম হয়েছে? আছে কোনো হাদীছে শব্দটি? সাহাবায়ে কেরাম তো বোখারি পড়েননি, মুসলিম পড়েননি! তাঁরা তো এই

কিতাবগুলোর নামও জানতেন না। তাহলে বলব, তাঁরা দীনের কিছুই জানতেন না? বোখারি শরীফের মর্যাদা তার নিজস্থানে স্বীকৃত। কিন্তু তা নিয়ে তো বাড়াবাড়ি করা চলে না। বোখারি শরীফ সর্বজনগৃহীত একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। ইল্‌মে হাদীছে এটি একটি অনন্য কিতাব। এ-বিষয়ে সকল ওলামায়ে উম্মত যেমন একমত, তদ্রূপ সকল মাশায়েখেরও এ-বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, নিজের অন্তরকে যদি বাতেনি রোগসমূহ থেকে মুক্ত করতে হয়, তাহলে যিকির ও মোরাকাবা করতে হবে। আমাদের বড়রা বলেন–

مَنْ لَا وِرْدَ لَهُ، لَا وَارِدَ لَهُ

'যে কোনো অজিফা আদায় করবে না, তার ওপর কোনো ধরনের রুহানিয়্যাতও বর্ষিত হবে না।'

কথাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যিকির ও মোরাকাবার দ্বারা আপনি নিজেই নিজের মধ্যে উন্নতি উপলব্ধি করতে পারবেন। অন্যথায় তো ইবাদত করা-ই দুষ্কর হয়ে যেত।

যিকির ইবাদতে আগ্রহ সৃষ্টি করে

এক তালেবে ইল্‌ম এসে বলল, 'আমি দাওরা শেষ করেছি কয়েক বছর হলো। কিন্তু এ পর্যন্ত পুরা কুরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে একবারও খতম করতে পারিনি। তেলাওয়াত যে হয় না তা কিন্তু নয়, বরং কখনো এখান থেকে, কখনো সেখান থেকে পড়েছি। ধারাবাহিকভাবে এক খতম কুরআন বিগত কয়েক বছরে একবারও হয়নি! হবে কীভাবে যদি ইবাদতের সঙ্গে অন্ত রঙ্গতা না থাকে! তো ভাই! ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য, নিজের মধ্যে উত্তম স্বভাব সৃষ্টি করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ছেড়ে লজ্জাশীলতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের জন্যই এসব যিকির-আযকার করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক মুরীদের উচিত, সর্বদা নিজের সবক সম্পর্কে শাইখের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। এখন হয় কী! কয়েক বছর পর এসে সাক্ষাৎ করে। যখন জিজ্ঞাসা করি, সবক ঠিকমতো আদায় করছেন তো? তো দেখা যায়, তার সবকই স্মরণ নেই আদায় করা তো দূরের কথা!

নক্‌শবন্দি সেলসেলার সবক পরিচিতি

একটি কোর্স যেমন হয়। অর্থাৎ– প্রথমে আপনি এই-এই বিষয় পড়বেন, তারপর দ্বিতীয় ধাপে এই-এই পড়বেন এবং তৃতীয় ধাপে এই-এই...।

তারপর আপনি এম,এ ইসলামিয়াতের ডিগ্রি অর্জন করে ফেলবেন। মোটামুটি ষোল বছরের কোর্স। ঠিক এমনই একটি কোর্স আমাদের মাশায়েখগণ নির্ধারিত করে গেছেন, যিকির-মোরাকাবাসহ বিভিন্ন সবক সাজিয়ে গেছেন।

হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দি বোখারি (রহ.)-এর যুগে ১৬টি সবক ছিল। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)কে আল্লাহ আরো বেশি মারেফত দান করেছিলেন। তিনি এর উচ্চ স্তরের সবকগুলোকেও এতে শামিল করে দেন। এভাবে আমাদের নক্শবন্দি সেলসেলার সবক সংখ্যা ৩৫ হয়ে যায়। 'লতীফায়ে কালব থেকে সবক শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে। এর মাঝে এমন কিছু সবক আছে, যেগুলো আদায় করার দ্বারা মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যায়। যেমন–

'মোরাকাবায়ে হাকীকতে সালাত।'

এই মোরাকাবাটি করার দ্বারা মানুষ 'মাকামে ইহসান'ওয়ালা নামায আদায় করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে যে, নামাযে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, আমার নামাযে স্বয়ং আল্লাহ আমার সম্মুখে আছেন; আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি অথবা আমার নামায অন্তত আল্লাহ তো দেখছেন!

'মোরাকাবায়ে হাকীকতে কা'বায়ে রব্বানী-কুরআন।'

এই সবকটি আদায়ের পর কুরআনের সঙ্গে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হয় যে, কুরআন পড়ার সময় বান্দা তার স্বাদ অনুভব করতে থাকে। যেমন– কেউ মজা নিয়ে-নিয়ে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে।

'মোরাকাবায়ে হাকীকতে কাবায়ে রব্বানী। হাকীকতে মুহাম্মদী, হাকীকতে মূসাবী, হাকীকতে ঈসাবী, হাকীকতে ইবরাহীমী।'

উল্লিখিত মোরাকাবাগুলো করে সালেক এমনসব আধ্যাত্মিক নেয়ামত লাভ করে, যার জন্য মানুষ সারা জীবন সাধনা করেও সফল হতে পারে না। যাহোক, এই মোরাকাবা ও যিকির-আযকারকে মামুলি মনে না করা; বরং এটি অপার লাভের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।

কলব জারি হয়ে যাওয়া প্রথম পদক্ষেপ

কেউ-কেউ মনে করে, কলব জারি হয়ে গেলেই কাজ শেষ। আরে ভাই! কলব জারি হওয়া তো প্রথম পদক্ষেপ। একটি বাগান দিয়ে কি বসন্তের সোভা ও সৌন্দর্য দেখা যায়? কলবি যিকিরের কথা বলছি না; কলবি যিকির তো এ পথের প্রথম পদক্ষেপ। 'লতীফায়ে কালবিয়্যাহ' নামক কাইফিয়্যাত

যদি কারো অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে মাশায়েখগণ বলেন, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তার পুরো দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যিকির করছে বলে অনুভূত হয়। এরপর তার চোখ যিকির করে, ঠোঁট যিকির করে, সারা দেহ থেকে যিকিরের ছন্দ ফুটে ওঠে। ভাই! এটি একটি সাধনা। একে করতে হবে। একে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, শিখতে হবে। আর একথাও বলে রাখছি যে, এই সাধনার শিক্ষাদানকারীরা কেউ সাধারণ মানুষ নন। কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হয়। অন্যথায় সবাই নেসবতপ্রাপ্ত।

বিশ বছরের সাধনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল

একব্যক্তি এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। বিশ বছর যাবৎ কারো হাতে বাইআত হয়ে আছে। এই বিশ বছরে তাকে শাইখ শুধু একটি আমলই দিয়ে আসছেন। তা হলো দুরুদ শরীফ-এর আমল। বেচারা আলেম ছিলেন। বললেন, আমি প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা মুসল্লায় বসে আমার শাইখের বাতানো অজিফা আদায় করি। আমি বললাম, সবক কী? তিনি বললেন, দৈনিক এগারো হাজারবার দুরুদ শরীফ পাঠ করা! আমি বললাম, এ তো অজিফা; আপনার সবক কী? এ তো কোনো সেলসেলার সবকসমূহের মধ্য থেকে নয়। সবক কী বলুন। তিনি বললেন, আমি তো সবক সম্পর্কে কিছু জানি না। গেলাম, বাইআত হলাম। শাইখ বললেন, একশোবার দুরুদ শরীফ পড়ো। আমি পড়লাম। পুনরায় গেলাম। একশো থেকে দুশো। দুশো থেকে তিনশো বাড়িয়ে দিলেন। এভাবে বিশ বছর পার হয়ে গেল। এখন আমি দৈনিক এগারো হাজারবার দুরুদ শরীফ পাঠ করি। এটিই আমার সবক।

এর কারণ কী? এর কারণ হলো, তিনি নিজে আত্মশুদ্ধির আমল শেখেননি। পিতার বড় সন্তান ছিলেন; উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন, লক্ষ-লক্ষ রূহানী রোগীর মুরশিদ হয়ে গেলেন। যিনি নিজেই সুলুক তথা আত্মশুদ্ধি জানেন না, তিনি অন্যকে কী শেখাবেন? ফলে যে-ই তার কাছে যেত, দুরুদ শরীফের মধ্যে লাগিয়ে দিতেন– 'পড়ো ভাই! এগারো হাজারবার!'

সেই বেচারা তখন খুব কাঁদলেন, হায় আফসোস! বিশ-বিশটি বছর পার করে দিলাম কঠিন সাধনা করে; অথচ আমি এখনো আত্মশুদ্ধির পথে অভিযাত্রা শুরুই করতে পারিনি। আর আমাদের মাশায়েখগণ প্রথম দিনই মুরীদকে 'লতীফায়ে কলব'-এর সবক দিয়ে দেন, যেন সে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

মোরাকাবার প্রতি গুরুত্ব দিন

এ-কারণেই হযরত খাযা মুহাম্মদ মা'ছুম (রহ.) বলেছেন, আমাদের মাশায়েখগণ আল্লাহর কাছ থেকে এমন তরিকা চেয়ে নিয়েছেন, যার মধ্যে সাধকের অলসতা ছাড়া সামনে এগিয়ে যেতে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকা নেই। এটা অনেকটা মোটরগাড়ির মতো, যার কাজ কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে চলা। তবে যে-বান্দা মোরাকাবা ও যিকিরই করে না, সে এমন রোগীর মতো, যে ওষুধ ব্যবহার করে না। তা হলে তার আরোগ্য লাভ হবে কীভাবে? এজন্য বলছি, দৈনন্দিনের অজিফা আদায় করতে থাকুন। এগুলো খুবই জরুরি। খানাপিনার চেয়েও একে বেশি গুরুত্ব দিন। কারণ, খাবার শরীরের প্রয়োজন আর এসব যিকির ও অজিফা আত্মার প্রয়োজন। খাওয়াদাওয়ায় যদি ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। আর রূহানী আমলে যদি ত্রুটি হয়ে যায়, তা হলে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হতে হবে।

এক কাপ চা সমপরিমাণ হলেও মোরাকাবাকে গুরুত্ব দেবেন। এছাড়া তো অনেকের স্বস্তিই আসে না। যে করেই হোক, চা চাই-ই চাই। এমনিভাবে আমরা খানা তিন বেলা-ই খাই। এটি-ই সারা জীবনের নিয়ম। সকালের নাস্তা, দুপুরের খানা এবং রাতের খানা। এটা রুটিন করা। কোনো বেলা যদি অনিয়ম হয়, তখন দেখা যায় প্রকৃত অবস্থা। তো যেভাবে খানা খাওয়ার বিষয়ে চিরাচরিত নিয়ম বাঁধা আছে যে, খানা তিন বেলা খেতে হবে; তদ্রূপ রূহানী খানার বিষয়েও যদি আমরা যত্নবান হতাম, তা হলে কতই-না ভালো হতো। দৈনিক অন্তত দুবার যিকির-আযকার ও মোরাকাবা করে নিন। তা ফজরের পূর্বে হোক কিংবা পরে। এমনিভাবে আছর নামাযের পরেও হতে পারে। অথবা বাদ ঈশা। মোটকথা, যখনই সুযোগ পাবেন অবশ্যই দৈনিক সবকগুলো আদায় করা চেষ্টা করবেন।

নক্‌শবন্দি সেলসেলার অজিফাসমূহ

আমাদের সেলসের্লায় যারা বাইআত হয়, তাদেরকে ছয়টি বিষয়ে বোঝানো হয়।

এক : উকূফে কালবি

দুই : মোরাকাবা

তিন : দুরুদ শরীফ

চার : কুরআনে মাজীদ

পাঁচ : ইস্তেগফার

ছয় : শাইখের সাহচর্য তথা সান্নিধ্য।

এর মধ্যে পাঁচটি বিষয় হলো অজিফা। একটি হলো সবক, যাকে 'লতীফায়ে কালবিয়্যাহ' (لطيفه قلبيه) বলা হয়। মুরীদ যখন মেহনত করে, তখন তার সবক পরিবর্তন হতে থাকে। এখানে সবক একটি। বাকিগুলো অজিফা। কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে উত্তর দিয়েছিল, ৬ সবক চলছে। আরে ভাই! সবক ৬টি নয়– একটিই, যাকে 'লতীফায়ে কালব' বলে। যাহোক, সবক সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করুন। এর জন্য মেহনত-মোজাহাদার সাথে-সাথে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আও করুন। ফিকির যখন লেগে যাবে, তখন রাস্তাও খুলে যাবে।

ছাত্রজীবনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

যাহোক, কথা তো চলছিল যে, তালেবে ইল্মরা যেন এদিকে মনোযোগী হয়। একটা সময় ছিল, যখন মাদরাসার ছাত্রদের যিকির-সুলুক শেখানো হতো না। আর বাস্তবে তা সঠিক সিদ্ধান্তই ছিল। কারণ, তারা ইল্ম অর্জনে এতটাই নিমগ্ন ছিল যে, ওলামা-মাশায়েখগণ এই নিমগ্নতায় কোনো প্রকারের ত্রুটি পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলতেন, তারা স্বীয় লক্ষ্যের ওপর নিরবচ্ছিন্ন মেহনতে লেগে থাকুক। তাদেরকে যিকিরের কথা বলতেন না। এমনকি কাউকে বাইআতও করতেন না। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন রকম।

এ-যুগের তালেবে ইল্মদের কাছে ইল্মি বিষয়াদি ব্যতীত অন্য সব কিছু পড়তে বড়ই মধুর লাগে। কিতাব পড়ে; একাগ্রতা নেই। মুখস্থ করে; ভুলে যায়। আসলে বাইরের জিনিসের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে গেছে। সেগুলোতে তারা এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে, তারা পড়ার প্রতি কেমন যেন আগ্রহই হারিয়ে ফেলেছে। এমন তালেবে ইল্ম সম্পর্কেও আমার জানা আছে, যে ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে থাকে। পড়েও না, তাকরারও করে না। ব্যস এমন করেই বছর পার করে ফেলে। এবার বলুন, যে ছেলেটা ঠিকমত পড়া লেখা করে না, তাকে যদি বাইআত করা হয়, তা হলে কি ভুল হবে? না বরং তাকে বাইআত করা উচিত। এবং যিকির শিখানো উচিৎ; যেন তার মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ইল্ম অর্জনের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে মাদরাসার ছাত্ররা সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের মধ্যে ইবাদতের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ তৈরী হয়। তারা নিজেদের

কিতাবাদি মুতা'আলা, তাকরারের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে। তাদের সম্মানিত শিক্ষকগণ আমাকে জানিয়েছেন- ছাত্ররা যখন থেকে যিকির আযকার শুরু করেছে, তখন থেকে তাদের পড়া-লেখার আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, এই বাইআতের আমল ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কিছু নয় ; বরং সহযোগী ও উপকারী আমল। যে বাইআত হয়েছে, সে এখন কুদৃষ্টি থেকেও বাঁচবে, মিথ্যা থেকেও বাঁচবে। বাঁচবে মানুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখা থেকে। সুতরাং যিকিরের বরকতে ইল্‌মের মধ্যে দ্রুত উন্নতি হয়। আমাদের মাশায়েখগণ এযুগে ছাত্রদেরও বাইআত করে নেন; তবে তাদেরকে লম্বা কোনো অজিফা দেন না।

ছাত্ররা যেভাবে অজিফা আদায় করবে

একজন তালেবে ইল্‌মের জন্য ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা মোরকাবা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সে প্রত্যেক নামাযের সময় কয়েক মিনিট আগে মসজিদে আসার অভ্যাস গড়বে। এটা তো এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। প্রত্যেক মাদরাসায় আযানের পর ছুটি হয়ে যায়। ক্লাসের বিশেষ প্রয়োজন পড়লে ক্লাস চলে; অন্যথায় ওই সময়টা ফাঁকা-ই থাকে। তো জামাতের পূর্বে এই পনেরো-বিশ মিনিট সময় নষ্ট না করে আগে-আগে মসজিদে এসে যদি কোনো তালেবে ইল্‌ম ফরজ ও সুন্নতের মাঝখানের সময়টুকুতে কিছুক্ষণ মোরাকাবা করে – হোক তা পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট কিংবা দশ মিনিট – তাহলে আল্লাহ তা'আলা এই মোরাকাবার উসিলায় তার অন্তরকে আলোকিত করে দেবেন। এবার বলুন, এ কি খুব কঠিন কাজ? তালেবে ইল্‌ম যদি বলে, আমার সময় নেই, তা হলে আর কী করা। কিন্তু সে চাইলে এটি করা সম্ভব।

অনেকে আছে, আযানের পর মসজিদে এসে মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে, কয় মিনিট বাকি আছে! তো এই ব্যক্তি গেটে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট, দু-মিনিট সময় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেন এজন্য যে, এখনো জামাত দাঁড়াতে কিছু সময় বাকি আছে। কিন্তু সামান্য হলেও এটা সময়। এই সময়কে নষ্ট করা কি উচিৎ? একে বরং কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। নামাযের পূর্বে ফাঁকা সময়ে যদি তাসবীহ ও মোরাকাবা করা হয়, তা হলে নামাযের সাথে-সাথে অজিফাও আদায় হয়ে যাবে এবং তা খুব সহজেই হয়ে যাবে।

আচ্ছা, বলুন তো; একশোবার দুরুদ শরীফ পাঠ করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? বড়জোর দশ মিনিট। তাহলে সুন্নত ও ফরজের মাঝখানে একটি

অজিফা আদায় করতে পারেন। একটু দ্রুত পড়লে তা পাঁচ মিনিটেও সম্ভব! একশোবার দুরুদ শরীফ পড়া তো কোনো কঠিন কাজ নয়! সময় তো থাকেই। তারপরও কেন হয় না? হয় না নফসের গড়িমসির কারণে। সুতরাং আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা নফসের বাহানাকে কোনো ধরনের প্রশ্রয়ই দেব না। নিজের অজিফা প্রতিদিন নিয়মিত আদায় করব। প্রয়োজনে পানাহার বন্ধ করে দেব; তবু অজিফা কামাই দেব না।

আপনি যদি এ-কাজটি নিয়মিত করতে শুরু করেন, তা হলে অবশ্যই এই ওষুধের প্রভাব আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। মানুষ যেভাবে ২+২ সমান-সমান চার- এর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, তদ্রূপ এই অধমেরও দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এই অজিফাগুলো যে-ই নিয়মিত আদায় করবে, তার অন্তরের অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তন হতে থাকবে। অজিফা আদায়ের পর অন্তরে পরিবর্তন আসবে না এটা হতেই পারে না। এটা কোনো নতুন ওষুধ নয়; বরং কোটি-কোটি মানবসন্তান একে ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে। সুস্থ হয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। তোমরাও একে ব্যবহার করো, শেফা লাভ করবে।

সকল নবীর প্রতি যিকিরের আদেশ

যিকির এমন একটি আমল, স্বয়ং রব্বুল আলামীন স্বীয় নবীদেরকে যা করার আদেশ করেছেন। এবার বলুন, নবীদের মর্যাদা কত উচু! তাদের আমল কত উঁচু! আল্লাহ রব্বুল উযযত দুজন নবীকে দীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠিয়ে ইরশাদ করেছেন–

اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

'আপনি আর আপনার ভাই (মূসা ও তাঁর ভাই হারুন) আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যান এবং আপনারা দুজন আমার যিকির থেকে গাফেল হবেন না।'[১]

আল্লাহ তা'আলা যদি নবীদের এই আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে যারা নবীদের ওয়ারিস, তাদের কি সেই যিকিরের প্রয়োজন নেই? এই যিকির না থাকার কারণেই আজ মানুষের চরিত্র এত অধঃপতনের শিকার হয়েছে।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৪২

তরুণদের দুর্ভাবনার সমাধান

বেশ কিছু তরুণ ছেলে নিজেদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে এখন চাচ্ছে, তারা নিজেদের পরিবর্তন করবে। তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, তারা অজিফাগুলো নিয়মিত আদায় করবে। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। কতদিন আমরা নফসের গোলাম হয়ে থাকব! কতদিন আমরা শয়তানি খাহেশাত পূর্ণ করতে থাকব! এসব ছেড়ে সবকিছু আল্লাহর হাতে সপে দাও। স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো না। উটের মতো সহজ-সরল হয়ে যাও। উটের লাগাম যদি শিশু বাচ্চার হাতেও দেওয়া হয়ে, তা হলেও মাথা নিচু করে তারা পেছনে চলতে শুরু করে। তদ্রূপ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে শুরু করো। এতেই আমাদের মুক্তি। আপনারা এসব তাসবীহ-তাহলীল ও অজিফাসমূহ নিয়মিত গুরুত্বের সাথে আদায় করতে থাকুন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরের কঠোরতা দূর করে দেবেন, উদাসীনতা ও গাফলত থেকে রক্ষা করবেন এবং তার স্মরণওয়ালা জিন্দেগি দান করবেন।

اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو
دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو
دل دے کہ ترے عشق میں یہ حال ہوا سکا
محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو

'আল্লাহ! সেই হৃদয় দান করো, যা হবে তোমার প্রেমের নীড়,
তার ওপর তোমর স্থায়ী অনুগ্রহের সুদৃষ্টি পড়বে।
আমাকে হৃদয় দান করো এমন, যে তোমার প্রেমে এমন মুগ্ধ হবে যে,
হাশরের ময়দানের হুল্লোড়ের মধ্যেও তার ঘোর কাটবে না।'
আল্লাহ আমাদের এমন অন্তর দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো

'গুনাহের যেসব ক্ষতি দুনিয়াতেই সংঘটিত হয় ওলামায়ে কেরাম এমন ক্ষতি প্রায় সত্তরটা গণনা করেছেন। এই মজলিস যেহেতু সংক্ষিপ্ত মজলিস, তাই সেই ক্ষতিসমূহ হতে শুধু কয়েকটা আলোচনা করছি। একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। গুনাহের এসব ক্ষতি নগদে দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। আখেরাতে ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হবেই। দুনিয়াতেও হবে। এগুলো এমন পরিণতি, যা কোনোদিন ফেরানো সম্ভব নয়। এর একটি উদাহরণ নিন। যেমন– আপনি মুখে এক লোকমা খাবার দিলেন এবং গিলে ফেললেন। এ পর্যন্ত আপনার ইচ্ছাশক্তি কার্যকর ছিল। চাইলে আহার না-ও করতে পারতেন। কিন্তু গিলে ফেলার পর এখন আর আপনার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে না। যদি বলেন, এই লোকমাটি হজম হতে পারবে না, আমি নিষেধ করলাম, বলুন, লোকমা কি সেকথা মানবে? মানবে না। এটি একটি অটোমেটিক সিস্টেম। যখন ভেতরে চলে যাবে, তখন সে আপনার কথা শুনবে না; বরং হজমপ্রক্রিয়ার কথামতোই চলবে। এমনিভাবে যেব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হবে, সে-ও প্রতিক্রিয়াশীল একটি অটোমেটিক সিস্টেমের আওতায় চলে আসবে, যা তাকে গুনাহের ক্ষতিসমূহের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েই ছাড়বে। নিম্নে কয়েকটা ক্ষতির বিবরণ পেশ করা হলো।'

গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

مَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

একটি খোদায়ি রীতি

মানুষ ভালো-মন্দ যেকোনো কাজই করুক তার একটা প্রভাব অবশ্যই হয়ে থাকে। দুনিয়ার সকল বস্তুর একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হলো, প্রতিটি কাজের ক্রিয়া থাকে।

For any action, there is equal and apposite reaction

পদার্থের মধ্যে যেমন এ নিয়ম চালু আছে, কর্ম-ক্রিয়ার মাঝেও এ নিয়ম চালু আছে যে, প্রতিটি কাজের প্রতিক্রিয়া হবে। নেক আমলের প্রতিক্রিয়া ভালো হবে, বদ আমলের প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে। যেমন– প্রবাদ আছে, ভালোর পরিণতি ভালো এবং মন্দের পরিণতি মন্দ।

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ

جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

'যেমন কর্ম তেমন ফল। বিশ্বাস না হয় তো করে দেখো। জান্নাতও আছে, জাহান্নামও, বিশ্বাস না হলে মরে দেখো!'

সুতরাং এটি একটি সুনিশ্চিত বিষয় যে, মানুষ ভালো কাজ করলে তার পরিণতি ভালো হবে আর মন্দ করলে পরিণতিও মন্দ হবে। এটা কিছুতেই

সম্ভব নয় যে, কাজ করল ভালো আর পরিণতি হলো খারাপ। এমনিভাবে কাজ করবে মন্দ আর পরিণতি হবে ভালো; এটিও অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, এটি একটি খোদায়ি নেযাম, খোদায়ি রীতি।

গুনাহ্ কাকে বলে?

গুনাহ্ তথা পাপ কাকে বলে? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষিদ্ধ কাজগুলো করা এবং তাদের আদেশ ভঙ্গ করার নামই গুনাহ্ তথা পাপ। শরঈ পবিভাষায় একে 'মা'সিয়াত' বলে। আমরা যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির খেলাফ কিংবা নবীজির সুন্নাতের পরিপন্থি কোনো কাজ করব, তখন তা গুনাহ্ হবে।

গুনাহ্ দু-ধরনের

সাধারণত গুনাহের দুটি ধরন রয়েছে।

এক. 'তরকে মামূর' তথা আদেশ অমান্য করা। অর্থাৎ– যে কাজ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল করতে আদেশ করেছেন, তা না করা। যেমন– নামাযের আদেশ, রোযার আদেশ, গাইরে মাহরামের সঙ্গে পর্দা করার আদেশ। তো এই কাজগুলো না মানা এবং এর বিপরীত করা-ই হলো গুনাহ্।

দুই. 'ফে'লে মাহযূর' তথা নিষিদ্ধ কাজ। অর্থাৎ– যে কাজগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো করা-ই গুনাহ্। যেমন– নামায ছেড়ে দেওয়া, বেগানা নারীর দিকে চোখ তুলে তাকানো ইত্যাদি। ওলামায়ে কেরামের কেউ-কেউ গুনাহ্ সম্পর্কে একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, গুনাহ্ দু-ধরনের। এক. যেগুলো আল্লাহর হকসংশ্লিষ্ট। দুই. যেগুলো বান্দাদের হকসংশ্লিষ্ট।

গুনাহের শ্রেণি বিন্যাস

ওলামায়ে কেরাম গুনাহকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

এক. **'যুনূবে শাইতানিয়্যাহ'** : তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার হলো 'যুনূবে শাইতানিয়্যাহ' তথা এমন গুনাহ্, যার সম্পর্ক শয়তানের কর্মকাণ্ডের সাথে। এর ব্যাখ্যা হলো–

وَهِيَ أَنْ يَتَشَبَّهَ الْعَبْدُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ وَالْبَغْيِ وَالْكِبْرِ وَالشِّرْكِ وَالْغِشِّ وَالْغِلِّ وَالْخِدَاعِ وَالْمَكْرِ

গুনাহের কিছু কাজ আমরা হিংসার কারণে করে থাকি। আর হিংসা করে শয়তান। তাই এটা শয়তানি কাজ। কিছু গুনাহ 'তাকাব্বুর' তথা অহংকারের কারণে করি। আর অহংকার করা শয়তানের কাজ। এমনিভাবে কিছু গুনাহ হয় আত্মতুষ্টির কারণে। সেটাও শয়তানের কাজ। কিছু হয় ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার কারণে। আর শয়তান হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। কিছু গুনাহ হয় ষড়যন্ত্রের কারণে। এই ষড়যন্ত্রও শয়তানের কাজ। মোটকথা, এ জাতীয় সকল গুনাহকে 'যুনূবে শাইতানিয়্যাহ' বলা হয়। কারণ, এ-ধরনের গুনাহগুলো শয়তানের কাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।

দুই : 'যুনূবে সাবইয়্যাহ।' : দ্বিতীয় প্রকার হলো 'যুনূবে সাবইয়্যাহ।' অর্থাৎ– পশুত্বের অনুরূপ গুনাহসমূহ। যেমন– পশু। তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি থাকে। কোনো অপরাধ ব্যতীতই অন্য প্রাণীকে আঘাত করে। তাদের কোনো বিবেক নেই। আচ্ছা বলুন তো, হরিণ সিংহের কি ক্ষতি করতে পারে? অথচ সিংহ হরিণকে কাছে পেতেই ঝাপটে ধরে হত্যা করে। এ হলো এমন গুনাহ, যা পশুত্বের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এর উদাহরণ হলো, কারো ওপর যুলুম করা, কারো অন্তরে ব্যথা দেওয়া। মানুষ সব সময় অন্যের মনে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায়। মহিলারা পরস্পরে কথা বলার সময় বলে, 'আমি তাকে এমন বলেছি; হয়ত পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।'

মোটকথা, যেসব গুনাহ পশুত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সেগুলোকে 'যুনূবে সাবইয়্যাহ' বলে।

তিন : 'যুনূবে বাহীমাহ।' : গুনাহের তৃতীয় প্রকার 'যুনূবে বাহীমাহ' তথা পশুস্বভাবের গুনাহ। পশুদের কাজ দুটা। এক হলো পানাহার করা আর অপরটা হলো যৌনবাসনা পূর্ণ করা।

قَضَاءُ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ

'বাতন' অর্থ পেট আর 'ফারজ্' অর্থ লজ্জাস্থান। তো পেট আর লজ্জাস্থানের খাহেশ পূরা করাই পশুদের মূল কাজ। গরু দেখুন, কী করে সে? ছাগল-বকরি দেখুন, কী কাজ তাদের সারা জীবনে? শুধু খাওয়া আর যৌনলালসা চরিতার্থ করা।

তো সর্বমোট তিন প্রকারের গুনাহ হলো। 'শাইতানিয়্যাহ', যা প্রতারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। 'সাবইয়্যাহ', যা অত্যাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং 'বাহীমিয়্যাহ', যার সম্পর্ক মানুষের শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির চাহিদার সঙ্গে।

গুনাহের সর্বশেষ পর্যায়

এই তিন ধরনের গুনাহের সর্বশেষ একটি পর্যায়ও রয়েছে। যেমন– 'যুনূবে শাইতানিয়্যা'-এর সর্বশেষ পর্যায় হলো, মানুষ গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করাকে শিরক বলে। অর্থাৎ– 'যুনূবে শাইতানিয়্যাহ'-এর সর্বশেষ পর্যায় হলো শিরক করা।

এমনিভাবে 'যুনূবে সাবইয়্যাহ'-এর সর্বশেষ পর্যায় হলো কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হতে পারে না। এমনিভাবে 'যুনূবে বাহীমা'-এর সর্বশেষ পর্যায় হলো ব্যিভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কোনো কাজ নেই। কারো ঘরের অবলা নারীর সম্ভ্রমহানির চেয়ে জঘন্য ও নির্মম কাজ আর কী হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এই তিন অপকর্মকে একই আয়াতে জমা করেছেন। তালেবে ইল্‌মরা লক্ষ করো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزْنُوْنَ

এখানে

لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَر

দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা শিরকের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

لَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করে না আর وَلَايَزْنُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ব্যভিচার' হতে যারা আত্মরক্ষা করে। পবিত্র কুরআন এ তিন প্রকারের গুনাহের আলোচনা করেছে। কারণ, মানুষ এই তিন ধরনের গুনাহের কোনো-না-কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

গুনাহের দুনিয়াবি ক্ষতি

গুনাহের যেসব ক্ষতি দুনিয়াতেই সংঘটিত হয় ওলামায়ে কেরাম এমন ক্ষতি প্রায় সত্তরটা গণনা করেছেন। এই মজলিস যেহেতু সংক্ষিপ্ত মজলিস, তাই সেই ক্ষতিসমূহ হতে শুধু কয়েকটা আলোচনা করছি। একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। গুনাহের এসব ক্ষতি নগদে দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। আখেরাতে ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হবেই। দুনিয়াতেও হবে। এগুলো এমন পরিণতি, যা কোনোদিন ফেরানো সম্ভব নয়। এর একটি উদাহরণ নিন।

যেমন– আপনি মুখে এক লোকমা খাবার দিলেন এবং গিলে ফেললেন। এ পর্যন্ত আপনার ইচ্ছাশক্তি কার্যকর ছিল। চাইলে আহার না-ও করতে পারতেন। কিন্তু গিলে ফেলার পর এখন আর আপনার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে না। যদি বলেন, এই লোকমাটি হজম হতে পারবে না, আমি নিষেধ করলাম, বলুন, লোকমা কি সেকথা মানবে? মানবে না। এটি একটি অটোমেটিক সিস্টেম। যখন ভেতরে চলে যাবে, তখন সে আপনার কথা শুনবে না; বরং হজমপ্রক্রিয়ার কথামতোই চলবে। এমনিভাবে যেব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হবে, সে-ও প্রতিক্রিয়াশীল একটি অটোমেটিক সিস্টেমের আওতায় চলে আসবে, যা তাকে গুনাহের ক্ষতিসমূহের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েই ছাড়বে। নিম্নে কয়েকটা ক্ষতির বিবরণ পেশ করা হলো।

এক. 'ফাসাদে কালব' তথা অন্তর নষ্ট হওয়া : ওলামায়ে কেরাম গুনাহের ক্ষতিসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে-ক্ষতিটার আলোচনা করেছেন, তা হলো,

فَسَادُ الْقَلْبِ وَظُلْمَتُهُ

অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং তাতে অন্ধকার সৃষ্টি হওয়া।

প্রতিটা গুনাহের কারণে মানুষের অন্তরে একটা করে কালো দাগ লেগে যায়। হাদীছ দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ

'যখন মুমিন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়।'

আরো গুনাহ করলে আরো দাগ লাগে। আরো করলে আরো লাগে। তবে তাওবা করে ফেললে সেই দাগ ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

দুই. 'তাওফীক' ছিনিয়ে নেওয়া হয় : দ্বিতীয় ক্ষতি হলো,

قِلَّةُ التَّوْفِيْقِ

'নেক আমলের তাওফীক কমে যায়।'

নামায পড়তে মন চায় না। কুরআন পড়তেও মন চায় না। বাবা-মায়ের আদেশ মান্য করা মুসিবত মনে হয়। সকালবেলা নামাযের জন্য ওঠা বিরক্তিকর মনে হয়। এমনকি নামাযান্তে দু'আ করাও বোঝা বলে মনে হয়। দু'আ করতে মনই চায় না। আপনি নোট করে দেখুন। কখনো-কখনো

আমাদের দু'আয় আধা মিনিট সময়ও লাগে না। মাখলুকের সামনে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা অভাব-অনটনের কথা বলে কাটিয়ে দিই। অথচ মহান রব্বুল আলামীনের সামনে নিজের অভাব-অনুযোগ পেশ করতে আধা মিনিটও সময় খরচ হয় না। তারপরও কী আশ্চর্য! মনই চায় না। নামাযের মুসল্লায় বসাও আযাব বলে মনে হয়।

এসবের মূল কথা হলো, তার থেকে নেক আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি কেউ যদি নেক আমলের জন্য নসীহত করে, তাকে দুশমন বলে মনে হয়–

میں اسے سمجھوں ہی دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

অর্থাৎ– যে-ই আমাকে উপদেশ দেয়, তাকেই সবচেয়ে বড় দুশমন বলে মনে হয়।

বাবা সন্তানকে উপদেশ দেয়, বাবা! এমন করো না। এখন বাবাকেই দুশমন মনে হচ্ছে। বাবাকে এখন এতটাই ঘৃণা করে যতটা দুশমনকে ঘৃণা করে। অন্তর এতটাই বিগড়ে যায়! অথচ বাবার চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে হতে পারে! সারাক্ষণ বাবার মধ্যে এই ভাবনাই ঘুরপাক খায়, কীভাবে আমার সন্তান ভালো থাকবে, কীভাবে তার কল্যাণ হবে। কিন্তু সন্তানের তো তা বুঝেই আসে না।

তিন. বরকতহীনতা : তৃতীয় ক্ষতি হলো বরকতহীনতা।

حِرْمَانُ الْعِلْمِ وَالرِّزْقِ وَبَرَكَةِ الْعُمُرِ

'ইল্‌ম, রিযিক ও হায়াতের বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।'

ইল্‌মের বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। প্রথমত পড়ালেখা করতে ভালো লাগে না। পড়ে ঠিক, তবে মনে থাকে না। অভিযোগ করে, 'আমি কী করব? বারবার পড়ি; কিন্তু মুখস্থই হয় না। মাথায় কিছুই বসে না। এসব গুনাহের ফল। একমাত্র গুনাহের কারণেই এমন হয়। আমাদের আকাবিরদের জীবনী দেখুন। তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল ফটোগ্রাফিক মেমরির মতো। যেমন– ইমাম বোখারি (রহ.)। একবার তাঁকে এক মজলিসে একশত হাদীছ সনদসহ শুধু একবার শোনানো হয়েছিল। পরে তিনি সেই হাদীছগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদসহ এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দিলেন। মাত্র একবার শোনার পর।

আসলে গুনাহের কারণে মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। স্কুল-মাদরাসার ছাত্ররা বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের কাছে পড়ালেখা ব্যতীত অন্য সব কিছুই ভালো লাগে। শুধু পড়তে ভালো লাগে না। একেই বলে ইল্‌ম হতে মাহরুমি।

দ্বিতীয়ত রিযিকের বরকতহীনতা। গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়। পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই মিলে কাজ করে। সবাই উপার্জন করে। কিন্তু তারপরও সংসারের খরচ চলে না। আমার কাছে বড়-বড় শহরের অনেক লোক আসে। তাদের অনুযোগই শেষ হয় না। পরিবারের সবাই উপার্জন করে। স্বামীও আয় করে, স্ত্রীও আয় করে। ছেলেও চাকরি করে, মেয়েও চাকরি করে। কিন্তু তারপরও তাদের সংসারখরচ ঠিকমতো চলে না। এর কারণ কী? কারণ হলো, বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

তৃতীয় বিষয় হলো, জীবন থেকেও বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

চার. নেকির কাজ থেকে পলায়ন : চতুর্থ ক্ষতি হলো,

وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِيْ فِيْ قَلْبِهٖ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ

'অপরাধী বান্দা তার ও আল্লাহর মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক অন্তরে অনুভব করে।'

এ-কারণেই আল্লাহর কথা শুনতে তার ভালো লাগে না। মসজিদে আসতে ভালো লাগে না। নেকির কথা শোনা থেকে দূরে থাকে। এটা এক ধরনের আতঙ্ক, যা গুনাহেরই কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়।

পাঁচ. কাজ পূর্ণ হতে হতে অপূর্ণ থেকে যাওয়া : পঞ্চম ক্ষতি হলো,

تَعْسِيْرُ اُمُوْرِهٖ وَعَدَمُ قَضَاءِ حَاجَاتِهٖ

'সকল কাজকর্ম কষ্টসাধ্য হয়ে যাওয়া এবং পূর্ণ হতে হতে তা অপূর্ণই থেকে যাওয়া।'

আপনারা হয়ত এ বিষয়টি লক্ষ করে থাকবেন যে, বহু কাজ এমন আছে, যা হচ্ছে-হচ্ছে করে আর হচ্ছে না। শেষ-শেষ করেও তা আর শেষ হয় না। অনেকে বলেন, হযরত! কাজটা হতে-হতে শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে উচ্চ পরিবার থেকে লোক আসে। মেয়ে দেখে পছন্দও করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর প্রস্তাব নিয়ে আগে বাড়ে না। তো এই যে কর্মের অসম্পূর্ণতা, এ কেবল গুনাহেরই প্রতিফল। গুনাহের এই পরিণতি মানুষ দুনিয়াতেই ভোগ করে থাকে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি নেক কাজে লিপ্ত

থাকে, গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার সকল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে দেন।

দেখুন, এক হলো ছুটন্ত ঘোড়া। আরেক হলো টাঙ্গার ঘোড়া। টাঙ্গার ঘোড়া আপনি দশ-পনেরো হাজার টাকায় পেয়ে যাবেন। কিন্তু যে ঘোড়া দৌড়প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য কেনা হয়, তা পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ টাকা খরচ করে কিনতে হয়। ইয়া আল্লাহ! এত দাম! হাঁ; এতই দাম। কারণ, তা রেকর্ড সৃষ্টি করা এবং বিজয় লাভ করার জন্য হয়ে থাকে। এখন যার কাছে পনেরো লক্ষ টাকার ঘোড়া থাকবে, সে কি একে গাধার টাঙ্গায় ব্যবহার করবে? না। সে বলবে, আরে ভাই! এটা আমার প্রতিযোগিতার ঘোড়া, আমি একে গাধার টাঙ্গায় ব্যবহার করতে পারি না।

ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা নেককার বান্দাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি তাদের দুনিয়ার গাধাগাড়ির মধ্যে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, এই বান্দা তো আমার সন্তুষ্টির জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, নেক কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে, তা হলে একে কেন দুনিয়ার ঝুটঝামেলায় ফেলে রাখব! এ-কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সকল কাজ সহজ করে দেন।

আজ তো লোকেরা এসে বলে, হযরত! একটা সময় এমন ছিল যে, মানুষ মাটি স্পর্শ করলেই তা সোনা হয়ে যেত। আর আজ অবস্থা এমন যে, স্বয়ং সোনা ছুলে তা-ও মাটি হয়ে যায়। এসব হলো আমাদের গুনাহের পরিণতি।

ছয়. অজানা আতঙ্কে অস্থির থাকা : ছয় নম্বর ক্ষতি হলো,

وَهْنُ قَلْبِهٖ وَبَدَنِهٖ

'দেহ ও মনে দুর্বলতা এসে যায়।'

এরপর বান্দার মধ্যে সর্বদা ভয় ও আতঙ্ক কাজ করে। অজানা একটা আতঙ্কে সে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। প্রকৃত সত্য হলো, যে-বান্দা আল্লাহকে ভয় করে না, সে অন্য সব কিছুতেই ভয় পায়। অন্ধকারেও ভয় পায়, বাতাসে দরজা নড়লেও ভয় পায়। তাছাড়া শারীরিক দুর্বলতা তো সব সময় লেগেই থাকে।

সাত. নেকির স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া : সপ্তম ক্ষতি হলো,

حِرْمَانُ الطَّاعَةِ وَلَذَّتِهٖ

'নেকির স্বাদ থেকে মাহরুম হয়ে যাওয়া।'

নামাযে স্বাদ পায় না, কুরআন তেলাওয়াতে স্বাদ পায় না। তাহাজ্জুদে স্বাদ থাকে না, তাসবীহ-তাহলীলে স্বাদ থাকে না। মোটকথা কোনো আমলেই স্বাদ অনুভব হয় না। এটা মূলত গুনাহের প্রভাব।

বনী ইসরাঈলের এক আলেম ছিল। সে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল। যেহেতু সে আলেম ছিল, তাই গুনাহের পর এই ভয়ও তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল যে, গুনাহের কোন পরিণতি না-জানি আমাকে ভোগ করতে হয়। আবার এ-বিষয়টিও তার দৃষ্টি এড়াত না যে, পূর্বের মতো এখনও তার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে। একদিন সে দু'আ করার সময় বলে উঠল, হে আল্লাহ! আপনি কত দয়াবান! আমি পাপের-পর-পাপ করেই যাচ্ছি; তারপরও আপনার নেয়ামতসমূহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেননি। এখনো তা অবিরাম আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে!

আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে একথা ঢেলে দিলেন যে, 'বান্দা আমার! আমার নেয়ামতসমূহ কিন্তু তোমার ওপর পূর্বের মতো অবশিষ্ট নেই। তুমি অনুভব করতে পারছ না। একটু ভেবে দেখো, যেদিন থেকে তুমি এই গুনাহ করছ, সেদিন থেকে আমি তোমাকে তাহাজ্জুদে কাঁদার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এরপর সে বুঝতে পারল, ও হো পূর্বে তাহাজ্জুদের মধ্যে কান্না আসত; কিন্তু এখন আর আসে না। এখন তাকবীরে উলা ছুটে যায়, তাহাজ্জুদ ছুটে যায়! জানি না, এসব কোন গুনাহের পরিণতি!

আট. আয়ু কমে যায় : অষ্টম ক্ষতি হলো,

قَصْرُ الْعُمُرِ

'আয়ু কমে যাওয়া।'

আয়ু কমে যাওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, 'তার আয়ুকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। কারণ, হাদীছে এসেছে, 'যিনা-ব্যভিচারের কারণে আয়ু সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। আর নেক আমলের কারণে আয়ু বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, তার শান্তিময় হায়াত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। যেমন– বয়স তো ছিল পঁচাত্তর বছরই; কিন্তু পঞ্চাশ বছরেই ব্লাডপ্রেসার, সুগার, এই সমস্য, ওই সমস্যা। হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা; নড়াচড়া করতে পারে না। এভাবেই সে ঘরের লোকদের জন্য আপদ হয়ে যায়। অর্থাৎ– জীবনের সক্ষম অংশটুকুতে সে অক্ষম হয়ে বসে থাকে। এটাও আয়ু কমে যাওয়ার মতোই একটি বিপদ। সব কিছু থেকেও অনেক কিছুই নেই!

নয় : আল্লাহর দৃষ্টি হতে পড়ে যাওয়া : নবম ক্ষতি হলো,

سَبَبٌ لِهَوَانِ الْعَبْدِ عَلٰى رَبِّهٖ وسُقُوْطِهٖ مِنْ عَيْنِهٖ

'গুনাহের একটা ক্ষতি এটাও যে, মানুষ আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়।'

আল্লাহর দরবারে তার কোনো মূল্যই থাকে না। যদি কোথাও রোড এক্সিডেন্টে কেউ নিহত হয়, তখন খবরের কাগজে তার মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয় যে, অমুক ব্যক্তি রোড এক্সিডেন্টে নিহত হয়েছে। কেন? কারণ, মানুষের মূল্য আছে। এজন্য মূল্যবান জিনিসের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হয়। পক্ষান্তরে কোথাও যদি একটা নয় এক লক্ষ মাছিও মারা যায়, তার সংবাদ কি পত্রিকায় ছাপা হয়? না, কারণ কী? কারণ হলো, মানবসমাজে মাছি কোনো মূল্যবান বস্তু নয়। এমনিভাবে বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন সে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দৃষ্টি থেকে পড়ে গিয়ে মাছি-মশার সমকক্ষ হয়ে যায়। দুনিয়ায় তার সঙ্গে কী আচরণ করা হচ্ছে এ নিয়ে আল্লাহ কোনো পরোয়া-ই করেন না।

দশ : গুনাহের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় : দশম ক্ষতি হলো,

اَلتَّعَوُّدُ عَلَى الْمَعَاصِىْ

'গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়া।'

অর্থাৎ– এক গুনাহ অপর গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ কারো মদপান করার অভ্যাস হয়ে গেল। এখন মদ তো যখন-তখন, যেখানে-সেখানে পান করা যায় না। দূরে কোথাও কিংবা গভীর রাতে পান করে ঘরে ফিরতে হয়। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বেটা! এত দেরি করে ঘরে ফের কেন? কোথায় থাক এত সময়? ছেলে একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে দশটা মিথ্যা বলে। এমনকি এক পর্যায়ে মিথ্যা কসম খেতেও তার বিবেকে বাঁধে না। এভাবেই একটা গুনাহ আরো বহু গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

এগারো : লাঞ্ছিত হওয়া : একাদশ ক্ষতি হলো,

اِنَّ الْمَعْصِيَةَ تُوْرِثُ الذُّلَّ

'গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে হয়।'

এমনিতেই সব গুনাহের সঙ্গেই লাঞ্ছনা লেখা থাকে। যখন কেউ গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন সেই লাঞ্ছনা তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহ মানুষের

অন্তর থেকে তার মর্যাদা মিটিয়ে দেন। ফলে কেউ তাকে অন্তর থেকে সম্মান করে না।

বারো : বিবেক ভ্রষ্ট হয়ে যায় : দ্বাদশ ক্ষতি হলো,

إِنَّ الْمَعَاصِيَ تُفْسِدُ الْعَقْلَ

'গুনাহ মানুষের বিবেক নষ্ট করে দেয়।'

অর্থাৎ– সঠিক বিষয় বোঝা ও অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। চিন্তাভাবনা ভ্রান্ত পথে বেশি পরিচালিত হয়। বলে, আরে ভাই! পর্দা তো হবে চোখের; চেহারার আবার পর্দা কিসের? যেন সঠিক ধারায় চিন্তা করার যোগ্যতাই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বলে, আরে ভাই! ওই বস্তুটি কেন নিষিদ্ধ করা হলো? এর মধ্যে হেকমত কী?

যেব্যক্তি কালেমা পাঠ করেছে, তার আবার এমন প্রশ্ন করার প্রয়োজন কী যে, অমুক বস্তু হারাম করার মধ্যে হেকমত কী? বড়ই আশ্চর্য লাগে! ক্ষুদ্র বান্দার এমন কি ক্ষমতা-ইবা আছে যে, সে আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ করছে?

তেরো : অন্তর অন্ধ হয়ে যাওয়া : ত্রয়োদশ ক্ষতি হলো,

إِنَّمَا تَطْبَعُ عَلَى الْقَلْبِ حَتَّى يَعْمَى

'গুনাহের কারণে অন্তরের ওপর মহর লেগে যায়। এমনকি একটা পর্যায় গিয়ে অন্তর অন্ধ হয়ে যায়।'

চৌদ্দ : নবীজির অভিশাপযোগ্য হয়ে যাওয়া : চতুর্দশ ক্ষতি তো বড়ই আশ্চর্যজনক। তা হলো,

صَاحِبُ الْمَعَاصِيْ يَدْخُلُ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'গুনাহগার ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

কত গুনাহ যে এমন আছে, যেগুলো করার কারণে আল্লাহর প্রিয় রাসূল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন! তো গুনাহগার বান্দারা নবীজির অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন–

এক. যেসব পুরুষ মেয়েদের বেশভুষা অবলম্বন করে; এমনিভাবে যে-মেয়েরা পুরুষের বেশ ধারণ করে, নবী কারীম সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন।

দুই. যেসব পুরুষ বেগানা নারীর দিকে তাকায় অথবা যেসব নারী কোনো বেগানা পুরুষকে নিজের দেহ দেখায়, তো যে দেখেছে এবং যে দেখিয়েছে উভয়ের ওপরই নবীজি লা'নত করেছেন। নাউজুবিল্লাহ!

পনেরো : নবীজির দু'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া : পঞ্চদশ ক্ষতিও অনেক ভয়াবহ। তাহলো–

حِرْمَانُ الْمَعَاصِيْ مِنْ دَعْوَةِ رَسُوْلِ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ

'যেব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের মুবারক দু'আ থেকে তার অংশ রহিত করা হয়। সেই তালিকা থেকে তার নাম মুছে ফেলা হয়। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটা কত বড় ক্ষতি। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে!

ষোলো : লজ্জা হারিয়ে যাওয়া : ষোড়শ ক্ষতি হলো,

ذَهَابُ الْحَيَاءِ

'গুনাহের কারণে লজ্জা হারিয়ে যায়।'

অর্থাৎ– বেহায়া ও নির্লজ্জ হয়ে যায়।

اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

'যখন তোমার লজ্জা হারিয়ে যাবে, তখন তোমার যা মন চায় করতে থাকো।'

স্মরণ রাখবেন, মুমিন সর্বদা লাজুক ও হায়াশীল হয়।

যার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেওয়া হলো, ধরে নাও তার দীনও হাতছাড়া হয়ে গেছে। কারণ, লজ্জা ও ঈমান একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লজ্জা যাওয়ার সময় একা যায় না; ঈমানকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। হাদীছেও এমনটি-ই বর্ণিত হয়েছে যে, 'মানুষ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তার থেকে সরে এক পাশে দাঁড়িয়ে যায়।

সতেরো : অন্তর থেকে আল্লাহর আযমত চলে যাওয়া : সপ্তদশ ক্ষতি হলো,

تَضْعُفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيْمِ الرَّبِّ جَلَّه جَلَالُهُ

'গুনাহগার বান্দার অন্তর হতে আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের অনুভূতি দুর্বল হয়ে চলে যায়।'

এরা গুনাহ তো করেই। তার ওপর আবার তাকে মামুলি বিষয় মনে করে। কোনো পাত্তাই দেয় না। মনে হয়, একটা মাছি এসে বসল আর থাপ্পর মেরে উড়িয়ে দিল। আল্লাহর আদেশ ভঙ্গ করা তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

আঠারো : 'ভুলে যাওয়া'-র রোগী হয়ে যাওয়া : অষ্টাদশ ক্ষতি হলো, মানুষ গুনাহের কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে 'ভুলে যাওয়া'-র রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, যেখানে গুনাহ হয়, সেখানকার লোকেরা 'ভুলে যাওয়া'র রোগে আক্রান্ত হবে। কোনো কিছুই তাদের মনে থাকবে না।

ঊনিশ : নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয় : ঊনবিশংতি ক্ষতি হলো,

تَزِيْلُ النِّعَمُ وتَحِلُّ النِّعَمُ

'আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ধীরে-ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।'

স্মরণ রাখবেন, যে আল্লাহ নেয়ামত দান করতে জানেন, তিনি তা ছিনিয়ে নিতেও জানেন। আমাদের উদাসীনতার দরুন আল্লাহ যেন আমাদের নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে না যান। একবার যদি নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে তা আর দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

ইল্‌ম, সম্পদ ও সম্মান এরা তিনজন এক সাথেই থাকত। কোনো কারণে যখন পৃথক হচ্ছিল, তখন পরস্পর বলাবলি করল, ভাই! চলে তো যাচ্ছ; তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও; প্রয়োজনে যেন খুঁজে পাওয়া যায়।

সম্পদ : আমাকে পেতে চাইলে বাজারে যেয়ো। সেখানে গেলেই আমাকে পেয়ে যাবে। আমি সেখানেই থাকি। তার মানে দোকান বসাও, ব্যবসা করো; তাহলে আমাকে পেয়ে যাবে।

ইল্‌ম : আমি মাদরাসায় থাকি। কেউ যদি আমাকে পেতে চায়, তাহলে মাদরাসায় গিয়ে খুঁজলেই আমাকে পাওয়া যাবে।

সম্মান : কোনো কথা বলল না।

ইল্‌ম ও সম্পদ : আরে ভাই! তুমি চুপ কেন? কিছু বলো! তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলে যাও?

সম্মান : আমি যখন একবার চলে যাই, আর ফিরে আসি না। এটাই আমার স্বভাব। আমি জীবনে শুধু একবার আসি।

বিশ : রিযিক সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া : বিংশতি ক্ষতি হলো,

اَلْمَعِيْشَةُ الضَّنْكُ فِي الدُّنْيَا

'দুনিয়ার জীবনে রিযিকের সংকীর্ণতা।'

যে গুনাহ করে, আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। রিযিক সংকীর্ণ হওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে।

এক. রিযিকের পরিমাণই কম হয়; সারাটা দিন দোকানে বসে-বসে পার করে দিচ্ছে; ক্রেতা আসে না। কেম্পানি খুলে বসে আছে; কিন্তু মালের কোনো অর্ডার নেই।

দুই. বেচাবিক্রি তো হচ্ছে, মালের আমদানী-রপ্তানিও আছে। কিন্তু টাকাপয়সা আটকে যাচ্ছে। স্বচ্ছতার সাথে মূল্য পরিশোধ হচ্ছে না। এমনি তো কোটিপতি, টাকার গদিতে শোয়; কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। কখনো সম্পদ আরও বেশি উপার্জনের চিন্তা, আবার কখনো সম্পদ রক্ষা করার দুশ্চিন্তা। কারণ, পৃথিবীতে বড়-বড় ডাকাতি, ছিনতাই ও আত্মসাতের ঘটনাগুলো টাকাওয়ালাদের সাথেই ঘটে– গরিবের সাথে ঘটে না। যাহোক, এভাবেই তার জীবনকে আল্লাহ সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ করে দেন। কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى

'যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আমি তার দুনিয়ার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেব এবং কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ বানিয়ে উত্থিত করব।'[১]

চিন্তা করুন! এটা মানুষের জন্য কত মারাত্মক শাস্তি হবে যে, কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ বানিয়ে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। এমনিই তো আমাদের নসিব খারাপ! এমন সময় দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি যখন নবীজির দিদার হতে বঞ্চিত হলাম। এখন যদি গুনাহের কারণে আখেরাতেও অন্ধ হয়ে উঠতে হয়, তা হলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আখেরাতেও নবীজির দিদার হতে মাহরুম হব! এই দ্বিমুখী বঞ্চনাকে কীভাবে বরদাশত করব! (একথা বলার পর হযরতওয়ালা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েন)।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১২৪

পূর্ববর্তী উম্মতের ধ্বংসের কারণ

অতীতে যত উম্মত অতিবাহিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশকেই গুনাহের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কারো চেহারা বিকৃত করে দিয়েছেন। কাউকে আবার দিয়েছেন ভিন্ন ধরনের শাস্তি। আযাব এসেছিল চার ধরনের। আগুনের, পানির, বাতাসের এবং মাটি ও পাথরের। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ومنهم مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ومِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

'পূর্ববর্তী উম্মতদের আমি তাদের গুনাহের কারণে প্রত্যেককে পাকড়াও করেছি। কারো ওপর পাথর বর্ষণ করেছি, কাউকে এমন বিকট চিৎকার দ্বারা ধ্বংস করেছি যে, বিকট শব্দের কারণে তাদের কলিজা ফেটে গিয়েছিল। কাউকে আবার ভূমিকম্প দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। আবার কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি।'[১]

যেমন–

নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ওপর পানির আযাব এসেছিল।

ফেরাউনের ওপর পানির আযাব এসেছিল।

আদ সম্প্রদায়ের ওপর ঝড়োহাওয়ার আযাব এসেছিল।

ছামুদ সম্প্রদায়ের ওপর বিকট চিৎকারের আযাব এসেছিল।

লূত সম্প্রদায়ের ওপর পাথরবৃষ্টির আযাব এসেছিল। আযাবের ফেরেশতারা তাদের ভূখণ্ডকে আকাশ পর্যন্ত শূন্যে তুলে উল্টে দিয়েছিল।

কারুনকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ওপর কালো মেঘ উঠেছিল। তারা ধারণা করল, বৃষ্টি হবে। কিন্তু আল্লাহ তা থেকে অগ্নি বর্ষণ করে তাদের ভস্ম করে দিলেন।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত এসব ঘটনা শুধু কিচ্ছা-কাহিনিই নয় যে, এগুলো শুনে আমরা নীরব হয়ে থাকব। না! বরং আল্লাহ রব্বুল ইযযত এসব ঘটনা শুনিয়ে বান্দাকে একথা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার জন্য আমার একটি নিয়ম আছে।

---

১. সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪০

আমি একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি যে, এটি পরিবর্তন হতে পারবে না। পৃথিবীর যেকোনো স্থানেই যাও, কোথাও প্রাকৃতিক এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে না। প্রকৃতির নিয়ম একটাই। এ-কারণেই সমগ্র পৃথিবীর সকল প্রকৌশলী ভেবেচিন্তেই ঘর নির্মাণ করেন। ষোলো তলা বিশিষ্ট বিশাল বাড়ির ডিজাইন একই নীতিমালার আলোকে করে থাকেন।

তো আল্লাহ তা'আলা যেমন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহে বিশেষ নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তদ্রূপ রূহজগতের জন্যও কিছু বিশেষ রীতি নির্ধারণ করা আছে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের জন্য যে কানুন ছিল, তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমাদেরকে তাদের ঘটনা ও উত্থান-পতনের ইতিহাস শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, দেখো, তারা এই-এই পাপের পথ ধরেছিল। ফলে তাদের এই-এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। তোমরাও যদি সেই পাপের পথে চল, তবে তোমাদের জন্যও মর্মন্তুদ শাস্তি অপেক্ষা করছে।

চল্লিশ বছর পূর্বে করা পাপের শাস্তি

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 'কিতাবুয যুহ্দ' নামক গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহ.)-এর ঘটনা লিখেছেন। 'একবার তিনি মারাত্মকভাবে ঋণের চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। বললেন,

إِنِّي لَأَعْرِفُ هَذَا الغَمَّ بِذَنْبٍ أَصَبْتُهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً

'আমি জানি, আমার ওপর আসা এই বিপদ আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে করা একটা পাপের কারণে এসেছে।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

'যেকোনো বিপদই তোমাদের ওপর পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপই আসে।'[১]

একব্যক্তি একজন বেগানা নারীকে কামভাব নিয়ে দেখল। এরপর সে স্বপ্নে দেখল, একব্যক্তি তাকে বলছে, 'তুমি এই কুদৃষ্টির পরিণাম অবশ্যই ভোগ করবে যদিও তা একটু দেরিতে আসুক।

---

১. সূরা শূরা : আয়াত ৩০

কুরআন মুখস্থ হওয়া থেকে মাহরূমি

হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) এই ঘটনাটি লিখেছেন। একজন হাফেযে কুরআন ছিল। সে কোনো বেগানা নারীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এই পাপের পরিণতি এই হলো যে, চল্লিশ বছর পর সে পুরো কুরআন ভুলে গেল।

আমলের সাইনবোর্ড

হযরত সুলাইমান তাইমি (রহ.) বলেন, 'মানুষ রাতভর লুকিয়ে গুনাহ করে। যখন সকাল হয়, তখন আল্লাহ রব্বুল ইযযত তার চেহারায় যিল্লত ও অপদস্থতা ফুটিয়ে দেন। মানুষ যদি পুকুরে ডুব দিয়ে পানির নিচে কোনো পাপ করে, আল্লাহ তা'আলা তারপরও তার চেহারায় অপমান ও যিল্লতির প্রমাণ এঁকে দেন। পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন কোনো পাপ করত, তখন সকালবেলা তাদের দরজায় লিখিত পাওয়া যেত, 'অমুক বান্দা অমুক পাপ করেছে'। আজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে পাপীর ওপর যদিও পর্দা ঢেলে রেখেছেন, কিন্তু তার চেহারাকে সাইনবোর্ড বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সেই পাপী চেহারা দেখেই চিনে ফেলেন। এর বিপরীতে যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে ইবাদত করে, তাদের চেহারাগুলো আল্লাহ তা'আলা নূর দ্বারা আলোকিত করে দেন।

হযরত আবু সুলাইমান দারানি বলেছেন–

مَنْ صَفَّى صُفِّلَهُ وَمَنْ كَدِرَ كُدِرَ عَلَيْهِ

'যে সদাচারী হবে, আল্লাহও তার সঙ্গে সদাচরণ করবেন। আর যে গুনাহগার ও পাপী বান্দা হবে, তার সঙ্গে তেমনই দুর্ব্যবহার করা হবে।

وَمَنْ أَحْسَنَ فِيْ نَهَارِهِ كُوْفِيَ فِيْ لَيْلِهِ

'যেব্যক্তি তার দিবস সৎভাবে কাটাবে, আল্লাহ তাকে রাতের ইবাদতের তাওফীক দান করবেন।'

গুনাহের প্রভাব অধীনদের মধ্যেও আসে

ফুজাইল ইবনে ইয়ায (রহ.) একজন বড়মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'যখনই আমার থেকে কোনো গুনাহ হয়ে যায়, আমি দেখেছি, তার প্রভাব আমার অধীনদের মধ্যেও পড়েছে। হয়ত আমার স্ত্রীর মধ্যে

প্রভাব পড়েছে; সে আমার অবাধ্যতা করল অথবা আমার কর্মচারীদের মধ্যে পড়েছে; তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। অথবা আমার বাহনের মধ্যে এর প্রভাব দেখেছি যে, সে আমার আদেশ ভঙ্গ করছে।

অর্থাৎ– শাশ্বত একটি রীতি প্রতিষ্ঠিত আছে যে, যদি আমরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ভঙ্গ করি, তাহলে আমাদের অধীনরাও আমাদের আদেশ অমান্য করবে। কোনো উপদেশই কাজে লাগবে না। আজকাল দেখুন না! দাম্পত্যজীবনে কত অভিযোগ! স্ত্রী কথা মানে না, সন্তানরা কথা মানে না। ফ্যাক্টরির মালিকরা বলে, শ্রমিকরা কথা মানে না। এর কারণ হলো, যখনই আমরা আমাদের ওপরস্থ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ত্রুটি করব, তখনই আমাদের অধীনদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও আছেন, যাদের সামান্য খেদমতের জন্য লোকেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। তারা তাঁর জুতা তুলে চোখে-মুখে লাগায়। এমন কাজ করার সুযোগকে তারা বিশাল নেয়ামত মনে করে। বলুন তো এর কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, এরা সর্বদা আল্লাহর খেদমতে লেগে থাকেন আর আল্লাহ গোটা সৃষ্টিজগতকে তার খেদমতে লাগিয়ে দেন।

এক বাদশাহর আফসোস

বাদশাহ হারুনুর রশীদ একবার তার শাহী মহলের জানালা দিয়ে মসজিদের দিকে তাকিয়েছিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) তখন মসজিদে নামায আদায়ের জন্য আসছিলেন। পেছনে দুজন তালেবে ইল্‌মও ছিল। ইমাম সাহেব যখন মসজিদে প্রবেশ করার জন্য জুতা খুললেন, তখন ছাত্ররা কে কার আগে হযরতের জুতা হাতে নেবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। অবশেষে উভয়ে একটা করে জুতা পেল। কিন্তু মসজিদে জুতা নিয়ে ঢোকার উপায় কী? তাই তারা একটা রুমালের মধ্যে জুতাদুটো রেখে উভয়েই রুমালের দুপাশ ধরে মসজিদে প্রবেশ করল। এতে হযরতের জুতা উঠানোর সৌভাগ্য হতে কেউ বঞ্চিত হলো না।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ এ-দৃশ্য অবলোকন করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, লোকেরা তো আমাদেরকে বাদশাহ বলে। আসলে প্রকৃত বাদশাহ তো এরা। আমাদের জুতা উঠানোর জন্যে কেউ কি এভাবে কাড়াকাড়ি করে!

যারা সর্বদা নেক আমল ও সৎকর্মের মাঝে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবেই মর্যাদা দান করেন। আর যারা পাপের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে তাদের আত্মসম্মানবোধ দূর করে দেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক জমিদার ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক ফসলি জমি দান করেছিলেন। তার জমির পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, পরপর তিনটি ট্রেনস্টেশন তার জমির ওপরই ছিল। একবার সে শহরের এক প্রশস্ত চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। একজন বলল, আজকাল হাত একেবারেই খালি হয়ে গেছে। খুব পেরেশানিতেই সময় পার হচ্ছে। তো জমিদার খুব আত্মতুষ্টি ও গর্বের সাথে বলল, কী যে হলো তোমাদের! সারাদিন নাই-নাই করে বিলাপ করছ! আমাকে দেখো। আমার পেরেশানি হলো সম্পদ ব্যয় করব কোথায়? আমার যা আছে তা আমার চল্লিশটা বংশও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তার দম্ভোক্তি আল্লাহর পছন্দ হয়নি। ফলাফল কী হলো? সে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

তার একটিমাত্র ছেলে ছিল। বয়স সতেরো বছর। সে পিতার সকল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হলো– বিপুল অংকের ব্যাংক একাউন্ট, দৃষ্টিসীমার বাইরে পর্যন্ত জমিদারি, গাড়ি-বাড়ি, ধন-জন সব কিছুর। কিন্তু বয়সটা ছিল যৌবনের বিপজ্জনক কোটায়। অসৎ ছেলেদের সঙ্গ পেয়ে সে আস্তে-আস্তে মদ, জুয়া ও নারীর পেছনে ছুটতে লাগল। প্রতি দিন যেনার জন্য নতুন মেহমানের তালাশে থাকত। কাউকে পঞ্চাশ হাজার কাউকে এক লক্ষ টাকায় ভাড়া করে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে উঠল। সমস্ত সম্পদ পানির মতো ব্যয় করতে লাগল। দেশি ক্লাব থেকে বিদেশি ক্লাব কোনো পেয়ালাই বাকি রইল না। সব পেয়ালার স্বাদ নিতে থাকল। ফলে ব্যাংকের গচ্ছিত সব টাকা শেষ হয়ে এবার জমি বিক্রি করতে বাধ্য হলো। কিছুদিন পরপর বিদেশ থেকে এসে এক টুকরা জমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যেত। এভাবেই বছরের-পর-বছর পার হতে লাগল। মদ ও যিনা উভয়টি যেভাবে তার সম্পদকে ধ্বংস করে চলল, তদ্রূপ শরীর-স্বাস্থ্যও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এমনসব মরণব্যাধি তাকে চেপে বসল, যা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। সাধারণত যিনা-ব্যভিচারে লিপ্তরাই এসব রোগে আক্রান্ত হয়।

পরিশেষে সব কিছু হারিয়ে ভিটাবাড়ি বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হয়নি। তারপর সেই দিকভ্রষ্ট যুবককে এমন দিনও দেখতে হলো, যে দিন সে শহরের সেই প্রশস্ত চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে দুমুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে

নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেখানে দাঁড়িয়ে তার বাবা দম্ভভরে বলেছিল, আমার পেরেশানি হলো, এত সম্পদ আমি ব্যয় করব কোথায়? আমার যা আছে, তা আমার চল্লিশ পুরুষও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি যেভাবে নেয়ামত দান করতে জানেন, তদ্রূপ তা ছিনিয়েও নিতে জানেন। আল্লাহ আমাদের খাঁটি তাওবা করার তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে দুনিয়ার যিল্লতি থেকেও মুক্তি দিন, আখেরাতের আপমান থেকেও মুক্তি দেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তিনটি অমূল্য বাণী

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মূল্যবান হাদীছ আছে। খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে আমাদের জন্য রয়েছে মহামূল্যবান নসীহত। হাদীছটিতে ছোট্ট করে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

এক. যেব্যক্তি নিজ সম্পদ হতে আল্লাহর পথে সদকা করে, আল্লাহ তার সম্পদে বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন।

দুই. যেব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ক্ষমা করে দেয়, বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

তিন. যেব্যক্তি নিজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে নেবে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা ও সুখ্যাতি দান করবেন।'

তিনটি অমূল্য বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

মানবজাতির উত্থানের রহস্য

এ-পৃথিবীতে মানবজাতি হলো আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাঁর সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম নমুনা। তারা যখন নিজের ওপর মেহনত-মুজাহাদা করে, তখন তাদের মর্যাদার উচ্চতা ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে যায়। আবার যখন নিজের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায়, তখন অধঃপতন হতে-হতে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা

পৃথিবীর সকল মানুষ দুজন পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করে। একজন ডান কাঁধে উপবিষ্ট, অপরজন বাম কাঁধে। ডান কাঁধের ফেরেশতা তার নেক আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম কাঁধের ফেরেশতা তার বদ আমল ও অসৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। ছোট-বড় কোনো আমলই তাদের অগোচরে থাকে না। তার প্রতিটি কথা ও কাজ সংরক্ষিত ও রেজিস্টারভুক্ত হচ্ছে। কেয়ামতের দিন এগুলো আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হবে। এই দুই ফেরেশতার মধ্যে আল্লাহ ডান কাঁধের ফেরেশতাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন। আর অপরজনকে করেছেন অধীন। যখন কোনো বান্দা নেক আমলের ইচ্ছা করে, তখন ডান কাঁধের ফেরেশতা তা লিখে ফেলেন। যেহেতু তিনি

অফিসার, তাই পদের ক্ষমতা বলে তা লিখে ফেলেন। কিন্তু যখন বান্দা মন্দ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, বাম কাঁধের ফেরেশতা তা লিখতে পারেন না। এমনকি বান্দা যখন পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তখনও তার পাপ লেখার অনুমতি থাকে না। তিনি ডান কাঁধের অফিসার ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন লিখতে পারি কি? তখন ডান কাঁধের ফেরেশতা বলেন, একটু থামো! ধৈর্য ধরো! হতে পারে লোকটি খাঁটি তাওবা করে নেবে; তখন তো আর পাপ লেখার প্রয়োজন হবে না। সুবহানাল্লাহ!

হাদীছের ভাষ্যও এমন যে, বান্দা যখন পাপে লিপ্ত হয়, তখন কাজ চলা পর্যন্ত নেকি লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তা লিখতে দেন না, বরং এই অপেক্ষায় থাকেন যে, হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে সে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসবে। কিন্তু এক বেলা পার হওয়ার পরও যখন সে পাপ পরিহার করে না, লজ্জিত হয়ে তাওবা করে না, তখন তার সেই পাপ রেজিস্টারভুক্ত হয়ে যায়।

যাহোক, মানুষের সকল আমল, চাই ভালো হোক কিংবা মন্দ, সব কিছু রেজিস্টারের মধ্যে সংরক্ষিত হচ্ছে। ছোট-বড় কোনো আমলই বাদ পড়ছে না। কেয়ামতের দিন যখন সে আমলনামা দেখতে পাবে, তখন খুব আফসোস করবে।

কুরআনে আছে–

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾

'যখন আমলনামা পেশ করা হবে, তখন অপরাধীরা নিজ-নিজ আমলনামা দেখে ভীতস্বন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমার! এ কেমন আমলনামা! ছোট-বড় কোনো আমলই তো এতে বাদ পড়েনি! নিজের সকল কৃতকর্মগুলো সামনে এসে যাবে। (হ্যাঁ) তোমার রব কারো ওপর জুলুম করবেন না।'[১]

আনন্দদায়ক আমলনামা

মানুষ যদি দুনিয়াতে নেকি অর্জন করে থাকে, তবে সে নেকিই দেখতে পাবে। তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বন্ধুদের ডেকে বলবে,

---

১. সূরা কাহফ : আয়াত ৪৯

هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝١٩ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١

'এসো! তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন আমাকে আমার আমলনামার মুখোমুখি হতে হবে। তাই আমি সর্বদা নেক আমল করার চেষ্টা করেছি। এখন সেই আমলনামা আমার হাতে দেখো। দেখো, এতে কত নেকি লিখে দেওয়া হয়েছে। এরপর সে চিরস্থায়ী সুখের জান্নাতে বসবাস করবে।'[১]

বেদনাদায়ক আমলনামা

আর যেব্যক্তি গাফলত ও উদাসীনতার জীবন যাপন করবে, পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকবে, তার পরিণতি কী হবে? আল্লাহ বলেন–

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝٢٥ وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝٢٩

'হায় আফসোস! যদি আমাকে এই আমলনামা দেওয়াই না হতো, আমার এই কর্মফল প্রকাশই করা না হতো! হায়! আমি তো বিশ্বাসই করিনি, 'আমারও একদিন হিসাব হবে! আমি তো দুনিয়ায় উদাসীনতার জীবন যাপন করেছি। আজ সারাজীবনের সমস্ত পাপাচারগুলো লিপিবদ্ধ হয়ে আমার চোখের সামনে ভাসছে, আমার দুনিয়ার বাদশাহী চলে গেল, ধনসম্পদ সব চলে গেল। কোনো কিছুই তো আমাকে রক্ষা করতে পারল না।'[২]

হায়! দুনিয়ায় আমি এমন জীবন যাপন করেছি, যেন আমার কখনও মৃত্যুই হবে না। মন যখন যা চেয়েছে তা-ই করেছি। মৃত্যুর ফেরেশতার কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছি। ফেরেশতারা ভালো-মন্দ সকল কথা-কাজ লিপিবদ্ধ করেছে। বিশাল রেজিস্টারে তা সংরক্ষিত হয়ে গেছে। তারপরও আল্লাহ তার পাপী বান্দার জন্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা খুলে রেখেছেন যেন সে অনুতপ্ত হয়ে আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং পাপের পথ পরিহার করে। যদি কেউ এমন তাওবা করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এমনকি তিনি চাইলে তার সারা জীবনের সকল পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ!

১, সূরা হাক্কা : আয়াত ১৯-২১

২. সূরা হাক্কা : আয়াত ২৫-২৯

একটি মূল্যবান হাদীছ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মূল্যবান হাদীছ আছে। খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে আমাদের জন্য রয়েছে মহামূল্যবান নসীহত। হাদীছটিতে ছোট্ট করে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

এক. যেব্যক্তি নিজ সম্পদ হতে আল্লাহর পথে সদকা করে, আল্লাহ তার সম্পদে বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন।

দুই. যেব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ক্ষমা করে দেয়, বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

তিন. যেব্যক্তি নিজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে নেবে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা ও সুখ্যাতি দান করবেন।

সদকা করার ফজিলত

নবীজি ইরশাদ করেন–

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

'যে স্বীয় সম্পদ হতে সদকা করে, তার সম্পদ কখনো হ্রাস পাবে না।'

সাধারণত দেখা যায়, যাদের কাছে সম্পদ আছে, তারা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অনেক অবহেলা করে। নফল দান-সদকা করে বটে; কিন্তু যাকাত আদায় করে না। অথচ শরীয়তের মাসআলা হলো, যার ওপর ফরজ বাকি থাকে, তার জন্য নফল আদায় করার অনুমতি নেই। প্রথমে ফরজ আদায় করবে, তারপর নফল। তো এসব লোকের উচিত যখনই আল্লাহর পথে ব্যয় করার কোনো প্রসঙ্গ আসে, তা যদি যাকাতের খাত হওয়ার যোগ্য হয়, তা হলে যাকাতের নিয়তে খরচ করবে।

আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন মালদার। কিছু আছেন মালের চৌকিদার (রক্ষক)। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মালদার হলো সে, যাকে আল্লাহ অনেক কিছু দান করেছেন এবং সে আখেরাতের জন্য খরচ করছে, নিজের আমলনামাকে সমৃদ্ধ করছে। এই ব্যক্তি সঠিক অর্থেই মালদার। আর মালের চৌকিদার হলো ওই ব্যক্তি, যার ব্যাংক-ব্যালেন্স অনেক। স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত গয়নাঘাটি বিপুল। এ থেকে কিছু খরচও করে না। আর গয়নাগুলো পরিধানও করে না। করে কী? করে চৌকিদারি! এসবের যাকাত আদায় না করে কাঁধে পাপের বোঝা তুলে নিচ্ছে। আর

দুদিন পর যখন মারা যাবে, তখন এসবের মালিক অন্য কেউ হয়ে যাবে। তো যেব্যক্তি সম্পদকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী খরচ করে না, সে প্রকৃত অর্থে মালদার নয়; বরং মালের পাহারাদার।

ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিয়ো না

ইসলাম মানুষকে সম্পদের ভালোবাসা থেকে মুক্ত থাকতে বলেছে। যার অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা বেশি থাকবে, তার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা অনেক কাজ হয়ে দাঁড়াবে। কোনো-কোনো বন্ধুকে দেখা যায় দান-সদকায় তেমন আগ্রহী নন। স্বেচ্ছায় কোনো দান-সদকা করেন না। কোনো অনুগ্রহপ্রার্থী বা ভিক্ষুক এসে কিছু চাইলে বলেন, আরে! এটা তাদের পেশা, এরা প্রকৃত ভিক্ষুক নয়। এ কথা তো ঠিক আছে যে, দানকারী সর্বদা দেখে-বুঝেই দান করবে; কিন্তু কোনো অনুগ্রহপ্রত্যাশীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

'অনুগ্রহ প্রার্থনাকারীকে (সাহায্যপ্রার্থী) ধমক দিয়ে প্রত্যাখ্যান করো না।'[১]

সদকা কাকে দেবেন?

আমাদের এই সেলসেলায়ে আলিয়ার এক বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা আব্দুল গফুর মাদানী (রহ.)। একবার বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে হারাম শরীফের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন। একব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, হযরত! এখানে আশেপাশে অনেক ভিক্ষুক আছে– কাকে দেব বুঝতে পারছি না। কারণ, কে হকদার আর কে হকদার নয় বোঝা মুশকিল। হযরত তাকে বললেন, আচ্ছা বলো তো! আল্লাহ তোমাকে কী পরিমাণ নেয়ামত দান করেছেন? তুমি কি এসবের হকদার ছিলে? সে বলল, না হযরত! আমার যোগ্যতা-ইবা কী! আল্লাহ আমার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি দান করেছেন। হযরত বললেন, যখন তুমি আল্লাহর নিকট যোগ্যতা যাচাই ছাড়া পেয়েছ, তাহলে তোমার কাছে কেউ এলে তুমিও তার যোগ্যতা যাচাই করো না। সাধ্যমতো দান করে যাও। যখন কেউ তোমার কাছে এসে কিছু চায়, তখন সাধ্যমতো দান করো এবং মনে-মনে ভাবো, হে আল্লাহ! আপনার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি,

---

১. সূরা যোহা : আয়াত ১০

আপনি আমাকে দাতা হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন; ভিক্ষুক বানাননি। কেউ যখন তোমার সম্মুখে অনুগ্রহ চেয়ে হাত মেলে ধরে, তখনকার মুহূর্তটি বড়ই শিক্ষাণীয় হয়ে থাকে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া নেয়ামতগুলোর প্রতি তাকাবে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহগুলো কল্পনা করবে যে, হায়! আজ আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক পেয়ে তুমি সম্মানিত; তোমার দরজায় অন্য কেউ কিছু প্রত্যাশা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ চাইলে তো এর বিপরীতটাও হতে পারত যে, এই ভিক্ষুককে তিনি অঢেল সম্পদ দান করতেন আর তোমাকে ভিক্ষুক বানিয়ে তার দরজার সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতেন। বলো, তখন কেমন লাগত?

এ-কারণেই বলছি, যখনই কোনো অনুগ্রহপ্রার্থী এসে কিছু চাইবে, সাধ্যমতো কিছু-না-কিছু দিয়ে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কম দিক কিংবা বেশি দিক সেটি ভিন্ন বিষয়। তবে দেবে অবশ্যই এবং সর্বদা নিজের সম্পদ হতে কিছু-না-কিছু দান-সদকা করতেই থাকবে।

সদকার আটা

একটা সময় এমনও ছিল যে, ঘরের মহিলারা যখন আটার খামির করত, তখন খামির করা এক মুষ্টি আটা তারা পৃথক করে রাখত। এটা ছিল সদকার আটা। যখনই কোনো ফকির আসত, তাকে তা দিয়ে দেওয়া হতো অথবা কোনো মাদরাসা বা এতিমখানায় তা পাঠিয়ে দেওয়া হত। এভাবে সে-যুগের নারীরা প্রতিদিন কিছু-না-কিছু দান সদকা করেই যেত। এখন সময়ের সাথে-সাথে সেই মুবারক অভ্যাসগুলো বিলুপ্ত হতে চলেছে। এখন আর এমন করে বলে কারো ব্যাপারে শোনা যায় না। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খেয়ে বলেন, যেব্যক্তি নিজের রিযিক হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তার রিযিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন।

'হাথ দাদে তা কম আনদা আয়ে'

আজকাল অধিকাংশ মহিলাকে দেখেছি, তারা এসেই বলে, পীর সাহেব! দু'আ করবেন। কারবারে বরকত নেই। কেউ বলবে, মালে বরকত নেই। কেউ বলবে, পরিবারের সবাই উপার্জন করি; কিন্তু তাতেও সংসারের খরচ পূরণ হয় না। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে অনেক উদাসীন। আর এ-কারণেই এত বরকতহীনতা। তারা যখন আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছে, তাই আল্লাহও তাদের

প্রয়োজন ও চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যতটুকু উপার্জন করে, প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়, ফলে আর দান করার তাওফীক হয় না। তাই মানুষের এটা দেখার প্রয়োজন নেই যে, আমার কাছে কম আছে, না বেশি? কম-বেশি যা-ই হোক কিছু-না-কিছু অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকা উচিত।

আমাদের পাঞ্জাবি ভাষায় প্রবাদ আছে, হাথ দাতে তা কম আনদা আয়ে।' অর্থাৎ– মানুষ নিজের হাত দ্বারা যা কিছুই সদকা করে, সে এর বরকত দুনিয়াতেও পেয়ে থাকে, আখেরাতেও পেয়ে থাকে। তাই নিজেদের সঙ্গে-সঙ্গে কোমলমতি শিশুদেরও দান-সদকা করা শেখাতে হবে, তাদের মধ্যে এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোনো ভিক্ষুক কিংবা অনুগ্রহপ্রার্থী সামনে এলে নিজে না দিয়ে শিশুদের হাতে দানের টাকা তুলে দিয়ে বলবে, যাও বেটা! অমুককে এই দানটুকু দিয়ে আসো। যাও বেটি! এটা ভিক্ষুককে দিয়ে এসো। এতে শিশুদের মধ্যে দান-সদকা করার মানসিকতা ও অভ্যাস গড়ে উঠবে।

দান-সদকা কখন কঠিন হয়ে যায়?

দান-সদকা করা তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে, যখন অন্তরে সম্পদের মোহ বাসা বাঁধে। তারপর তো মানুষ তার সম্পদের ওপর সাপ হয়ে পাহারা দিতে থাকে। অন্তরে যদি সম্পদের মোহ, টাকার মায়া না থাকে, তাহলে আল্লাহর পথে দান-সদকা করা কঠিন কিছু নয়।

মৃত্যুর ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায়

হাদীছে এসেছে, একব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মধ্যে সর্বদা মৃত্যুভয় কাজ করে। তিনি বললেন, তোমার নিকট কোনো সম্পদ আছে কি? সাহাবি বললেন, আছে। নবীজি বললেন, তা থেকে আল্লাহর পথে সদকা করো! সাহাবি আদেশ অনুযায়ী আমল করলেন। কিছুদিন পর পুনরায় সাক্ষাৎ হলে নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন, কী খবর তোমার? সাহাবি উত্তর দিলেন, এখন আর মৃত্যুভয়ে বুক কাঁপে না। এখন তো আমার মরতে ইচ্ছে করছে। নবীজি ইরশাদ করলেন, মানুষের ধনসম্পদ, কায়কারবার যেখানে থাকে, সেখানে তার অন্তরও লেগে থাকে। পূর্বে তোমার সম্পদ ছিল দুনিয়ায়, তাই দুনিয়ার প্রতি তোমার অন্তর ঝুঁকে ছিল। এখন তুমি তো আখেরাতে পাঠিয়ে দিয়েছ; তাই আখেরাতে যাওয়ার জন্য তোমার মন ছটফট করছে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আজকাল মানুষের মধ্যে অধিকাংশ ঝগড়া-ঝাটি এই সম্পদকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা মনে পড়ল। একব্যক্তি মারা গেল। তার সকল বিষয়-সম্পদ তার দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিপুল। বণ্টনকৃত জমির মধ্যে একটি গাছ ছিল, যা উভয় খণ্ডের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত ছিল। একজন বলল, এটি আমার গাছ। অপরজন বলল, না; এটি আমার গাছ। উভয়ের মাঝে দীর্ঘ বিরোধের সুত্রপাত হলো। মামলা-মকদ্দমা চলতে লাগল। উভয়ের পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ হলো। একটি গাছ নিয়ে বিরোধ সমাধানের জন্য অবশেষে তাদের সেই জমিগুলো বিক্রি করতে হলো। জমি বিক্রি হলো আর মকদ্দমা চলতে থাকল। পরিশেষে আদালত রায় দিল, গাছটি কেটে উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হোক।

দেখুন, দশ টাকার গাছের জন্য দশ লক্ষ টাকার জমি খোয়াতে হলো।

কখনো-কখনো সম্পদের ভালোবাসায় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। এখন তার কাছে কেবল টাকার আলোচনা-ই ভালো লাগে। এ-ব্যাপারে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যদি তার সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে এ-কারণে তার সম্পদ হ্রাস পাবে না। বাহ্যিকভাবে যদিও এমনই মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে সদকাকারীর সম্পদে আল্লাহ সীমাহীন বরকত দিয়ে রাখেন।

লাভজনক ব্যবসা

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে একব্যক্তি ছিল খুব গরিব। সে হযরত মূসা (আ.)- এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো তূর পর্বতে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। এবার গিয়ে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করবেন, তিনি যেন আমার সারা জীবনের সকল রিযিক একত্রে এখনই দিয়ে দেন। তাহলে অন্তত কয়েকটা দিন একটু আরাম-আয়েশে কাটাতে পারব। মূসা (আ.) তার জন্য দু'আ করলেন। তাকে তার সারা জীবনের রিযিক একসাথে দিয়ে দেওয়া হলো। এক বস্তা গম, কয়েকটা প্রাণী এবং এ-জাতীয় আরও কিছু পণ্যদ্রব্য।

এরপর মূসা (আ.) ব্যক্তিগত কাজে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। এক বছর পর তার মনে পড়ল, হায়! লোকটির কী হলো! তা তো আর জানতে পারলাম না। তিনি তার অবস্থা জানার জন্য গেলেন। দেখলেন, তার একটি বিশাল

বাড়ি আছে, অনেকগুলো বকরি। বিশাল দস্তরখান বিছিয়ে রেখেছে। মেহমানদের ব্যাপক আসা-যাওয়া, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নেই। নিজে খাচ্ছে, অন্যদেরও খাওয়াচ্ছে।

হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হলেন। তুর পর্বতে গিয়ে তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! এ কী অবাক কাণ্ড! উত্তরে আল্লাহ বললেন, হে আমার প্রিয় নবী! সে যদি শুধু নিজেই খেত, নিজের ওপরই খরচ করত, তাহলে তাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা-ই থাকত, বাড়তি কিছুই দেওয়া হতো না। কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। সে তার দস্তরখান প্রশস্ত করে মেহমান খাওয়াতে শুরু করেছে। আর আমার একটি শাশ্বত নিয়ম হলো, যে আমার পথে ব্যয় করে, আমি তাকে কমপক্ষে সাতশতগুণ বেশি ফিরিয়ে দেই। আজ এভাবেই তার রিযিকের মধ্যে বরকত হয়ে গেছে। এজন্য বলছি, দান-সদকা করতে গিয়ে কখনো দুর্ভাবনা বা মানসিক সংকীর্ণতায় ভুগবেন না। দানে সম্পদ বাড়ে; কখনো কমে না।

মেহমানকে আহার করানোর ছাওয়াব

আমাদের মাশায়েখগণ তো গৃহিণীদের বলে রাখতেন, ঘরে যখন তরকারি রান্না হবে, তখন পাতিলে পানি একটু বাড়িয়ে দিয়ো। হতে পারে, কোনো মেহমান কিংবা ভিক্ষুক এসে পড়বে। তখন যেন তাদের খেদমত করা যেতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশীকেও দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহর বান্দাদের খেদমতের নিয়তে অতিরিক্ত কয়েক ফোঁটা পানি তরকারিতে দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরকে পুরা মেহমানদারির ছাওয়াব দান করবেন। আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ এমনই দয়াবান ও করুণাময়।

আয়ুতে বরকত হওয়ার বিস্ময়কর গল্প

এক বুযুর্গের জীবনীতে লেখা আছে, তিনি একবার সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। মমতাময়ী মা তাকে নসীহত করলেন, বাবা! যখনই সফরে বের হবে, আল্লাহর পথে কিছু-না-কিছু অবশ্যই সদকা করবে। ইতিমধ্যে তিনি খেতে বসলেন। একজন ভিক্ষুক এসে কিছু খাবার চাইল। তিনি নিজের জন্য রাখা রুটিগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে সামান্য পথ যেতে-না-যেতেই হঠাৎ পায়ের কাছে কোনো কিছুর শব্দ শুনলেন। চমকে উঠে দেখলেন, বেখেয়ালে একটা বিষাক্ত সাপের গায়ে পা পড়ে গেছে। সাপটা ফোসফোস শব্দ করে তার দিকে তেড়ে আসছে। তিনি ভীষণ ভয়

পেয়ে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন। এরপর দেখতে পেলেন, সাপটা ফোসফোস শব্দ করছে ঠিকই; কিন্তু মুখের ভেতর কী যেন আটকে আছে, যার কারণে ছোবল মারতে পারছে না। সাপটাকে হত্যা করে দেখা গেল, তার মুখে একটা রুটির টুকরা ঠেসে আছে।

এই ঘটনা শুনার পর কোনো বুযুর্গ তাকে বললেন, এটা ছিল তোমার সদকা করা রুটির কারিশমা। তোমার মৃত্যু হয়ত আজই লেখা ছিল; কিন্তু সেই সদকাকৃত রুটির কারণে আল্লাহ তোমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমার হায়াতে আল্লাহ বরকত দান করেছেন। যে-সাপের মুখে তোমার মৃত্যু লেখা ছিল, সেই সাপের মুখে গিয়ে তোমার রুটিটা আটকে গেছে। এতে বোঝা গেল, মানুষ আল্লাহর পথে যে-সদকা করে, এর বিনিময়ে তার ওপর থেকে বালামসিবত দূর করে নেওয়া হয়।

এক টাকা দানেরও ছাওয়াব আছে

মা-বোনদের উদ্দেশ করে বলছি, আপনারা দান-সদকার ব্যাপারে তৎপর থাকবেন। আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত প্রতিটি পয়সার মূল্য আছে এবং এর বিনিময়ও পাওয়া যাবে। এক হতদরিদ্র ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যদি একটা টাকাও দান করে, তাহলে সেই দানও আল্লাহর দরবারে অনেক সমাদৃত। লক্ষ টাকা দানকারীর দান যেমন তিনি কবূল করেন, গরিবের একটি টাকাও তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন, তাদের নিয়ত ও ইখলাস দেখেন। আমলের পরিমাণ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং গুরুত্ব হলো মানের।

নিয়ত স্বচ্ছ হলে প্রতিদান নগদ

বনী ইসরাঈলে একব্যক্তি ছিল। সময়টা তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের। লোকেরা পেরেশান, হায়! কখন কী ঘটে যায়! এমনকি একপর্যায়ে ক্ষুধার্তরা মরতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে একবৃদ্ধ ঘরবাড়ি ছেড়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করবে। পথে হঠাৎ একটি বিশাল পাহাড়ের ওপর দৃষ্টি জমে গেল। পাহাড়টি দেখে সে মনে-মনে ভাবল, হায়! গোটা শহরের মানুষ আজ ক্ষুধায় আর্তনাদ করছে।' যদি এই পাহাড় সমপরিমাণ আটা আমার নিকট থাকত, তাহলে গোটা শহরবাসীর মধ্যে তা বণ্টন করে দিতাম। তাদের ক্ষুধার্ত চেহারাগুলোতে হাসি ফুটিয়ে তুলতাম। লোকটি যখনই এই নিয়ত করল, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ ফেরেশতাদের

ডেকে বললেন, এই ফেরেশতারা! দেখো! আমার এই বান্দা কত ইখলাসের সাথে এই নিয়ত করেছে। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ওই পাহাড়পরিমাণ আটা সদকা করার ছাওয়াব দান করলাম। এই নেকিগুলো তার আমলনামায় লিখে দাও। সুবহানাল্লাহ! নিয়তের স্বচ্ছতার কারণে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাকে নগদ প্রতিদান দান করলেন।

ক্ষমা করার ফজিলত

উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে দ্বিতীয় যে-বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল, তা হলো,

وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

'যে বান্দা অন্য বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়, বিনিময়ে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।'

ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ

সাধারণত দেখা যায়, কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে উভয় পক্ষেরই মন চায়, আমি ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেব, এক কথার বদলায় দুকথা শুনিয়ে দেব, একটা গালির পরিবর্তে দুটা গালি দেব। কিন্তু হাদীছে আছে, এ-ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ হলো, যে তার অপর ভাইকে ক্ষমা করল, আল্লাহ তার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

তো এই ক্ষমা করা একটি মহৎ গুণ, আল্লাহর অনেক বড় একটি নেয়ামত। আপনি লক্ষ করে দেখুন, মহিলাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া, ভাবী-ননদের ঝগড়া, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া, বোনে-বোনে কিংবা ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া। মোটকথা, সকল ঝগড়ার মূল কারণ হলো, পরস্পরে ক্রোধ ও শত্রুতা। একজন যদি অন্যায় করে ফেলে, তা হলে অপরজন তা ক্ষমা করতে নারাজ। অথচ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক অভ্যাস ছিল, তিনি অন্যের অপরাধগুলো খুব দ্রুত ক্ষমা করে দিতেন।

নবীজির ক্ষমার অনন্য উদাহরণ

হাদীছে এসেছে, একবার নবীজি একটা গাছের নিচে শুয়ে আরাম করছিলেন। গাছের সঙ্গেই তার তরবারিটি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ এক কাফের সেখানে উপস্থিত হলো। দেখল, চমৎকার সুযোগ! মুহাম্মদ শুয়ে

আছে আর তাঁর তরবারিটি গাছে ঝুলছে, তাঁকে হত্যা করার এটাই মোক্ষম সুযোগ।

কাফের লোকটি দ্রুত গিয়ে তরবারিটি হাতে তুলে নিল। এরপর নবীজিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খুব দম্ভভরে বলল,

مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ يَا مُحَمَّدُ

'হে মুহাম্মদ! আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?'

নবীজি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন–

اَللّٰهُ

'আল্লাহ।'

নবীজির উত্তরে এত শক্তি ছিল যে, লোকটি তা শুনে প্রভাবিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। চকচকে তরবারিটি তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। এবার সেই তরবারিটি নবীজি কুড়িয়ে নিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ

'এবার তুমি বলো! আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?

লোকটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাচুমাচু করে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো অনেক দয়াবান। উত্তম চরিত্রের অধিকারী। মানুষের বিপদে সাহায্যকারী, মহানুভব, ক্ষমাশীল। দয়া করে আমাকেও ক্ষমা করে দিন। নবীজি তার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এই মহানুভবতা ও উদারতা কাফের লোকটির অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করল যে, সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। বলল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিন, যেন আমার আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করে দেন। সুবহানাল্লাহ! তো আমাদের নবীজি তো জেনেবুঝে শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতেন।

অপূর্ব ক্ষমার আরেকটি উদাহরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাজয়ের দিন যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, মক্কাবাসীরা তখন চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে গিয়েছিল। সবার মনে একটাই আতঙ্ক, আজ মুসলমানরা বিজয়ী, মক্কা আজ

তাদের পদভারে প্রকম্পিত। এই মক্কাতেই মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল। হযরত বেলালকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে বুকে পাথর রাখা হয়েছিল। টেনেহ্যাঁচড়ে চাবুকাঘাত করে করা হয়েছিল রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। পুরনো ক্ষতগুলোতে পানি ঢেলে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। আবু তালিবের পাহাড়ি ঘাঁটিতে সকল মুসলমানকে তিন-তিনটি বছর খাদ্য, পানি ও জীবনোপকরণ থেকে বঞ্চিত করে সামাজিক বয়কট সৃষ্টি করে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। আজ তারাই বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করছে। জানি না, আমাদের সঙ্গে তাদের কী আচরণ হবে? আজ হয়ত তারা প্রতিশোধ নেবে– চরম প্রতিশোধ। গুণে-গুণে প্রতিটি চাবুকাঘাতের বদলা নেবে।

মক্কার কাফের নারীরা ছিল বড়ই আতঙ্কের মধ্যে, হায় আমাদের ইযযত-আবরুর কী হবে? আমাদের সন্তানদের জীবন কী রক্ষা পাবে? আমরা তো তাদের ওপর এত বেশি অত্যাচার করেছিলাম যে, তাদের আর্তনাদ আর বিলাপ শুনে আমরা আমোদিত হতাম। আজ তো তারা সেই জুলুমের প্রতিশোধ নেবেই নেবে। মোটকথা, মক্কার সেই রাতটি ছিল চরম ভীতিপ্রদ ও উৎকণ্ঠাময়।

মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার সামনে। মক্কায় প্রবেশের সময় তার মস্তক ছিল অবনত। বাহনের গর্দানের সঙ্গে তাঁর পবিত্র কপাল লেগে ছিল। মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়ার বাক্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ كُلَّهٗ

'সকল প্রশংসা সেই একক সত্তার, যিনি স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।'

এক বিস্ময়কর শান নিয়ে নবীজি মক্কায় প্রবেশ করলেন। চালচলনে বিনয়, চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। হে আল্লাহ! এ তো সেই কা'বা, যেখান থেকে লোকেরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ আপনি সেখানে কী শান নিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন! আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। এরপর তিনি ঘোষণা করে দিলেন, যারা মসজিদে অথবা নিজঘরে অবস্থান করবে, তারা নিরাপত্তা পাবে। যারা আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপত্তায় থাকবে। মক্কাবাসী নির্বাক হয়ে দেখল, মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে কোনোও প্রতিশোধ নিচ্ছে না। নবীজির পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

হয়ে গেল। তাদের তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না, যাদের ওপর এত নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছিল, তারা কোনো প্রতিশোধ নেওয়া ব্যতীতই তাদের ক্ষমা করে দিল! তাদের কেউ-কেউ সন্দেহের বশিভূত হয়ে মুসলমানদের মক্কার অলিগলিতে খুঁজে কোথাও না পেয়ে বলতে লাগল, এ কী! মুসলমানরা কোথায়? তারা আবার আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে না তো? কেউ একজন উত্তর দিল, না; তারা সবাই বাইতুল্লায় ও তার আশেপাশে অবস্থান করছে। তারপর ঘরের ছাদ থেকে তারা দেখল, মুসলমানদের কেউ 'হাজরে আছাওয়াদে' চুমু খাচ্ছে আর কাঁদছে। কেউ 'মাকামে ইবরাহীমে সেজদাবনত হয়ে কাঁদছে। কেউ তাওয়াফ করছে আর কাঁদছে। কেউ নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করছে আর অঝোরে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে।

এক হৃদয়কাড়া দৃশ্য ছিল সেটি। প্রত্যক্ষদর্শীরাও তাদের চোখে পানি ধরে রাখতে পারেনি। কেঁদেছে তারাও। তাদের এই অবস্থা কেনইবা হবে না? তারা তো দীর্ঘদিন এই কাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আজ প্রাণাধিক প্রিয় বাইতুল্লাহকে দেখে-দেখে, হাতে ছুঁয়ে চুমু খেয়ে, বুকে জড়িয়ে সেই বিচ্ছেদ-বেদনা লাঘব করার চেষ্টা করছে। পৃথিবী কোনোদিন এমন বিজয়ীকে দেখেনি, যে একটি রাষ্ট্র জয় করে এভাবে আল্লাহর নামে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে!

মক্কার নারীরা এই মনোরম দৃশ্য কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। একটু দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছে, মক্কা বিজয়ী এসব সৈনিকের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত ছিল সীমাহীন। তাদের চোখে-মুখে মুক্তার দানার মতো যে-অশ্রু ঝলমল করছে, তা বেদনার নয়; বরং কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অশ্রু। পরের দিন সকালে কাফেরদের নেতৃবৃন্দ নবীজির দরবারে এসে উপস্থিত হলো। তাদেরকে প্রশ্ন করা হলো, কী চাও তোমরা? তারা উত্তর দিল, আমরা আপনার কাছে তা-ই নিবেদন করব, যা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তার কাছে করেছিল

لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝

'অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে আমাদের ওপর ক্ষমতাবান বানিয়েছেন! নিশ্চয়ই আমরা আপনার ব্যাপারে অন্যায় করেছি। (আপনার ওপর অত্যাচার করেছি।)'[১]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯১

উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমরা যখন নিজেদের অপরাধগুলো স্বীকার করে নিয়েছ, তা হলে শোনো, আমিও তোমাদের ব্যাপারে তা-ই বলব, যা হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

'(যাও!) আজ আমিও তোমাদের সকল অন্যায় ক্ষমা করে দিলাম।'[১]

জগদ্বাসী এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করেছে। মক্কার নারীরা আঝোরে কাঁদতে লাগল। হায়! এ কী দেখছি আমরা! আমরা তো ভেবেছিলাম, আজ আমাদের হয়ত সর্বস্ব খোয়াতে হবে। অথচ তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আমাদের ওপর সর্বোচ্চ উদারতা প্রদর্শন করলেন। এমন সোনার মানুষগুলোকেই আমরা চরমভাবে লাঞ্ছিত করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের কান্না দেখে মনে হচ্ছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমা করতে পারছিল না।

তারপর দেখা গেল, পৌত্তলিক মক্কাবাসী দলে-দলে এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হতে লাগল। নবীজি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাদের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, দেখো! আমাকে ও আমার সাহাবিদেরকে দীনের ব্যাপারে যতটা কষ্ট দেওয়া হয়েছে, এতটা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। তথাপি আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

এই মহান উদারতার কারণে আল্লাহ লোকদেরকে ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন এবং মুসলমানদের করেছেন সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী।

হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

আমাদের সমাজে পরস্পর ঝগড়াঝাটির মূল কারণ হলো, আমরা কারো কথা সহ্য করতে পারি না, কারো সামান্যতম ত্রুটি সহ্য করতে পারি না। আমাদের উচিত, আল্লাহর জন্য আমরা অন্যের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দেব, যেন প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহও আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন। আমাদের বড়দের জীবনে এর চেয়েও বড় রকমের উদাহরণ বিদ্যমান আছে।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯২

উল্টে গেল হৃদয়তরী

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) নামে একজন বড় মাপের বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। একদা তিনি একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। পাশ দিয়ে একদল যুবক নদীর তীরে কোথাও পিকনিকে যাচ্ছিল। তারা একটি বড় নৌকা ভাড়া করল। নৌকায় আরোহণের সময় এক যুবক বলল, এই! ওই বুড়োটাকেও সঙ্গে নিয়ে নাও! মজা করা যাবে, সময়টাও ভালো কাটবে। অমনি এক যুবক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে টেনে নৌকায় তুলে নিল। হযরত চুপচাপ বসে রইলেন। তারা কিন্তু বসে রইল না। কেউ তার কান টানছে। কেউ মাথায় থাপ্পর মারছে এবং হাসি-ঠাট্টা করে ফুর্তি করছে।

এরা বারবার তাঁর মাথায় থাপ্পর মারছে আর তিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নীরবে সব সয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘ সময় এভাবে পার হয়ে গেল। আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে কেউ বেয়াদবি করলে আল্লাহ এতে প্রচণ্ড রাগান্বিত হন। তিনি ইলহামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীমকে বললেন, ইবরাহীম! এরা তোমাকে এভাবে অপমান করে যাচ্ছে আর তুমি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছ? তুমি যদি তাদের জন্য বদদু'আ কর, তা হলে এখনই আমি নৌকাটা উল্টে দিয়ে তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারব।

এই ইলহাম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) তাদের জন্য যে-দু'আটি করলেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি কিছু উল্টাতেই চান, তা হলে এই নৌকাটা না উল্টিয়ে এই যুবকদের হৃদয়গুলো উল্টে দিন, যেন এরা ভবিষ্যতে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাথে-সাথে তার দু'আ কবূল করা হলো এবং নৌকায় আরোহী প্রতিটি যুবককে তার ওলী হিসেবে কবূল করে নিলেন।

দেখুন, আল্লাহওয়ালাদের অন্তরের বিশালতা যে, তিনি কীভাবে তাদের ক্ষমা করে দিলেন। প্রতিদানে আল্লাহও কেমন বিস্ময়কর নেয়ামত দান করলেন। সারকথা হলো, মানুষ যখন কারো অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

বিনয়ের ফজিলত

এরপর তিনি ইরশাদ করেন–

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।'

তাওয়াজু তথা বিনয়ের অর্থ হলো, নিজেকে ছোট মনে করা এবং অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ-কাজটি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। সুতরাং যে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ যাকে মর্যাদা দান করেন, তার অগ্রগতি কেউ ঠেকাতে পারে না। দুনিয়ার সবাই মিলে চেষ্টা করলেও তার কোনোই ক্ষতি তারা করতে পারে না।

প্রকৃত মর্যাদা

সাধারণত দেখা যায়, মানুষ দুনিয়াতে ছোট-ছোট মর্যাদা খুঁজে বেড়ায়। মহিলারা মনে করে, সম্ভবত ওই কাপড়টা পরিধান করলে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, গয়না পরিধান করলে খুব সম্মান পাওয়া যাবে, উন্নত গাড়ি হলে, উন্নত বাড়ি হলে মর্যাদা বেড়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা এগুলোতে নেই। প্রকৃত মর্যাদা হলো পরহেযগারি ও ইবাদত-বন্দেগিতে। যে ইবাদত বন্দেগি করে নিজের রবের নিকট মর্যাদার অধিকারী হলো, সে দুনিয়ার সকল মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী ও মর্যাদাবান। এরপর তার উন্নতি ও অগ্রগতি ঠেকানোর সাধ্য আছে কার! এই দীন জিনিসটিই এমন, যার ওপর আমল করে মানুষ মর্যাদার শিখরে আরোহণ করে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ঘেটে দেখুন, আল্লাহর অলিদের জীবনী পড়ে দেখুন তারা কীভাবে দৃঢ়ভাবে দীনের ওপর আমল করে গেছেন। প্রতিদানস্বরূপ এমনও হয়েছে যে, সময়ের বাদশাহ পর্যন্ত তাদের দরবারে এসে ধরনা দিয়েছেন। তারা আল্লাহর অলিদের পায়ের কাছে দুনিয়ার ধনসম্পদের স্তূপ লাগিয়ে দিত; কিন্তু তারা চোখ তুলেও সেদিকে তাকাতেন না। আল্লাহ তাদেরকে এমন শান দান করেছেন।

আমরাও যদি হাদীছে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের ওপর আমল করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের জীবনও তাকওয়া ও নেক আমলের ওপর অতিবাহিত হবে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছের প্রতিটি উপদেশ আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ আমাদেরও মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন।

দীনের ওপর আমল কীভাবে হবে?

এখন দীনের ওপর আমল কীভাবে হবে? তো তার জন্য প্রথমে সঠিক দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। দীনদার হওয়ার প্রথম কদম হলো দীনি ইল্‌ম অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা হলো দ্বিতীয় কদম। এ-কারণেই মাঝেমধ্যে সন্তানদেরকে কুরআনের তাফসীর পড়ে, হাদীছের বাণী পাঠ করে শোনাতে হয় যেন নতুন প্রজন্ম কুরআন-হাদীছ ও আল্লাহ-রাসূল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে। এ-লক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোর্স চালু আছে; সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জীবনের মূল্যায়ন করো!

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

'আর যেব্যক্তি তার রবের সম্মুখে (হিসাব নিয়ে) দাঁড়ানোকে ভয় পায় এবং নিজেকে খাহেশাতের গোলামি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই বান্দাকে তিনি 'জান্নাতুল মাওয়া'য় প্রবেশ করাবেন।'[১]

দুনিয়াতে যদি বান্দা নেকির বীজ বপন করে, তাহলে আখেরাতেও নেকির ফসল মিলবে আর যদি পাপের কাঁটা পাঠায়, তাহলে আখেরাতেও কাঁটাই তার ভাগ্যে জুটবে। খুবই সহজ একটা উদাহরণ নিন। আমগাছে কোনোদিন নারিকেল ধরবে না। এমনিভাবে নারিকেল গাছেও কোনোদিন আম ধরবে না। যেমন বীজ হবে, তেমনই ফসল হবে। আজ জীবনের মুহূর্তগুলোকে মূল্যায়ন করুন। এ-সময়গুলোতে নেক আমলের বীজ বপন করুন। বেশি-বেশি নেকি অর্জনে মনোযোগী হোন এবং নেকি দ্বারা আমলনামাকে সমৃদ্ধ করুন। তাওবা-এস্‌তেগফারের দ্বারা স্বীয় রবকে রাজি করিয়ে গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিন।

তাওবার দরজা কখন বন্ধ হয়?

আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাওবার দরজা সর্বদা খোলা রাখেন। দুটি অবস্থা এমন আছে, যখন তাওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।

---

১. সূরা নাযি'আত : আয়াত ৪০,৪১

এক. মানুষ যখন তার অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দুই. কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে, তখন আল্লাহ তাওবার দরজা বন্ধ করে দেবেন। এর আগে-আগে যদি কোনো বান্দা তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

দয়াময় প্রভুর পছন্দ

হাদীছের ভান্ডারে এ-প্রসঙ্গে এত ঘটনা বর্ণিত আছে যে, লোকেরা সেগুলো পড়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। আল্লাহ মূলত চান যে, আমার বান্দারা নিজের পাপ থেকে ফিরে এসে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক; আমি তাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ বড়ই দয়ালু, বড়ই করুণাময়। একজন মায়ের অন্তরে সন্তানের জন্যে যে-পরিমাণ স্নেহ-মমতা থাকে, এমন সত্তরজন মায়ের মমতাকে একত্র করলে যা হবে, আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাঁর একজন নগণ্য বান্দাকে এর চেয়ে অনেক বেশি মায়া করেন।

পাপ মোচনের সময়

আপনি মায়ের উদাহরণ লক্ষ করুন। এক মা; তার সন্তান তার সাথে কোনো অন্যায় করে ফেলল। এবার সন্তান তার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ক্ষমা চায়, তখন মা তাকে ক্ষমা না করে থাকতে পারেন না। মা ব্যথিত, মর্মাহত এবং সন্তানের প্রতি খুবই রাগান্বিত। কিন্তু সন্তান যেইমাত্র সামনে গিয়ে পা ধরে ক্ষমা চায়, মা তাকে ক্ষমা করে দেন। যদি মাকে সন্তান আরও বেশি কষ্ট দিয়ে থাকে আর মা-ও প্রতিজ্ঞা করে থাকে, আমি কোনোদিন তাকে ক্ষমা করব না, এরপর সেই সন্তান অনুতপ্ত হয়ে মায়ের সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, ক্ষমা চায় আর মা বলেন, না; আমি তোকে ক্ষমা করব না। সন্ত ান পা জড়িয়ে ধরে। মা পা সরিয়ে নেন। যখন সন্তান কেঁদে ফেলে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরায়, মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। তার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গলে পড়ে, মা তার সন্তানের চোখের পানি সহ্য করতে পারে না। মা যতই কঠিন হৃদয়ের হোক-না কেন, সন্তানের চোখের পানি সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মায়ের স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা এমনি এক জিনিস, মুহূর্তের মধ্যে সকল দুঃখ-রেদনা ভুলে গিয়ে সন্তানকে বুকে টেনে নেন। সস্নেহে আঁচল দিয়ে তার চোখের পানি মুছতে থাকেন আর বলতে থাকেন, বাবা আমার! কাঁদিস না। আমি তোর চোখের পানি সহ্য করতে পারি না। যা; আমি তোকে ক্ষমা করে দিলাম।

তো বন্ধুরা! মায়ের মধ্যে এত মমতা, এত স্নেহ। এমন সত্তরজন মায়ের স্নেহ-মমতা একত্রিত করলে যা হবে, আমার আল্লাহ তার বান্দার প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশি স্নেহ-মমতা রাখেন। অতএব কোনো বান্দা যখন আল্লাহর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। বান্দা যখন তার ছোট-বড় সকল অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এমন পাপের পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করে দিন। তখন তার চোখের পানিগুলো গণ্ড বেয়ে নিচে পড়ার পূর্বে আমলনামার সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

বন্ধুরা! এখনও সময় আছে। অনুতাপের অশ্রু দিয়ে জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নিন। এমন যেন না হয় যে, আপনার এই পাহাড়পরিমাণ গুনাহের কারণে কেয়ামতের কঠিন দিবসে চরম বিপর্যয়ের শিকার হন। আল ইয়াযুবিল্লাহ।

আমার করুণাময় রব তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন, 'বান্দা যদি ক্ষমা চায়, তাওবা করে, তা হলে আমি ক্ষমা করে দেব। আমার ইচ্ছে হলে তার সকল পাপকে পুণ্যে এবং গুনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেব। সুতরাং আজকের এই মজলিসে নিজের অতীতের গুনাহগুলো স্মরণ করে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিন। আল্লাহও চান, যেন তার বান্দারা ক্ষমা চায়। তিনি ইরশাদ করেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, ও আমার বান্দারা! যারা গুনাহের দ্বারা নিজের স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, তিনি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।'[১]

হে প্রতিপালক! আপনার দয়ার ওপর আমাদের জীবন উৎসর্গ হোক। আপনি আপনার হাবীবকে আদেশ দিচ্ছেন ঘোষণা দেওয়ার জন্য, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। তোমরা যদি ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেব।

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৫৩

আমাদের উচিৎ, স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চেয়ে সকল পাপের বোঝা হতে মুক্তি নেওয়া, যেন তিনি আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং সকল গুনাহ থেকে মুক্ত করে জান্নাতের পথ সুগম করে দেন এবং ঈমানি, কুরআনি ও ইসলামি জীবন যাপনের তাওফীক নসিব করেন। দুনিয়াতে যেমন তিনি উত্তম রিযিক, মর্যাদা ও সুস্থতা দান করেছেন, আখেরাতেও যেন সর্বাঙ্গিন কামিয়াবি দান করেন। আজ আমাদের এই মাহফিলে যে দু'আ করা হবে, তা যেন তিনি কবূল করে নেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সামাজিক জীবনরে সোনালি রীতি

'দীন সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে অন্তরগুলোকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, যেব্যক্তিই দীনের ওপর আমল করে, তার প্রতি অন্যান্য দীনদারদের অন্তরে এক ধরনের সহজাত সম্প্রীতি বোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি কোথাও ত্রুটি নজরে পড়ে, তাহলে বুঝে নিন; নিশ্চয়ই আমলে কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি আছে, যার প্রভাব অন্তরের ভালোবাসার ওপর পড়েছে। যদি দীনের ওপর সঠিকভাবে আমল হত, তাহলে অন্তরগুলোতে মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকত। আর এ-কারণেই বলা হয়, ইসলাম হলো ভালোবাসা সৃষ্টিকারী একটি ধর্ম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।'

সামাজিক জীবনরে সোনালি রীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝

وَقَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

হৃদয়ের বন্ধন যেভাবে সৃষ্টি হয়

আল্লাহ রব্বুল ইযযত পৃথিবীতে দুটি বস্তুর মাঝে বন্ধন সৃষ্টির জন্য কোনো-না-কোনো তৃতীয় বস্তু অবশ্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন– দুটি ইটের মাঝে বন্ধন তৈরি করার জন্য তিনি সিমেন্ট তৈরি করেছেন। সিমেন্ট দিয়ে দুটি ইটকে যখন গেঁথে দেওয়া হবে, তখন তা একটি ইটে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি কাগজের দুটি টুকরোকে জোড়া দিতে চান, তা তাহলে সেই কাজ সিমেন্ট দিয়ে হবে না। বরং গাম বা আঁঠার প্রয়োজন পড়বে। গাম ব্যবহার করবেন তো দুটি কাগজকে একটি বানানো সম্ভব হবে। এমনিভাবে যদি দু-টুকরো কাপড়কে জোড়া দিতে চান, তখন সেখানে গাম বা আঁঠা দিয়ে কাজ হবে না; বরং সেই কাজের জন্য আল্লাহ রব্বুল ইযযত সুঁই-সুতা সৃষ্টি করেছেন। সুঁই-সুতা ব্যবহার করে দুটি কাপড়খণ্ডকে একটি খণ্ডে পরিণত করা সম্ভব। আপনি যদি দুটি কাঠের টুকরোকে জোড়া দিতে চান, তবে সুঁই-সুতা, আঁঠা কিংবা সিমেন্ট দিয়ে তা করতে পারবেন না। কাঠের টুকরো জোড়া দেওয়ার জন্য জলি বা পেরেক ঠুকতে হবে। যদি লোহার দুটি

টুকরোকে জোড়া দিতে চান, তখন সিমেন্ট কিংবা পেরেক দিয়ে তা হবে না; এর জন্য আল্লাহ আগুন দিয়ে ঝালাই করার নিয়ম সৃষ্টি করেছেন। ঝালাই করে লোহার দুটি টুকরোকে আপনি একটি টুকরোয় পরিণত করতে পারবেন। এখন মনে একটি প্রশ্ন জাগে, যদি মানুষের অন্তরগুলোতে বন্ধন সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে এর জন্য সংযোগ সৃষ্টিকারী উপাদানটি কী, যা অন্তরগুলোকে পরস্পর মিলিয়ে দেবে, একই বন্ধনে আবদ্ধ করবে, এতে মহব্বত ঢেলে দেবে? সেই উপাদানটির নাম হলো 'ইসলাম'। আল্লাহ এই দীনকে অবতীর্ণ করেছেন এজন্য যে, যারা এই দীনের ওপর আমল করবে, তিনি তাদের অন্তরগুলোতে পরস্পরের জন্য ভালোবাসা ও সৌহার্দ ঢেলে দেবেন। পবিত্র কুরআনে এ-প্রসঙ্গেই আল্লাহ ইরশাদ করছেন, হে আমার প্রিয় রাসূল!

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

'আপনি যদি যমিনের সমস্ত ধনভান্ডারও তাদের পেছনে খরচ করে দিতেন, তবুও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতেন না। একমাত্র আল্লাহই তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন।'[১]

তো দীন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে অন্তরগুলোকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, যেব্যক্তিই দীনের ওপর আমল করে, তার প্রতি অন্যান্য দীনদারদের অন্তরে এক ধরনের সহজাত সম্প্রীতি বোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি কোথাও ত্রুটি নজরে পড়ে, তাহলে বুঝে নিন; নিশ্চয়ই আমলে কোথাও-না-কোথাও ত্রুটি আছে, যার প্রভাব অন্তরের ভালোবাসার ওপর পড়েছে। যদি দীনের ওপর সঠিকভাবে আমল হত, তাহলে অন্তরগুলোতে মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকত। আর এ-কারণেই বলা হয়, ইসলাম হলো ভালোবাসা সৃষ্টিকারী একটি ধর্ম।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।'[২]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬৩

২. সূরা মারয়াম : আয়াত ৯২

নিজের মধ্যে কল্যাণকামিতা সৃষ্টির আদেশ

আল্লাহ ফেরেশতাদের নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জিনদের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। এখন যারা ফেরেশতা, তারা তো আপাদমস্তক কল্যাণের আধার। যারা শয়তান, তারাও আপাদমস্তক ক্ষতি ও অনিষ্টের উৎস। আর যারা ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের সমষ্টি, তারা-ই হলো মানুষ। প্রতিটি মানুষের মাঝে ভালোও আছে, মন্দও আছে; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হলো–

'হে আমার বান্দারা! তোমরা নিজেদের ওপর কল্যাণকে গালেব করে নাও; নিজেকে কল্যাণের আধার বানিয়ে নাও এবং নিজের ক্ষতি হতে অন্যদের বাঁচাও। এ-কারণেই মানুষ যেমন পরিবেশ পায়, তেমন হয়ে যায়। দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষটিও যদি মন্দ পরিবেশে যায়, তখন তারও পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে মন্দ লোকটি যদি নেকির পরিবেশ পায়, তখন তারও জীবন আলোকিত হয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট মানব সে, যার মধ্যে কল্যাণের পরিমাণ বেশি। এজন্যই শরীয়ত একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলিম শরীফে এক বর্ণনায় আছে, নবীজি ইরশাদ করেছেন–

تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ

'তোমরা নিজের অনিষ্ট থেকে অন্যদের বাঁচাও।'

প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুসলমানের' যে-পরিচয় বর্ণনা করেছেন, তা হলো–

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'[১]

না মুখ দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়, না হাত দিয়ে। অর্থাৎ– কথা কাজ কোনোটা দ্বারাই অপর মুসলমানকে কষ্ট দেয় না। যদি আমাদের মধ্যে এই

---

১. মুসলিম

উত্তম গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমরা মুসলমান। অন্যথায় আমরা মুসলমানের সংজ্ঞায়েই তো আসি না।

মুখকে হাতের পূর্বে উল্লেখ করার হেকমত

হাদীছে প্রথমে মুখের আলোচনা এসেছে, তারপর হাতের আলোচনা এসেছে যে, মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত হতে অন্যরা নিরাপদ থাকে। এর মৌলিক কারণ হলো, হাতে কষ্ট দেওয়ার জায়গাসমূহ হতে মুখে কষ্ট দেওয়ার জায়গা অনেক বেশি। একটা শব্দই মাত্র বলল; কিন্তু শব্দ তো নয়; যেন আগুনের গোলা; অন্তর ঝাঁজরা করে ফেলল; অঙ্গে-অঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিল।

হাতে কষ্ট দেওয়ার জন্য তো শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক; কিন্তু মুখে কষ্ট দেওয়ার কাজটা তো দুর্বলও করতে পারে। কোনো গালি বকে দিল কিংবা এমন কথা বলল, যার দ্বারা শ্রোতার হৃদয় খানখান হয়ে গেল; বেদনায় বুকটা নীল হয়ে গেল।

তাছাড়া হাত দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কাজ সব সময় করা যায় না; কিন্তু মুখ দিয়ে যখন তখন কষ্ট দেওয়া যায়। এমনকি এর জন্য নিকটেও থাকতে হয় না। হাত দিয়ে মারতে হলে প্রহৃত লোকটিকে কাছে থাকতে হবে; তবেই সে ব্যথা পাবে; কিন্তু মুখ দিয়ে আঘাত করার জন্য তাকে কাছেও থাকতে হয় না। কোনো অনুষ্ঠানে কিংবা ফোনে কোনো মন্দ কথা বলল, অপরজন শুনে মর্মাহত হলো, ব্যথিত হয়ে বলল, দেখো, সে আমার ব্যাপারে কী ধরনের মন্তব্য করছে? সুতরাং হাত দিয়ে করা আঘাত কখনো-না-কখনো সেরে যায়; ভালো হয়ে যায়; কিন্তু মুখ দিয়ে করা আঘাত কখনো ভালো হয় না।

আরবিতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে–

'হাত দিয়ে করা জখম যদিও শুকিয়ে যায়; কিন্তু মুখ দিয়ে করা জখম কখনো শুকায় না; বরং সর্বদা তাজা থাকে। এ-কারণেই নবীজি মুখের আলোচনা আগে করেছেন, হাতের আলোচনা পরে করে বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

অর্থাৎ– তাদের জীবনও নিরাপদ থাকবে, সম্পদও নিরাপদ থাকবে, মানসম্মান সব কিছু নিরাপদ থাকবে। এমন ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে মুসলমান নামে ডাকার উপযুক্ত। মুসলমানের সংজ্ঞা পুরোপুরি এই ব্যক্তির ওপরই প্রতিস্থাপিত হয়।

মানুষ কী কারণে জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে উপলব্ধি করা যাবে যে, এ-ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। কত ঘটনা এমন ঘটছে যে, আমরা নিজের ভাইকে কষ্ট দিচ্ছি, তার কষ্টের কারণ হচ্ছি, আল্লাহর বান্দাদের জন্য বিপদের কারণ বনে যাচ্ছি। এ-কারণেই বলা হয়েছে, এমন মানুষ জন্তুর মতো; বরং জন্তুর চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। এর কারণ কী? ওলামায়ে কেরাম এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, জন্তু তিন ধরনের হয়–

এক. গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। এরা নিজের প্রয়োজনেও অন্যকে কষ্ট দেয় না। মহিষের যদি পিপাসা লাগে, তাহলে নিকটে দণ্ডায়মান মহিষকে সে কখনোই আঘাত করে না; বরং পিপাসা লাগলেও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, ক্ষুধা লাগলেও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো ধরনের হাঙ্গামা করে না। এটা জন্তুদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার।

দুই. দ্বিতীয় প্রকারের জন্তু যেমন– বাঘ, সিংহ, চিতা প্রভৃতি। তারা যদি নিজেদের প্রয়োজন হয়, তখন অন্যদের কষ্ট দেয়। বাঘ ক্ষুধার্ত হলে অন্য জন্তুর আর রক্ষা থাকে না, তাদের ছিঁড়ে-ফেঁড়ে আহার করে নিজের ক্ষুধা মেটায়। কিন্তু যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহলে অন্য প্রাণীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

একটি ঘটনা শুনুন। একবার আমরা জঙ্গলভ্রমণের সময় দেখলাম, একটা হরিণ মাত্র ৬/৭ মিটার দূরত্বে একটা বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হরিণকে দাঁড়ানো দেখে তো আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলাম, এ কী? আমার চোখ তো অন্য কোনো দৃশ্যের অবতারণা চাচ্ছিল। আমি গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, আরে ভাই! এ কেমন আশ্চর্য বিষয়! জাগ্রত বাঘের এত নিকটে একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে; অথচ সে হরিণকে কিছুই করছে না!

গাইড আমাকে বলল, বাঘটা কিছুক্ষণ পূর্বে একটা শিকার আহার করেছে। তার পেট এখন ভরা। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষুধা না লাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কিছুই বলবে না। এ-কারণেই বাঘের যখন পেট ভরা থাকে, তখন তার নাকের সামনে যদি ইঁদুরও লাফালাফি করে, তখন সে ইঁদুরকেও কিছু বলবে না। এ হলো জন্তুর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার।

তিন. তৃতীয় প্রকারের জন্তু হলো সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি। এদের কাজ হলো অন্যকে কষ্ট দেওয়া এবং এরা এসব কাজ করে নিজেদেরও কোনো উপকার করতে পারে না। যেমন– বিচ্ছু! এটি যখন অন্যকে দংশন করে, তখন কি

তার ক্ষুধা মিটে যায়, না পিপাসা নিবারিত হয়? কোনোটাই নয়। মূলত এটা তার অভ্যাস। দংশন করাই তার স্বভাব। আপনারা দেখবেন, কাঠের গুড়িতে সে বসে থাকলে কাঠকেই দংশন করছে। দেওয়ালের নিকট থাকলে দেওয়ালকে দংশন করছে। যে-কেউ তার নিকটে থাকুক, তাকেই সে দংশন করছে। কেউ একজন বিচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের নেতা কে? সে উত্তর দিয়েছিল, জনাব! যার লেজে আপনি হাত রাখবেন সেই আপনাকে উত্তর দিয়ে দেবে।

তো মানুষের মধ্যে যখন চারিত্রিক অধঃপতন এসে যায়, তখন সে এ ধরনের জানোয়ারে পরিণত হয়ে যায়। অন্যদের তো কষ্ট দিল; তার ওপর আবার আনন্দও প্রকাশ করল। যেমন– মহিলারা এমন উক্তি করে যে, আমিও এমন কথা শুনিয়ে দিয়েছি; ঘরে গিয়ে হয়ত জ্বলেপুড়ে মরছে। দেখুন, মহিলা তার কথায় আনন্দিত যে, আমি তাকে এমন কথা শোনাতে পেরেছি যে, সে ঘরে গিয়ে সেকথা স্মরণ করে জ্বলেপুড়ে মরবে। তো আমরা অন্যকে কষ্টে দেখেও আনন্দিত হতে পারি, উল্লাস করতে পারি। এ-কারণেই এ-জাতীয় লোকদের জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। মনে রাখবেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজের ক্ষতি হতে অন্যদের বাঁচাবে।

নিজের জীবনের সদকা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

'অন্যকে নিজের অনিষ্ট থেকে বাঁচানো এটা তোমার পক্ষ হতে তোমার জীবনের প্রতি সদকাস্বরূপ।'

যেব্যক্তি নিজের অনিষ্ট থেকে অন্যকে রক্ষা করবে, এই নেক কাজটি তার পক্ষ হতে তার জীবনের প্রতি এক ধরনের সদকার মতো। দেখুন, কেউ যদি কাউকে কষ্টদায়ক কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় এবং না বলে, তা হলে এর বিনিময় সে অবশ্যই পাবে। সে যে নিজেকে হোল্ড করল, এটা প্রমাণ করে যে, সে মুজাহাদা করেছে। অথচ সে এমন কী করেছে? উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু? না। এটিই হলো ইসলামের সৌন্দর্য। সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকার ও উদার ইসলাম যে, কাউকে কষ্ট না দেয়া কত সহজ কাজ! না সময় ব্যয় হচ্ছে, না সম্পদ খরচ হচ্ছে, না কোনো পরিশ্রমের দরকার পড়ছে। ব্যস, শুধু

এতটুকু কাজ। কাউকে কষ্ট না দেওয়ার বিনিময়ে আমলনামায় ছাওয়াব যোগ হচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِي

'এটি তোমাদের জীবনের পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ।'

এখন শরীয়ত তো স্পষ্ট বাক্যে এ-ঘোষণা দিয়েই দিয়েছে। এবার আমাদের উচিৎ, আমরা এমন সতর্কভাবে জীবন যাপন করব, যেন আমার দ্বারা কারো মন ব্যথিত না হয়, আমার কথা-কাজে কেউ কষ্ট না পায়। সর্বদা অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখতে হবে যে, মুসলমানের যে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলমানের সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমাদের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ও উঁচু-উঁচু বিষয়াদি চিন্তা না করে জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া উচিত। আর এটি এমন একটি কাজ, যা প্রত্যেক বান্দার জন্যই আবশ্যক। কারণ, আমরা যখন এক সাথে বসবাস করি, তখন আমাদের চলাফেরা, উঠাবসার কিছু প্রভাব আমাদের প্রতিবেশীদের ওপর পড়ে। যদি আমরা উন্নত চরিত্রের সাথে জীবন যাপন করি, তাহলে প্রতিবেশীর ওপরও এর প্রভাব পড়বে। আমরা যদি সুইট (মিষ্টভাষী) হয়ে বসবাস করি, তাহলে প্রতিবেশীরাও আমাদের সাথে কথাবার্তা ও চলাফেরায় স্বস্তি বোধ করবে। সুতরাং আমরা তাদের জন্য আস্থা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যাব– তাদের জীবনের জন্য বিপজ্জনক ও যন্ত্রণাদায়ক হব না। ক্ষতি করার যোগ্যতা তো সকল বান্দার মধ্যেই আছে; কিন্তু আমরা শুধু ক্ষতি করার সেই প্রবণতাকে আটকে রাখব। সামান্য কথায় গোস্বা এসে যায়, আমরা তা দমিয়ে রাখব, চরিতার্থ করব না। এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। কিছু বলতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু জানি, কথাটি শুনে তার মন ব্যথিত হবে, তাহলে কথাটি বলব না। এগুলো খুব ছোট-ছোট বিষয়; কিন্তু আল্লাহ এর বিনিময়ে ছাওয়াব লিখে দেন। এবার আসুন, এর কিছু উদাহরণ দেখি।

সন্তানদের আচরণ

আমরা একই পরিবারে বসবাস করি। সন্তান বাবা-মাকে কষ্ট দেয়। তাদের মনে ব্যথা দেয়। এবার ভাবুন তো, একটা সন্তানের জন্য বাবা-মা কত ত্যাগ স্বীকার করে! তাদের জন্যই উপার্জন করে আনে। প্রথমে তাদের

খাওয়ান; পরে নিজেরা খান, প্রথমে তাদেরকে পান করান। পরে নিজেরা পান করেন। প্রথমে তাদেরকে ঘুম পাড়ান। পরে নিজেরা ঘুমাতে যান। অথচ সন্তানের আচরণ কেমন! বাবাকে এতটাই ঘৃণা করে, যতটা পাপকে ঘৃণা করে। কারণ কী? কারণ হলো, আব্বু পড়তে বলেন, স্বাধীনভাবে চলতে দেন না। বলুন, আব্বুর এমনটা করা কী অন্যায়? আব্বু আপনাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে দেখতে চান। যখনই তুমি কোনো ভুল করে ফেল; আব্বু তোমাকে সতর্ক করেন; তোমাকে গাইড করেন। এবার বলো! তোমার পিতার চেয়ে বেশি হীতাকাঙ্ক্ষী তোমার কে হতে পারে? আজকের তরুণ-যুবকরা এ বিষয়টি বোঝে না। তারা বলে, আম্মু আমাদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেন না। আরে ভাই! আম্মুর তো এটাই দায়িত্ব। তোমার যে বয়স, এ বয়সে বেশি সময় ঘরের বাইরে থাকা, বন্ধুদের সঙ্গে তেমন উঠাবসা করা তোমার জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলেও দিতে পারে। কিন্তু বাবা-মায়ের এই তারবিয়ত ও হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়েই সন্তানদের যত অভিযোগ। এমন করা তাদের ভালো লাগে না। এ-বয়সে তাদের কাছে পড়ালেখা ছাড়া আর সবকিছু ভালো লাগে।

ফলাফল এই যে, তাদের জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়। খুব সামান্য কোনো বিষয়। মা কোনো কাজের কথা বললেন। সে এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিল। বাবার কথা, বড় ভাইয়ের কথা উপেক্ষা করল। সন্তানরা বাবা-মাকে কষ্ট দেয় অথচ এই মা-বাবা তাদেরকে কত স্নেহ-মমতা দিয়ে লালনপালন করেন। কখনো অভিভাবকরা এসে বলেন, হযরত! দু'আ করবেন, আমার সন্তানটা যেন বেঁচে থাকে! আল্লাহ যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তো সন্তানদের এ-বিষয়টি বোঝাতে হয় যে, বাবা-মা তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তোমাদের ওপর তাদের হক রয়েছে। শরীয়ত তো বলে দিয়েছে, তোমাদের জান্নাত তোমাদের মাতা-পিতার পদতলে। শরীয়ত তো কৃতজ্ঞতায় এতটুকু পর্যন্ত বলে দিয়েছে যে, যেব্যক্তি তার মাতা-পিতার চেহারার দিকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে, আল্লাহ তাকে সেই একবার তাকানোর বিনিময়ে একটি মাকবূল হজ ও ওমরার ছাওয়াব দান করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ বারবার তাকায়? তিনি উত্তর দিলেন, যতবার সে তাকাবে, আল্লাহ চাইলে প্রতিবারই তাকে ছাওয়াব দান করা হবে।

যাদের চেহারা দেখাকে আল্লাহ ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন, আজকের যুবকরা তাদের অন্তরে আঘাত দিচ্ছে। পড়তে বললে বলে, আমি অনেক পড়েছি। পরীক্ষার ফলাফলের অবস্থা এমন যে, এই বিষয়েও ফেল, ওই বিষয়েও ফেল! বলুন, এসব দেখে মা-বাবার অন্তরের কী দশা হয়! এ কেবল তারা-ই জানেন। যে সন্তানের জন্য দিনে দু'আ করল, রাতের গভীরে প্রার্থনা করে চোখের পানিতে বুক ভাসাল, সেই সন্তান যখন নষ্ট হতে দেখে, তখন তাদের মনের অবস্থা কেমন হয়! কষ্টের বোঝা এত ভারী হয় যে, কারো কাছে ব্যক্তও করতে পারে না, সইতেও পারে না।

মায়ের মমতা : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

প্রচলিত ভুল ২/১৯৪

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক যুবক সাহাবি ছিলেন। নাম আলকামা। তিনি মায়ের সঙ্গে এমন কোনো কথা বলে ফেলেন, যার দ্বারা মায়ের মনে ব্যথা লাগে। আল্লাহর শান দেখুন, হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং অবস্থা এতই মুমূর্ষ হলো যে, মৃত্যুর আলামত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল; কিন্তু প্রাণ বের হচ্ছিল না। খুবই কষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে নবীজিকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি হযরত বেলাল ও অন্যান্য সাহাবাদেরসহ তাশরীফ আনলেন। অবস্থা পরিদর্শন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার মা কি জীবিত আছে? সবাই উত্তর দিল, হ্যাঁ আছে। তিনি তার মাকে ডেকে পাঠালেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি ছেলে আলকামার প্রতি অসন্তুষ্ট। নবীজি মাকে বললেন, আপনি আলকামাকে ক্ষমা করে দিন। আপনার মনের কষ্টের কারণে এই মুহূর্তে তারও কষ্ট হচ্ছে। মা উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে এত বেশি কষ্ট দিয়েছে যে, তা আমি ভুলতে পারছি না। সুতরাং তাকে আমি ক্ষমা করব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করলেন, যাও বেলাল! কিছু শুকনো কাঠের টুকরো নিয়ে এসো। তার মা তাকে ক্ষমা করছে না। তাকে তো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতেই হবে; সুতরাং এখান থেকেই তাকে আগুনে জালানো শুরু হয়ে যাক, যেন মায়ের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

এবার সাহাবায়ে কেরাম শুকনো কাঠের সন্ধানে গেলেন। এ দিকে মায়ের ভেতরটা কেঁদে উঠল। আসলে মা তো মা-ই, যার মমতার কোনো তুলনা হয় না। মা যখন দেখলেন, নবীজি খুব সিরিয়াস, শুকনো কাঠ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দোহাই আল্লাহ! আমার

চোখের সামনে আমার সন্তানকে আগুনে জ্বালাবেন না। নবীজি সুযোগ বুঝে বললেন, তা হলে আলকামাকে মাফ করে দিন। মা বললেন, ঠিক আছে; আমি আলকামাকে ক্ষমা করে দিলাম।

যে-ই মা তার সন্তানকে ক্ষমার ঘোষণা দিলেন, অমনি হযরত আলকামা (রাযি.)-এর রূহ ঊর্ধ্বজগতে উড়াল দিল আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ শোনালেন, আল্লাহ আলকামাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আজ আমরা সেই মমতাময়ী মায়ের সঙ্গে অসদাচরণ করি, তাদের স্বপ্নগুলো ভেঙে চুরমার করছি, অথচ এরাই আমাদেরকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছিল, নিজের সকল স্বপ্নকে আমাদের জন্য কোরবান করেছিল। বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করার মতো।

স্ত্রীকে কষ্ট দেবেন না

শরীয়ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে অত্যন্ত নিবিড় ও নির্মল করে ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী। অথচ সামান্য কারণে একে অপরকে কষ্ট দেয়। এত সামান্য বিষয় যে, এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। যেমন– স্ত্রীকে বকুনি দেওয়া। কোনো-কোনো স্বামীর অভ্যাস হলো, সামান্য একটু ত্রুটি পেলে তা নিয়েই তুলকালাম কাণ্ড করে বসে। কথায়-কথায় বকাঝকা করে, অন্যের সামনে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করে। নিজের বাহাদুরি জাহির করার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। যেন স্ত্রীদমন দেখে অন্যরা তাকে বাহবা দিয়ে বলে, দেখো! অমুক তার স্ত্রীকে কী রকম কন্ট্রোলে রেখেছে! না ভাই! প্রত্যেকটি মানুষের ইজ্জত-সম্মান আছে। অন্যায়ভাবে কাউকে অপমান করা উচিত নয়। শরীয়ত এর অনুমতি দেয় না। অথচ আমরা সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। সেই বেচারী অনুনয়বিনয় করে স্বামীকে মানাতে চেষ্টা করে, কত কাকুতিমিনতি করে! খাবার রান্না করে সামনে আনে, হাতে ধরে, পায়ে ধরে; কিন্তু জনাব স্বামী, 'না' বলে মুখ ভার করে বসে থাকে। কখনো কি ভেবে দেখেছি, আমাদের এই আচরণে তার মনে কী পরিমাণ ব্যথা লাগে? আরে ভাই! একথা কেন ভুলে যাচ্ছি যে, সে-ও আল্লাহর একজন বান্দী?

কখনো-কখনো পুরুষরা টাকা-পয়সাকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। স্ত্রীকে শায়েস্তা করার জন্য খরচাপাতির মধ্যে সংকীর্ণতা করেন। বেচারী স্ত্রী এক একটা পয়সার জন্য আকুতি জানাতে থাকে। ছোট-বড় সকল প্রয়োজনেই তাকে স্বামীর কাছে হাত পাততে হয়। এখন তুচ্ছ

একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ত্রীকে এভাবে অর্থসংকটে ফেলে কষ্ট দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে একদম নেই। এ কেমন স্বামী যে, প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যে তার পা ধরতে হবে? তবে স্ত্রী যখন চাইবে, তখনই দিতে হবে, যা চাইবে তা-ই দিতে হবে; এমনটাও শরীয়ত বলে না; বরং নিজের সামর্থ্য ও সুযোগমতোই তুমি খরচ করবে।

ভুলে গেলে চলবে না, এই রিযিক স্ত্রী-সন্তানদের কারণেই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। তোমার সন্তানাদি না থাকলে হয়ত তোমাকে এত রিযিক দেওয়া হতো না। তো যাদের কারণে তুমি রিযিক পাচ্ছ, তাদেরকেই সংকীর্ণতায় ফেলে কষ্ট দিচ্ছ? অনেক সময় এমনো দেখা যায় যে, বিয়ের পর ছেলেরা নববধূকে বাবা-মার মুখাপেক্ষী করে দেয়। স্ত্রীর সকল বিষয়ে মা-ই সিদ্ধান্ত নেবেন। কেন? ঘরের বধূ হিসেবে আপনার মায়ের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক থাকতে হবে। তাই বলে ছোট-খাট সকল বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না। মায়েরা যেহেতু পুরাতন গৃহিণী, তাই অনেকের ব্যাপারে শোনা যায়, তারা পুত্রবধূদের ওপর মারাত্মক দমন-পীড়ন চালায়। এমনকি কেউ-কেউ তো ঘরের ফ্রিজের দরজা খোলার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এটা অত্যন্ত অমানবিক। এসব পরিহার করতে হবে। নববধূকে আনার সময় তো খুব কদর করে ঘরে আনে; কিন্তু যে-ই না সে ঘরে পা রাখে, তার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কথায়-কথায় দোষত্রুটি ধরে তাকে কোনঠাসা করে রাখা হয়।

অতএব শাশুড়ির দায়িত্ব এখানে অনেক বেশি। সে বয়স্ক, অভিজ্ঞ। তাকে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে। তার কন্যা যদি অন্যের ঘরে যায় এবং সেখানে যদি তার সঙ্গে এসব অনৈতিক আচরণ করা হয়, তখন তার কাছে কেমন লাগবে? আমি নিজে এমন শাশুড়ি সম্পর্কে জানি, যারা নিজেদের পুত্রবধূদের খুব কষ্ট দেয়। তারা আবার পরের বাড়ির বধূ হওয়া নিজের কন্যার জন্য দু'আও চায়। হযরত! আমার মেয়ের জন্য দু'আ করবেন; তার শশুরালয়ের লোকেরা তাকে খুব কষ্ট দেয়। আরে! এমনই তো হওয়ার কথা। এই মহিলা অন্যের মেয়ের সঙ্গে যে আচরণ করে, তার মেয়ের সঙ্গেও অন্যরা একই আচরণ করবে এটাই তো তার প্রাপ্য। কিন্তু মানুষ এসব নিয়ে চিন্তা করে না। ভেবে তো দেখে না, নিজেরা কী করছে।

কোনো-কোনো যুবক কথায়-কথায় স্ত্রীকে তালাকের ধমকি দেয়। কারো-কারো তো এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, ডিভোর্স

তথা তালাক শব্দটি স্ত্রীর জন্য কোনো মামুলি শব্দ নয়। এই শব্দটি শুনে তার গায়ে আগুন লেগে যায়, স্বামীর ওপর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস হাওয়ায় উড়ে যায়। সে নিজের ভবিষ্যতকে গভীর আঁধারে নিমজ্জিত দেখতে পায়। স্বামী এই সামান্য কথাটি বলে মূলত তাকে শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়। শরীয়ত তুচ্ছ-তুচ্ছ বিষয়ের ওপর স্ত্রীকে এভাবে ধমকি দেওয়ার অনুমতি দেয় না। ভালো করে ভেবে দেখুন, পুরুষরা কারণে-অকারণে মেয়েদের কত কষ্ট দিয়ে থাকে এমনটা মোটেও কাম্য নয়।

স্ত্রীরাও সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবে

অনেক মহিলার মধ্যেও এই সমস্যা পাওয়া যায়। তারা সংসারের সব কাজই করে; স্বামীর সেবা, তার ছোট-খাট ইচ্ছাগুলোর প্রতি সজাগ থাকা, সন্তানদের দেখাশোনা ইত্যাদি। কিন্তু এতসব করার পর আবার স্বামীর সঙ্গে অহেতুক বাক্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা কোনোমতেই শোভনীয় নয়। তুচ্ছ-তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমরা সংসারের সুখ-শান্তি বিনাশকারী ঝগড়াঝাটিতে জড়িয়ে পড়ি। একে অপরের মনে আঘাত দিই। মুখে মুখে যদিও জীবনসঙ্গী, কিন্তু আচার-আচরণে যেন একজন অপরজনের জানি দুশমন।

সন্তান না হওয়ার জন্য তিরষ্কার করা

কখনো-কখনো তো এমন বিষয় নিয়েও স্ত্রীদের মনে আঘাত দেওয়া হয়, যা তার আয়ত্বে নেই। যেমন– শাশুড়ি বধূকে বকুনি দেয়, তুমি তো বন্ধ্যা, তোমার কোনও সন্তান হয় না। কিন্তু বলুন তো, যদি তার সামর্থে থাকত, তবে কি সে নিঃসন্তান হয়ে থাকত? কোনোদিনও না। কেউ এই বলে বকাঝকা করে যে, কী মসিবত রে বাবা, শুধু মেয়েই জন্ম দেয়, ছেলে একটাও জন্ম দিতে পার না? বলুন, সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, তা কি বধূর হাতে? এ তো আল্লাহর হাতে। যদি এই ক্ষমতা মানুষের হাতে দেওয়া হতো, তাহলে কেউই মেয়ে জন্ম দিত না, সবাই ছেলে জন্ম দিত। এরপর স্ত্রীকে ছেলেপক্ষের উপহাস ও ঠাট্টা- বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। কোনো-কোনো স্বামী তো এমনও বলে, এবার যদি তোমার মেয়ে হয়, তা হলে আর আমার বাড়ি আসার দরকার নেই, তোমার বাপের বাড়িতেই থেকে যেয়ো। বলুন, এটা কি কোনো মুসলমানের কথা হলো? কোনো মুসলমানের জন্য এমন বলা কি উচিৎ? নাকি এভাবে কারো মনে আঘাত দেওয়া জায়েজ? আমাদের বুযুর্গরা পরিবারের লোকজনের সঙ্গে খুব উত্তম আচরণ করতেন। তাদের

প্রতি ছিল তাদের সীমাহীন মমতা ও সহমর্মিতা। আল্লাহ রব্বুল ইযযত এ-বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।'[১]

আজ যদি দেশের পুলিশপ্রধান বলে দেন, মেয়েদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন, তাহলে আমরা একদম সোজা হয়ে যাই। অথচ মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সেদিকে আমাদের কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা ঠিক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ-নিষেদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তার সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন।

এক বুযুর্গের ঘটনা

এক বুযুর্গ ছিলেন। তার স্ত্রীর মুখ খুব ধারালো ছিল। কথা তো নয়, যেন তরবারির আঘাত। বুযুর্গ তাকে তালাক দিতেন না। ভক্তরা বলল, হযরত! মহিলা আপনার সঙ্গে এত বেয়াদবি করে; আপনি তাকে তালাক কেন দিচ্ছেন না? উত্তরে তিনি যা বললেন, তা যথারীতি বিস্মিত হওয়ার মতো। বললেন, দেখুন, তাকে তালাক দেওয়ার পর আমার দুটির যেকোনো একটি পরিণতি হবে। প্রথমত তালাক তাকে দিলাম; এরপর হয়ত অন্য কেউ তাকে এই বদ-অভ্যাসের কারণে বিয়ে করবে না। ফলে সে বৈবাহিক জীবন থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পাপে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামিও হতে পারে। দ্বিতীয়ত যদি কেউ তাকে বিবাহ করেও, তবুও তার দুর্ব্যবহার থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে না। সে তাকেও কষ্ট দেবে। তাই আমি তালাক না দিয়ে তার দুর্ব্যবহারগুলো আমিই সহ্য করে যাচ্ছি যে, আর যা-ই হোক, অন্তত অন্য একজন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ সে পাবে না। সুবহানাল্লাহ!

কী বিস্ময়কর চিন্তা! কী উঁচু মানের মনোভাব ছিল তাদের। অতএব আসুন! আমরাও স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি উদার ও সহানুভূশীল হয়ে জীবন যাপন করি এবং তাদের ছোট-খাট সকল হক আদায় করে চলি।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৯

নবীজির উত্তম চরিত্রের একটি ঝলক

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) বলেন, একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য গভীর রাতে জেগে উঠলেন। আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। নবীজি খুব সতর্কতার সাথে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। জুতাও পরিধান করেননি। ইতিমধ্যে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জুতা পরিধান করা ব্যতীতই ঘর থেকে বের হচ্ছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা! জুতা এজন্য পরিধান করিনি, যেন আমার জুতার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে না যায়। সুবহানাল্লাহ! এই ছিল নবীজির পারিবারিক জীবন! স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কত কোমল ছিল!

স্ত্রীর মন জয় করে নিন

ওলামায়ে কেরাম একটি ঘটনা লিখেছেন। একব্যক্তিকে তার স্ত্রী কোনো বিষয়ে কষ্ট দিল। সে চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারত; কিন্তু অনুভব করল, স্ত্রী তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছে। সে তাকে কিছু না বলে আল্লাহর বান্দী মনে করে ক্ষমা করে দিল। কিছুদিন পর লোকটি মারা গেল। তার ঘনিষ্ঠ কেউ স্বপ্নযোগে তার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর? কেমন আচরণ হয়েছে তোমার সঙ্গে? সে বলল, আমাকে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি বললেন, এই বান্দা! তুমি দুনিয়াতে অমুক দিন অমুক মুহূর্তে তোমার স্ত্রীকে আমার বান্দী মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। যাও! আজ আমিও তোমাকে আমার বান্দা মনে করে ক্ষমা করে দিলাম।

আমরাও যদি স্ত্রীদের সঙ্গে এমন ভালোবাসার সাথে জীবন যাপন করি, তাদেরকে সব ধরনের কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখি যেন তারা অন্তর থেকে স্বীকার করে, আহ! আমার স্বামী কত ভালো! এমন মানুষ হয়ত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তো স্ত্রীর অন্তরে যখন আপনার ব্যাপারে এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকবে, তখন কেন সে আপনার খেদমত করবে না? কেন আপনার কথা মানবে না? আগে আপনি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করুন, তার মন জয় করে নিন, পরে দেখবেন সে আপনার জন্য কতখানি আপন হয়ে যায়।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ করবেন না

আরো একটু কাছে যান। একাধিক ভাই-বোনদের মধ্যেও এমনটা হয়ে থাকে। সামান্য কারণে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে কথা বলে না, বোনে-বোনে কথা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এমনটা মোটেও ঠিক নয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে ভাইয়ের মর্যাদা

একটু মনোযোগসহ কুরআনের বানী শুনুন। হযরত মূসা (আ.)কে আল্লাহ নবুওত দান করে আদেশ করলেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও! সে অবাধ্য হয়ে গেছে।'[১]

এই হুকুম হওয়ার পর তিনি দেখলেন, আমাকে একা-ই ফেরাউনের নিকট যেতে হচ্ছে। আমার তো একজন সহযোগী প্রয়োজন। কিন্তু সহযোগী হিসেবে সর্বপ্রথম কার কথা স্মরণ হলো? ভাইয়ের কথা। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

'হে রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দিন, আমার জন্য কাজ সহজ করে দিন, আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'[২]

তো দেখুন! নিজের ওপর অর্পিত দীনি বোঝা বহনের জন্য কার ওপর নযর পড়লো? ভাইয়ের ওপর।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন কুরআনে মাজীদ হতেই। কেয়ামতের দিন মানুষ খুব পেরেশান থাকবে। পাপ বেশি; পুণ্য কম। মনে-মনে আশা করবে, হায় যদি কারো কাছ থেকে কিছু নেকি পাওয়া যেত! কিন্তু কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।

এ-ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝

'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাই থেকে পলায়ন করবে।'[৩]

লক্ষ করুন! ভাইয়ের আলোচনা সর্বপ্রথম এসেছে যে, কেয়ামতের ভয়াবহ মুহূর্তে সাহায্যের জন্য সর্ব প্রথম ভাইয়ের কথা-ই মনে পড়বে। কারণ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক একটু বেশিই কাছের। অথচ এই ভাইয়ের সঙ্গে আমরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিই। এত বড় বন্ধন সামান্য কথার কারণে ভেঙে যাচ্ছে।

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ২৪
২. সূরা ত্বহা : আয়াত ২৫-২৮
৩. সূরা আবাসা : আয়াত ৩৪

প্রতিবেশীর হক

ঘর থেকে একটু আগে বাড়ুন। প্রতিবেশীদের কথা ভাবুন। শরীয়ত প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'জিবরাঈল প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমার নিকট এত বেশি এসেছে যে, এক পর্যায় আমার সন্দেহ হতে লাগল, মৃত্যুর পর প্রতিবেশীকে না আবার সম্পদের ওয়ারাসাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে শরীয়ত এত বেশী তাকিদ করেছে। অথচ এই প্রতিবেশীকে আমরা কি অনায়াসেই না কষ্ট দিয়ে থাকি, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে যাই।

এক হাদীছে এসেছে, একব্যক্তি খুব ইবাদতগুযার ছিল। কিন্তু প্রতিবেশীর অন্তরে আঘাত দিত; তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অপর ব্যক্তি পাপী ও গুনাহগার ছিল; কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারী ছিল। তাদের প্রতি সহমর্মী ছিল। আল্লাহ সদাচরণের কারণে তাকে জান্নাত দান করবেন।

অপর হাদীছের ভাবার্থ হলো, কেয়ামত কায়েম হবে। এক বান্দাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলবেন, বান্দা আমার! দুনিয়াতে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম; তুমি আমাকে আহার করাওনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম; তুমি পানি পান করাওনি। আমি অসুস্থ ছিলাম; তুমি আমাকে দেখতে যাওনি! বান্দা বেচারা পেরেশান হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! বলছেন কী আপনি! খাওয়াদাওয়া, পান করা, অসুস্থ হওয়া এসব থেকে তো আপনি চিরপবিত্র। এসব তো আপনার ব্যাপারে কল্পনা-ই করা যায় না। তা হলে এসব কীভাবে বলছেন? আল্লাহ বলবেন, বান্দা! অমুক দিন তোমার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত ছিল। যদি তুমি তাকে সেদিন আহার করাতে, তা হলে তা আমাকেই আহার করানো হতো। তোমার অমুক প্রতিবেশী অসুস্থ ছিল, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তা হলে এটা এমনি হতো, যেন তুমি আমার শুশ্রুষায় গিয়েছ। তখন প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝে আসবে; কিন্তু কিছুই করার থাকবে না। যখন আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে যাব, প্রতিবেশীর হকগুলো যথাযথভাবে আদায় করব, তখন আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের নিকট বসবাস করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর পাশের বাড়িতে এক ইহুদি বসবাস করত। সে এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করল। এখন ঘরটা বিক্রি করার প্রসঙ্গ এল। সে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিল। একব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ঘর কি বিক্রি করবেন? ইহুদি বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা

করল, মূল্য কত? ইহুদি বলল, দু-হাজার দিনার। আগন্তুক বলল, এত বেশী কেন? এ দিকে তো এক হাজার দিনারের বিনিময় পরিপূর্ণ একটি ঘর পাওয়া যায়। ইহুদি বলল, দেখুন, এক হাজার তো আমার ঘরের মূল্য আর এক হাজার আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের প্রতিবেশী হওয়ার মূল্য। সুবহানাল্লাহ!

আমরা মুসলমানরা যেখানে থাকতাম, সেখানকার ঘরের মূল্যও বেড়ে যেত। লোকেরা আমাদের উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে এই পরিমাণ খুশি হতো। আচ্ছা বলুন তো, আমরা কি আজও তেমন মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করছি?

অধীনদের সঙ্গে আচরণ

আমরা অফিসে কাজ করি, ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। বহু লোকজন আমাদের অধীনে কাজ করে। তাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন হয়? এক তো হচ্ছে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কথা বলা; তো তেতো হলেও বলা উচিত। কারণ, তা হলো সংশোধনের জন্য, যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন– ডাক্তার বিষাক্ত জীবাণু বের করার জন্য শরীরের অস্ত্রোপচার করেন। একে কেউই খারাপ বলে না। বরং সুস্থ হওয়ার পর সকৃতজ্ঞ সালাম জানিয়ে বিদায় নেয়। অপরটি হলো কাউকে অকারণে কষ্ট দেওয়া। শরীয়ত একে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

নবীজির আখেরি পায়গাম

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ কথাটি বলতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি কান লাগিয়ে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করছিলেন, 'তাওহীদ তাওহীদ (একত্ববাদ একত্ববাদ)।'

অন্তিম মুহূর্তে তাওহীদের পয়গামের সাথে-সাথে একথাও বলেছেন,

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'নিজের অধীনদের হকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।'

ধরুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের শিক্ষা ও আদর্শের এটাই ছিল সারকথা, যা জীবনের সর্বশেষ শব্দে তিনি

মানবজাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন। সেটি হলো অধীনদের প্রতি খেয়াল রাখা। তাদের হকগুলো যথাযথভাবে আদায় করা। এবার চিন্তা করুন, আমাদের অধীনদের সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন হয়? তাদের হকগুলোর প্রতি আমরা কতটা দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ? আল্লাহু আকবার!

নবীজি যার উকিল হবেন

নবীজির একটি মূল্যবান বাণী একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। তিনি ইরশাদ করেন–

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যেব্যক্তি তার অধীন কর্মচারীর ওপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবে অথবা তার অসন্তুষ্টিতে তার থেকে কিছু আদায় করবে, আমি কেয়ামতের দিন সেই অধীন কর্মচারীর পক্ষে উকিল হয়ে সেই ব্যক্তি থেকে হক উসূল করে দেব।'[১]

হাদীছটি পড়লে অন্তর কেঁপে ওঠে। যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে উকিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন যে, তোমার স্ত্রী তোমার অধীনে ছিল; তুমি তাকে কষ্ট দিয়ে কাঁদাতে, তার অশ্রুসিক্ত চাউনি তোমার অন্তর গলাতে পারেনি, নবীজি বলেন, আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের অধীনদের উকিল হয়ে মজলুমকে তার হক ফিরিয়ে দেব। এবার ভেবে দেখুন, কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে আমরা কি তাদের হকগুলো দিতে পারব? না পারলে আমাদের পরিণতি কী হবে?

কারো মনে আঘাত দেবেন না

একটু আগে বাড়ুন। শরীয়ত একথা বলেনি যে, কেবল মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়ো না। বরং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কারো মনেই আঘাত দিতে শরীয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কেন আমরা অনর্থক একজন মানুষকে কষ্ট দেব?

---

১. আবুদাউদ : হাদীছ নং ২৬৫৪

শরীয়ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ-নিজ বাড়ির আঙিনা ও বাড়ির দরজার সামনের অংশ পরিচ্ছন্ন রাখবে। এটা বাড়িওয়ালার দায়িত্ব। শরীয়ত যাকে ঘরের বাইরের আঙিনা পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখতে বলে, সে কিনা নিজের ঘরের পরিবেশটাকেই পরিচ্ছন্ন রাখতে পারছে না। শরীয়ত তো বলছে, নিজের ঘরের সামনের জায়গাটুকুও পরিষ্কার রাখো, যেন এপথে যাওয়ার সময় কোনো পথিক পিছল খেয়ে পড়ে না যায়। কেউ হোঁচট খেয়ে কষ্ট না পায়। শরীয়তের দৃষ্টি এত গভীর পর্যন্ত পৌঁছেছে আর আমরা এর উল্টো জীবন যাপন করছি। আল্লাহ মাফ করুন।

শরীয়ত বলছে, কাঁচা পেয়াজ খেয়ে কেউ মসজিদে এসো না। কেন? তোমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে; অন্য মুসল্লীর কষ্ট হবে।

শরীয়ত বলছে, তোমরা মসজিদে আসার সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে এসো। যদি কাজের পোশাক, ঘামে ভিজা পোশাক, ডিজেল, কেরোসিন লাগানো পোশাক পরে মসজিদে আস, তাহলে মুসল্লীদের কষ্ট হবে।

শরীয়ত বলছে, যার গায়ে শ্বেতী রোগ আছে, সে যদি ঘরে নামায আদায় করে নেয়, তা হলে সে জামাতে নামায আদায়ের ছাওয়াব পেয়ে যাবে। কারণ, ওই ব্যক্তির চেহারা দেখে কারো-কারো গা ছমছম করে ওঠে। তো শরীয়ত তাকে পরামর্শ দিচ্ছে, তুমি ঘরেই নামায আদায় করো; তোমাকে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়ের ছাওয়াব দান করা হবে। মানুষের সামনে এসে তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলো না।

কী বলব দুঃখের কথা! আজকাল এম.এ পাস শিক্ষিতরাও নিজের হাঁচিকে কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় জানে না। মানুষের মধ্যে বসে-বসেই নিজের নাক পরিষ্কার করে। এখন পাশে বসা লোকটির কাছে কেমন লাগছে; সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই করে না। আচ্ছা বলুন তো, মজলিস থেকে উঠে কয়েক কদম দূরে গিয়ে হাঁচি দিতে তার কী সমস্যা? সেখানে গিয়ে নাক পরিষ্কার করুক। না; তা করবে না। বসে-বসে অন্যকে কষ্ট দেবে। এত উচ্চশিক্ষা আমাদের কী শেখাল? কী লাভ হলো তা শিখে?

এ সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে? কারণ, আমরা অন্যের প্রতি খেয়াল রাখি না। বড়-বড় ডিগ্রিধারী প্রফেসাররাও আজকাল ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে। যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। শিক্ষা তাকে এ জাতীয় অনৈতিক কাজ থেকে বাধা দিচ্ছে না। সমাজের শিক্ষিতদের যখন এই দশা, তখন অশিক্ষিত মূর্খরা যে কী করে সে কথা বলা-ই বাহুল্য। এতে একথাই বোঝা

যাচ্ছে যে, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের ক্ষতি করা এখন আমাদের জন্য মামুলি ব্যাপার হয়ে গেছে।

এ-ক্ষেত্রে শরীয়তের শিক্ষা হলো, প্রত্যেক মুমিন অন্য মানুষকে তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবে। সর্বদা এ চেষ্টা করবে যে, আমার দ্বারা যেন কোনো মানুষের কষ্ট না হয়। এক্ষেত্রে শরীয়ত যে শুধু মানুষের খেয়াল করেছে, তা নয়; বরং সাধারণ জীবজন্তুর প্রতিও লক্ষ রাখতে বলেছে।

উম্মাহর আকাবিরগণের মধ্যে মানবপ্রেম

আমাদের আকাবিরগণের মধ্যে সীমাহীন মানবদরদ ছিল। তারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কতটা সহমর্মী ছিলেন এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মানবপ্রেম

একবার হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সিদ্দীকে আকবর তখন খেলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। তিনি দেখলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবরের হাতে কিছু বিপদগ্রস্ত মানুষের নামের তালিকা। কেউ বিধবা, কেউ পঙ্গু, কেউ বাদী এবং এদের সেবার জন্য লোক প্রয়োজন। সেই তালিকায় যারা-যারা সেবক হিসেবে নিজেকে পেশ করেছেন, বিপদগ্রস্তদের নামের সামনে সেবক হিসেবে তাদের নামগুলোও তালিকাভুক্ত করা আছে।

কারণ, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) বলতেন, যেব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত লোকের সেবা করে, সে যেন তার শরীরের যাকাত আদায় করছে। আমরা তো আজ কারো সেবার দায়িত্বই নিতে চাই না। জন্মদাতা মায়ের সেবাই তো করি না; অন্যের সেবা কী করব?

তো হযরত ওমর (রাযি.) দেখলেন, ওই তালিকায় এক বিধবার নাম লেখা আছে। কিন্তু তার নামের সামনে সেবকের স্থানে কোনো নাম নেই। তিনি বিধবার নাম-ঠিকানা নোট করলেন। পরের দিন ফজরের নামাযের পর বিধবার বাড়ি গেলেন। দরজায় করাঘাত করে বললেন, আম্মা! আমি সেবার জন্য এসেছি। তার ঘরের সেবা ছিল ঝাড়ু দেওয়া, থালাবাসন ধুয়ে দেওয়া, কূপ থেকে পানি এনে মটকা ভরে দেওয়া ইত্যাদি, যেন বৃদ্ধার ঘর থেকে বের হতে না হয়।

তো বৃদ্ধা উত্তর দিল, বাবা! কেউ একজন প্রতিদিন এসে সব কাজ করে দিয়ে যায়। আজও সে এসে সব কাজ করে দিয়ে গেছে। এখন তো আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই! হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে, কাল থেকে আমি ফজরের পূর্বেই চলে আসব।

পরের দিন হযরত ওমর (রাযি.) ফজরের পূর্বেই পৌঁছে গেলেন। দরজায় আওয়াজ দিলেন। বললেন, আমি কাজের জন্য এসেছি। বৃদ্ধা উত্তর দিল, আগন্তুক তো এসে সব কাজ করে দিয়ে চলে গেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আম্মা! সেই লোকটি কে? বৃদ্ধা বলল, আমি তো তার নাম জানি না। তার চেহারাও কখনো দেখিনি। সে এসে দরজা খটখটায়। আমি পর্দা করে নিই। সে নীরবে ঘরের সমস্ত কাজ করে দেয়। যাওয়ার সময় পুনরায় দরজা খটখটায়। আমি পর্দা হতে বেরিয়ে আসি। না তার নাম জানি, না তাকে কখনো দেখেছি।

তিনিও তো খাত্তাবের বেটা ওমর ছিলেন। সেদিনের মতো তিনি চলে গেলেন। পরদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়েই বৃদ্ধার বাড়ির পথে গা ঢাকা দিয়ে বসে গেলেন, আমি দেখে নেব কে সেই ব্যক্তি, যে কিনা রাতের আঁধারে এসে বৃদ্ধার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে চলে যায়। রাত যখন গভীর হলো। চতুর্দিক নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে। লোকালয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ একজনকে দেখা গেল। নিঃশব্দে পা ফেলে আস্তে-আস্তে বৃদ্ধার বাড়ির দিকে আসছে। নিকটে আসতেই হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? তো উত্তরে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর আওয়াজ ভেসে এলো। আমি আবূবকর। আমীরুল মুমিনীন গভীর এই রাতে সেই বৃদ্ধার খেদমত করার জন্য আসছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) দেখলেন, আমীরুল মুমিনীনের পায়ে জুতা নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি ইচ্ছা করেই জুতা পায়ে দেননি, না কি জুতা ছিল না বলে খালি পায়ে এসেছেন? তখন হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাযি.) উত্তর দিলেন, জুতা তো ছিল; কিন্তু এ-সময়টা মানুষের ঘুমের সময় ভেবে ঘর থেকেই জুতা ব্যতীত বের হয়েছি; পাছে আমার জুতার শব্দ শুনে কোনো মুসলমানের ঘুম ভেঙে যায়! সুবহানাল্লাহ!

হযরত ওমর (রাযি.)-এর মানবপ্রেম

হযরত ওমর (রাযি.)-এর গোলাম আসলাম (রাযি.) বলেন, একবার সংবাদ এল, দূর থেকে একটি কাফেলা এসে মদীনার বাইরে খিমা

লাগিয়েছে। তখন হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমল চলছিল। তিনি আমাকে বললেন, এসো আসলাম; একটু তাদের খোঁজখবর নিয়ে আসি। তিনি বলেন, আমরা সেখানে গেলাম। দেখলাম, এক মহিলা চুলা জ্বালিয়ে তার ওপর একটা পাতিল রেখেছে। কিছুক্ষণ পরপর সে পাতিলটা নাড়াচাড়া করছে। তার পাশেই দুটি ক্ষুধার্ত শিশু হঠাৎ কেঁদে উঠছে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। হযরত ওমর (রাযি.) কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তোমার ছেলেরা কাঁদছে কেন? মহিলা বলল, কী করব! আমি এক অসহায় বিধবা। আমার কাছে টাকা-কড়ি কিছুই নেই। এদেরকে খাওয়াব এমন কোনো ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তারাও ক্ষুধায় কাঁদছে। তাই চুলায় আগুন জ্বেলেছি, পাতিলে পানি ঢেলে নাড়াচাড়া করছি, যেন তারা ভাবে, খানা তৈরি হচ্ছে আর অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে আমারও রাতটি পার হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রাযি.) একথা শুনে উঠে দ্রুত মদীনায় ফিরে এলেন। বাইতুল মাল থেকে এক বস্তা আটা, কিছু ঘি ও মধু নিয়ে গোলামকে বললেন, এগুলো আমার কাঁধে তুলে দাও। গোলাম বলল, মনিব! কী করছেন আপনি? আমি তো আছিই আপনার সেবার জন্য। আমিই নিয়ে নিচ্ছি এসব। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আসলাম! কেয়ামতের দিন আমার বোঝা তো আমাকেই বহন করতে হবে; তুমি তো বহন করবে না। এরপর তিনি বস্তা কাঁধে তুলে শহর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মহিলার সম্মুখে রেখে বললেন, এই নাও মধু, এই ঘি আর এই হলো আটা। তুমি কিছু খাবার তৈরি করে নাও। মহিলা বলল, হ্যাঁ, আমি একটু হালুয়া তৈরি করে নিচ্ছি; বাচ্চাদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে, আমি আগুন জ্বেলে দিচ্ছি।

আসলাম (রাযি.) বলেন, আমি দেখলাম, লাকড়ি থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে আর তিনি তাতে ফুঁ মারছেন। মাঝে-মাঝে ধোঁয়া তার দাড়িসহ নাকে-মুখে ঢুকে যাচ্ছে।

চিন্তা করুন! আমীরুল মুমিনীন একজন বিধবার চুলায় আগুন জ্বালানোর জন্য ফুঁ মারছেন।

যাহোক কিছুক্ষণ পর হালুয়া তৈরি হয়ে গেল। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন! চলুন, বাচ্চারা নিজেরাই খেয়ে নেবে। উত্তরে তিনি বললেন, না, এখনই নয়। ছোট্ট বাচ্চারা খানা খেয়ে খেলাধুলায় মেতে উঠল। মনের

আনন্দে তারা হেসে-কুটে একাকার। হযরত ওমর (রাযি.) সেই দৃশ্য দেখছেন। কিছুক্ষণ পর উঠে তিনি মদীনার পথে পা রাখলেন। আমাকে বললেন, আসলাম! জান, আমি কেন বসে ছিলাম? আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, আমি এই শিশু বাচ্চাগুলোকে স্বচক্ষে কাঁদতে দেখেছি। তাই তাদেরকে হাসতে না দেখা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠতে মন চায়নি। সুবহানাল্লাহ!

এই ছিল হযরত ওমর (রাযি.)। ভেবে দেখুন, আমরাও কি কখনো এতটা মানবপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করেছি। এমন কি করেছি যে, হায়! অমুক লোকটি আমার আচরণে কেঁদেছে; এবার গিয়ে একটু হাসাই? কাঁদাতে তো ঠিকই পারি; কিন্তু হাসাতে কেন পারি না? কথা বলতে গেলে ভাবসাব এমন হয় যে, মনে হয় আমার চেয়ে বড় মুসলমান আর কেউ নেই; কিন্তু আচরণে মুসলমানের কোনো আদর্শই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা নিজেদের এমনি মনে করি।

মিয়াঁ আসগর হুসাইন দেওবন্দি (রহ.)-এর মানবপ্রেম

অনেকে ভাবতে পারে, আরে! সাহাবায়ে কেরামের শান ও কুরবানি তো অনেক উঁচা। তারা ছিলেন নবীজির তরবিয়তপ্রাপ্ত। এ-কারণে তারা এমন ছিলেন। তাদের কথা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দ্বারা এসব কি সম্ভব? আমাদের মধ্যে তো অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি।

নিকট অতীতের এক বুযুর্গের ঘটনা শুনুন। হযরত মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহ.) বলেছেন, আমি আমাদের আকাবিরদের মধ্যে হযরত মিয়াঁ আসগর হুসাইন দেওবন্দি (রহ.)-এর নিকট গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। তিনি একদিন আমাকে খানা খাওয়ালেন এবং সাথে-সাথে আমও খাওয়ালেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পরপরই তিনি স্বহস্তে দস্তরখান উঠাতে শুরু করলেন। আমি বললাম, হযরত! আমি দস্তরখান উঠাচ্ছি। তিনি বললেন, দস্তরখান উঠাতে জানেন আপনি?

এবার ভাবুন! একজন মুফতী সাহেব মানুষ; শিক্ষা অর্জন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এক বান্দা সেই মুফতীকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি কি দস্তরখান উঠাতে জানেন? যাহোক, আমি বললাম, হযরত! আপনিই শিখিয়ে দিন। তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ! এসো, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখালেন, এই যে রুটির ছোট-ছোট টুকরোগুলো; এগুলো একত্রিত করে আমি অমুক

স্থানে ফেলি, যেখানে বিড়াল, পাখি ও এ-জাতীয় অন্যান্য প্রাণী এসে অনায়াসেই খেতে পারে। এরপর দস্তরখানের ওপর পড়ে থাকা ছোট-ছোট রুটির গুড়ো (পাউডারের মতো ছোট ছোটগুড়ো) আছে, সেগুলো জমা করে অমুক গাছের গোড়ায় ফেলি, যেখানে পিপীলিকা ও এ-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীরা থাকে। তো সেসব ক্ষুদ্র পোকামাকড় সেগুলো খেয়ে ফেলে। এরপর হাড্ডিগুলো জমা করে অমুক স্থানে ফেলি, যেখানে কয়েকবার দেখেছি, কুকুরগুলো এসে সেখানেই খাবার তালাশ করে। আর এই যে আমের ছিলকা এবং বিচিগুলো; এর মধ্যে বারা বিচিগুলো অমুক স্থানে ফেলি, যেন মহল্লার ছেলেপেলেরা এ নিয়ে খেলাধুলা করে। আর ছিলকাগুলো একত্রে একস্থানে না ফেলে মহল্লার বিভিন্ন গলিতে বিক্ষিপ্ত করে ফেলি, যেন ছিলকা দেখে কোনো প্রতিবেশীর মনে দুঃখ না জাগে যে, হায়! আমাদের আম খাওয়ার সামর্থ্য নেই, অথচ অন্যরা খায়। তো ছিলকাগুলো এভাবে ফেলার দ্বারা কেউ বুঝতে পারে না যে, কেউ আম খেয়েছে।

এ ছিল তাঁর দস্তরখান উঠানোর পদ্ধতি। আল্লাহু আকবার!

তাঁর ব্যাপারে আরো বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ঈশার নামায পড়ে আসছিলেন। মুফতী শফী সাহেব (রহ.)ও সঙ্গে ছিলেন। এক জায়গায় এসে হঠাৎ পা থেকে জুতা খুলে হাতে নিলেন। কিছুদূর চলে আবার জুতা পরলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি এমন করলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, এই ঘরটা এক বেশ্যা নারীর, যার ধর্মও ভিন্ন। (সময়টা তখন এমন ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান একত্রে একই মহল্লায় বাস করত) তো যৌবনে তার বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসত। এখন বয়স বেড়েছে; রূপ-জৌলুসে ভাটা পড়েছে; মানুষের আসা-যাওয়াও কমে গেছে। আমার তো প্রতিদিন বাদ ঈশা এ-পথেই যেতে হয়। তাই আমি তার বাড়ির কাছে এসে জুতা খুলে ফেলি, যেন আমার জুতার শব্দ শুনে তার মনে এ আশা জাগ্রত না হয় যে, হয়ত আমার কোনো খদ্দের আসছে। আমি এই আশা থেকেও তাকে মুক্ত রাখতে চাচ্ছি। খালি পায়ে পথ পাড়ি দিয়ে সামনে গিয়ে জুতা পরে নিই।

অবুঝ প্রাণীদের সঙ্গে সদাচারের শিক্ষা

আল্লাহওয়ালারা একজন অমুসলিম বেশ্যা নারীর প্রতিও দরদী ছিলেন। অথচ আমরা ঘরের নেককার, নামাযী ও পর্দানশীন স্ত্রী-বোনদের প্রতিও দরদী হতে পারি না। শরীয়ত বলছে, তোমরা ঘরের গৃহপালিত প্রাণীর হকের

প্রতি নজর রাখো। হযরত থানুবি (রহ.) একটি কিতাব লিখেছেন– নাম 'বাহারুল ইল্‌ম'। এতে তিনি গৃহপালিত পশুদের হক কীভাবে আদায় করবেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আমার জান কুরবান হোক শরীয়তের সৌন্দর্যের ওপর, যাতে পশুদের অধিকারের ব্যাপারেও পরিপূর্ণ বিধান রাখা হয়েছে। হাদীছে এসেছে, কেউ যদি কোনো পশুর লালনপালন করে, যেমন– বিড়াল, কুকুর, পাখি ইত্যাদি এবং তার পশু ক্ষুধার্ত থাকে, তা হলে তার নাম দয়ালু লোকদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। কারণ, তারা এর খেয়াল রাখত না।

হযরত থানুবি (রহ.)-এর সহমর্মিতা

হযরত থানুবি (রহ.) বলেন, একবার আমার আহলিয়া তার কোনো এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে মুরগি পালতেন। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন, আপনি অমুক সময় মনে করে মুরগিগুলোকে দানা-পানি দিয়ে দেবেন। আমি আচ্ছা বলে স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু এটা আমার দৈনন্দিনের কাজ ছিল না। তাই মুরগিদের দানা-পানি দিতে ভুলে গেলাম। ওই সময়টা ছিল আমার তাফসীরে বয়ানুল কুরআন লেখার সময়। তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন তাফসীর লিখতাম। সেদিন লিখতে বসে দেখি মাথায় কোনো বিষয়ই আসছে না। খুব ভেবেচিন্তেও লেখার কোনো বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, অবশ্যই এর কোনো-না-কোনো কারণ আছে। যখন বসে ভাবতে লাগলাম, তখন হঠাৎ মনে পড়ল, হায়-হায়! মুরগিগুলোকে সকালবেলা দানা-পানি দেওয়ার কথা ছিল; এখন দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে; কিছুই তো দেওয়া হলো না। প্রাণীগুলো ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে নামাযের মুসল্লা থেকে উঠে গিয়ে মুরগিগুলোকে দানা-পানি দিলাম। এরপর ফিরে এসে লিখতে বসলাম। সুবহানাল্লাহ! এবার আগের মতো তাফসীরের বিষয়বস্তু মাথায় আসতে শুরু করল। তখন বুঝলাম, আমার সেই অবস্থাটা এই অবহেলার কারণেই হয়েছিল।

এক বেশ্যা নারীর দয়া

হাদীছে এসেছে, বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা নারী ছিল। সে একদিন একটা পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এক মুহাদ্দিছ সাহেবের দয়া

এক মুহাদ্দিছ সাহেবের ঘটনা। মৃত্যুর পর তার কোনো ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ হলো। জিজ্ঞাসা করল, বলুন তো, আপনার সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ এমন এক আমলের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যার কথা আমার মনেই ছিল না। জিজ্ঞাসা করল, কী আমল ছিল সেটি?

তিনি বললেন, একবার দোয়াতে কলম ভিজিয়ে লিখছিলাম। যখন কালিতে কলম ভিজিয়ে লিখতে যাব এমন সময় একটা মাছি এসে আমার কলমে বসল। আমার মনে হলো, মাছিটা পিপাসার্ত। তাই তাকে না তাড়িয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কলম থামিয়ে দিলাম। এর মধ্যেই মাছিটা উড়ে চলে গেল। আল্লাহ রব্বুর ইযযত বললেন, তুমি আমার একটা ক্ষুদ্র মাখলুকের পিপাসার প্রতি এতটা খেয়াল রেখেছ; যাও! জাহান্নামের পিপাসা থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

সুবহানাল্লাহ! সামান্য মাছির প্রতি দয়া প্রদর্শনের কারণে যদি আল্লাহর মাগফেরাত পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহর কোনো বান্দা-বান্দীর প্রতি যদি কেউ দয়া প্রদর্শন করে, তা হলে তার সঙ্গে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন? আজ আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি একদম লক্ষ রাখি না। সুতরাং আমরা যদি সতর্ক থাকি যে, আমার দ্বারা যেন কেউ কষ্ট না পায়, তা হলে আমাদের সমাজটা বেহেশতের নমুনা হয়ে যাবে। বুযুর্গরা লিখেছেন-

بہشت اں جا کہ آزار نباشد

کسے را با کسے کارے نباشد

'বেহেশত এমন একটি স্থান, যেখানে কারো কষ্ট হবে না। কোনো বান্দা কোনো বান্দার প্রতি অভিযোগ তুলবে না।

ইসলাম তো আমাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়, যেন দুনিয়াতেই আমরা জান্নাতের স্বাদ পেয়ে যাই। কবি বলেন–

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا اے

پر کسے را دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا اے

'মসজিদ ভেঙে দাও, মন্দির ভেঙে দাও, যা ইচ্ছা তাই ভেঙে দাও, তবুও কারো হৃদয় ভেঙো না। কারণ, সেখানে রব থাকেন।'

রব অন্তরেই থাকেন। অথচ আমরা সর্বপ্রথম এই হৃদয়টাতেই আঘাত করে ভেঙে দিই। আল্লাহর নিকট মিনতি করি, তিনি যেন আমাদেরকে অন্যের হৃদয় ভাঙার মহাপাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমীন।

হক মাফ করানোর পদ্ধতি

আমাদের বুযুর্গরা বলেছেন, যদি কাউকে আনন্দ দিতে না পারি, তো কমপক্ষে দুঃখ দেব না; কারো প্রসংশা করতে না পারলেও কমপক্ষে তার সমালোচনা করব না; কাউকে খুশি করতে না পারি, কমপক্ষে তাকে ব্যথা দেব না। কেয়ামতের দিন এর হিসাবও হবে। স্মরণ রাখবেন, আজ মুখে একটি কথা বলে দেওয়া খুব সহজ; কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ রব্বুল ইযযত জালালের মধ্যে থাকবেন, যা দেখে আম্বিয়া (আ.)-ও থরথর করে কাঁপতে থাকবেন, তখন যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, বলো, তুমি অমুক ব্যক্তিকে কেন গালি দিয়েছিলে? অমুককে কেন অপমান করেছিলে? এর কোনো জবাব কি আমরা দিতে পারব? হতে পারে, চরমভাবে সেখানে ব্যর্থ হবো সেদিন। এ-কারণেই সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে দুনিয়াতেই নিজের হিসাব করে নেয়।

আজকাল কী হয়? কেউ মারা গেলে জানাযার পর ওয়ারিশদের কেউ একজন দাঁড়িয়ে বলে, ভাইসব! এই মাইয়্যেত যদি আপনাদের কারো মনে আঘাত দিয়ে থাকেন, তবে তাকে মাফ করে দেবেন। আরে ভাই! যার মনে সে আঘাত দিয়েছে, সে কি তার জানাযা পড়তে এসেছে? প্রথমে একথার উত্তর দিন। যদি আসেও, তা হলে জীবদ্দশায় কেন মাফ চায়নি? মৃত্যুর পর ক্ষমার ঘোষণা হওয়ার চেয়ে এটা অনেক উত্তম যে, আমরা জীবদ্দশায় নিজেরাই গিয়ে মাফ চেয়ে নেব।

শরীয়তে এর পদ্ধতি হলো, যখন আপনি কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তখন এভাবে বলুন, ভাই! আমার ওপর আপনার অনেক হক ছিল। কিন্তু আমি দুর্বলতার কারণে সেগুলো আদায় করতে পারিনি। অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে গেছে, দয়া করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা এই বাক্যগুলো বলে দিতে পারি। যদি সেই ব্যক্তি মুচকি হাসে কিংবা বলে ফেলে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, তাহলে একথার ওপর তার সমস্ত হক মাফ হয়ে যাবে। কী সহজ কাজ তাই না? আমরা এর অভ্যাস গড়ে নিতে পারি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই যে, যাদের মনে আমি কষ্ট দিয়েছি, অবশ্যই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। অন্যথায় কেয়ামতের দিন যদি কেউ তার হকের জন্য

কলার ধরে বসে, তাহলে বাঁচার উপায় থাকবে না। এখনো সময় আছে, আমরা নিজেদের জীবনকে নবীজির এই আদর্শে ঢেলে সাজিয়ে নিই।

আমি এবার কথা সংক্ষিপ্ত করছি। একটু মনোযোগ দিন। আমার ছাত্র জীবনের কথা। একবার আমি আমার সহপাঠীর সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। সে আমাকে গ্রামের ফসলের মাঠগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখাচ্ছে– এটা বেগুন; চাষ এভাবে হয়। এটা গাজর; চাষ এভাবে হয় ইত্যাদি। হঠাৎ দেখলাম, পাশে গোবরের স্তূপ। খুব ঘেন্না লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কী? তখন উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এক কৃষককে জিজ্ঞাসা করলাম, আংকেল এই গোবর তো নাপাক; এগুলো এখানে কেন? তিনি বললেন, এটা হলো কুদরতি খাবার। এটা দিলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলন ভালো হয়, ফসলের সাইজ ভালো হয়।

যাহোক, সে বয়সে তো এসবের অর্থ বুঝিনি। আজ ওইসব কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি, হে মানুষ! যাকে তুমি গোবর বল, নাপাকি বল, দুর্গন্ধ বলে দূরে নিক্ষেপ কর, তাকে যদি কোনো ফসলের মাঠে ফেলা হয়, তখন সেও উপকার করে। আর আমরা মানুষ হয়েও যদি কোনো মানুষের উপকারে না আসি, তা হলে তো আমরা নাপাক গোবরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাব। আসুন! আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করি, আর কারো মনে ব্যথা দেব না, যেন কেয়ামতের দিন কেউ কলার ধরতে না পারে; আল্লাহ আমাদের পূর্বের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হয়ে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহর অস্তিত্ব

'আজকের বস্তুবাদীরা যেহেতু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকজন, তাই এর দ্বারা বিভ্রান্তিবেশি ছড়াচ্ছে। তারা এমন এমন প্রশ্ন করে, তখন শিক্ষার্থী বেচারা পেরেশান হয়ে যায়। মনে রাখবেন, এটা ঈমানের ব্যাপার! এ-বিষয়ে দৃঢ়তা যত বেশি হবে, ততই ভালো। সামান্যতম সন্দেহও ঈমানের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। এ-কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দু'আ চেয়েছেন, তখন শিরকেরও আগে 'সন্দেহ' থেকে বাঁচার জন্য দু'আ চেয়েছেন। যেমন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ و الشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, সন্দেহ, শিরক, নেফাক, বিচ্ছিন্নতা ও খারাপ আখলাক থেকে।'

আল্লাহর অস্তিত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

সন্দেহ থেকে বাঁচার শিক্ষা

আজকের মজলিসে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোতে তাদের শিক্ষার্থীদের এমন সব প্রযুক্তি পড়ানো হয়, যার কারণে তারা দীনের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। এই সন্দেহ মানুষের ঈমানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এ-কারণেই আল্লাহ যখন কুরআন সম্পর্কে বলতে গেলেন। তখন প্রথমেই বললেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ

'এটি এমন কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'[১]

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

'এটি মুত্তাকী লোকদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।[২]

তো তিনি শুরুতেই সন্দেহের শিকড় কেটে দিয়েছেন। অথচ, এই যুবকদের অন্তরে সন্দেহ ঘুরপাক খায়। কী জানি তারা কী শোনে, কী ভাবে? আল্লাহকেই যদি না চেনে, তা হলে তার ইবাদত করবে কী করে? আজকের বস্তুবাদীরা যেহেতু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির লোকজন, তাই এর দ্বারা বিভ্রান্তি বেশি ছড়াচ্ছে। তারা এমন এমন প্রশ্ন করে, তখন শিক্ষার্থী বেচারা পেরেশান

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২

হয়ে যায়। মনে রাখবেন, এটা ঈমানের ব্যাপার! এ-বিষয়ে দৃঢ়তা যত বেশি হবে, ততই ভালো। সামান্যতম সন্দেহও ঈমানের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। এ-কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দু'আ চেয়েছেন, তখন শিরকেরও আগে 'সন্দেহ' থেকে বাঁচার জন্য দু'আ চেয়েছেন। যেমন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, সন্দেহ, শিরক, নেফাক, বিচ্ছিন্নতা ও খারাপ আখলাক থেকে।'[১]

বস্তুবাদীদের নিরুত্তর করার প্রশ্নাবলি

বর্তমানে লোকেরা খুব সহজেই সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। পূর্বের যুগে লোকেরা যখন বস্তুবাদী প্রশ্ন করত, তখন তাদের উত্তরও সেই যুগ ও পরিবেশ অনুযায়ী হতো। আজ যেহেতু সাইন্সি আবিষ্কারগুলো সামনে এসে গেছে, এজন্য তারা নিজেদের দাবি প্রমাণিত করার জন্য সাইন্সকেই বুনিয়াদ বানাচ্ছে।

আপনি একটি পয়েন্ট সবসময় মাথায় রাখবেন যে, যখনই কেউ আপনাকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তখন সর্বপ্রথম তাকে প্রশ্ন করবেন, আচ্ছা বলুন তো, পৃথিবীটা কীভাবে সৃষ্টি হলো? প্রশ্নের উত্তরে দেখবেন সে বলবে, একটা জড়বস্তু ছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটি শব্দ হলো, যাকে তারা সাইন্সের পরিভাষায় 'বিগব্যাং থিওরি' বলে। হঠাৎ শব্দ হলো, এরপর পৃথিবীর সবকিছু ধীরে-ধীরে অস্তিত্ব লাভ করতে লাগল। তো তারা যখনই একথা বলবে, আপনি তাকে শুরুতে শক্তভাবে ধরে বসবেন। পৃথিবী প্রথমে জড়বস্তু ছিল এর প্রমাণ কী? অন্য কিছু কেন ছিল না? তার কাছে এর কোনো জবাব নেই। যদি আপনি মেনে নেন যে, বিকট শব্দ হয়েছে এবং এরপরই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে সামনে তার কাছে এমনসব সাইন্টিফিক প্রমাণ রয়েছে, যে আপনাকে নড়তে দেবে না। এজন্য আপনি তাকে প্রথম চোটেই ধরতে হবে। যে-ই বলবে, জড়বস্তু ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে বলবেন, জড়বস্তু ছিল এর প্রমাণ কী? কীসের ভিত্তিতে একথা বলছ? আমরা যদি বলি শুরু থেকেই আল্লাহ ছিলেন; এখনো আছেন; তিনি সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাহলে

---

১. আবুদাউদ : হাদীছ নং ১৩২২

আমাদের ওপর পাল্টা প্রশ্ন হবে, আল্লাহই ছিলেন, এর প্রমাণ কী? এরপর কথা শুরু হয়ে যাবে। প্রত্যেক স্তরেই আপনার যুক্তি বেশি শক্তিশালী হবে। যেমন– তাদের জড়বস্তু অন্ধও আবার বধিরও আর আমাদের আল্লাহ দেখতেও পান; শুনতেও পান। যেকোনো বিবেকবান লোক দেখুক; পার্থক্যটা অনায়াসেই করতে পারবে।

যাহোক, যখনই মুখোমুখি হবেন, প্রথম প্রশ্ন করবেন, পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? এটাই তাদের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট। আপনি যদি তাকে এই পয়েন্টে না ধরেন, তা হলে সে আপনাকে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাসমূহ শোনাতে থাকবে আর আপনি পেরেশান হয়ে যাবেন।

এদের আরেকটা বানানো প্রশ্ন হলো, দেখুন! আমরা যা দেখি তা-ই বিশ্বাস করি। অদেখা জিনিস মানিও না; বিশ্বাসও করি না। যদি বাস্তবেই আল্লাহ থেকে থাকেন, তা হলে দেখিয়ে দাও; তিনি কোথায় আছেন? তাঁর আকৃতি কেমন, কী রঙের? দেখিয়ে দাও; মেনে নেব, বিশ্বাসও করব। তো আপনি উত্তরে সর্বদা একথা বলবেন- আচ্ছা ভাই! মানুষ জীবিত, না মৃত? তারা বলবে জীবিত। প্রশ্ন করুন রুহের কারণেই তো জীবিত, না অন্য কিছুর কারণে? বলবে, হাঁ, রূহের কারণে। তখন আপনি বলুন, আমাকে একটু দেখিয়ে দাও তোমার রূহটা কোথায়? সঙ্গে থাকলে একটু দেখিয়ে দাও। খুব সরল প্রশ্ন, সরল উত্তর। তাকে বলুন, একজন জীবিত মানুষও শুয়ে আছেন। পাশে একজন মৃত মানুষও শুয়ে আছেন। বাহ্যিকভাবে তো উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যে জিনিসটি বেরিয়ে গেছে, তার রঙও দেখা যাচ্ছে না, ধরাও যাচ্ছে না। তাহলে না দেখে রূহকে তোমরা কীভাবে বিশ্বাস কর? যদি মানুষের দেহ সচল থাকার জন্য রূহ অপরিহার্য হয়, তা হলে পৃথিবীর সমস্ত নেয়ামত সৃষ্টি ও বাকি থাকার জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব অপরিহার্য। তারা না দেখে রূহকে বিশ্বাস করে আর আমরা না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করি। সব জিনিস দেখা যায় না। অনেক জিনিস আছে, যেগুলোকে উপলব্ধি করে, অনুভব করে বিশ্বাস করতে হয়।

আমার যুবক ভাইয়েরা বিশেষ করে লক্ষ করুন! কেউ যদি বলে আমার মাথাটা ব্যথা করছে, আপনি কি বিশ্বাস করবেন, নাকি করবেন না? যদি বিশ্বাস করেন, তা হলে কেন করবেন? ব্যথা কী দেখা যায়? ছোট, না বড়? লম্বা, না চওড়া? হাঁটে, না শুয়ে থাকে? কেউ দেখাতে পারবে না। তারপরও সবাই বিশ্বাস করে। কেন? কারণ, শরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, মাথা ব্যথা করছে।

তদ্রূপ আমরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করি। কারণ, আমাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয়; আল্লাহ আছেন। ব্যথা দেখা যায় না, তারপরও তা আছে, তেমনি আল্লাহ দেখা যায় না; কিন্তু তারপরও অবশ্যই আছেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর তারা কখনো দিতে পারবে না। তা হলো, যেকোনো প্রাণী যখন জন্ম লাভ করে– চাই সে স্তনপায়ী প্রাণীর পেটে জন্ম নিক কিংবা পাখিদের ডিমের মধ্যে; তাকে মায়ের পেটে এবং ডিমের ভেতর স্বভাবগত নির্দেশনা কে দিয়েছেন? 'স্বভাবগত নির্দেশনা' অর্থ কী? অর্থাৎ– প্রত্যেক প্রাণীকে জীবন-যাপনের নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি কে শিখিয়েছেন? যেমন– ধরুন, দুটি ডিম। একটি হাঁসের, অপরটি মুরগির। উভয় প্রকারের ডিম যদি হাঁসের পেটের নিচে তা দেওয়া হয়, তা হলে কিছু দিন পর সেগুলো থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসবে। হাঁসের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পানিতে ফেলুন। তারা সাঁতার কাটতে থাকবে। কিন্তু মুরগির বাচ্চাকে পানিতে ফেলুন, সে ডুবে মারা যাবে। কেন এই পার্থক্য বলুন তো? কারণ, মুরগি হলো শুষ্ক স্থানের প্রাণী আর হাঁস হলো পানির। যার জীবন যে পরিবেশে কাটে, তাকে সেই পরিবেশের স্বভাবগত নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো দেখতে যদিও উভয়টিই ডিম; তারপরও এই পার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

'তিনি সেই রব, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর হেদায়াতও দিয়েছেন।'[১]

মাকড়সার বাচ্চা যখনই জন্ম গ্রহণ করে, এর কিছুক্ষণ পরেই জাল বুনতে শুরু করে। যদি মানুষ বিবেক খরচ করে, তবে বুঝতে পারবে, এই বাচ্চা মাকড়সাটাকে মায়ের পেটে জাল বুনতে কে শিক্ষা দিয়েছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টিজীব ও স্বভাবগত নির্দেশনা

তো এসব জিনিস আল্লাহ রব্বুল ইযযতের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এমন সত্তা, যিনি সকল মাখলুককে সৃষ্টি করে প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ফিতরি হেদায়াতও দিয়ে দিয়েছেন। মাছ কি কখনো সাঁতার কাটা শিখেছে? না; বরং মাছকে যেহেতু পানিতেই জীবন যাপন করতে হবে, তাই সে আল্লাহপ্রদত্ত ফিতরি হেদায়াত দ্বারা জন্মের

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৫০

পরপরই পানিতে সাঁতার কাটতে থাকে। পাখির বাচ্চারাও অল্পবিস্তর উড়তে জানে। অন্তত ডিম থেকে বের হয়ে সে বুঝতে পারে, আমাকে আকাশে উড়তে হবে, তাই সে শরীরে পালক গজানোর পূর্বেই ওড়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে সে উড়তে শিখে যায়। এসবই একমাত্র আল্লাহর ফিতরি হেদায়াতের কারণে হচ্ছে।

কুরআনে মাজীদে কুদরতের নিদর্শন

কুরআনে মাজীদকে প্রশ্ন করুন, সেখানে আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

'যমীনেও বিশ্বাসীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না?'[১]

আসমানে কুদরতের নিদর্শন

মানুষ যদি বাইরের জগতে দৃষ্টি ফেরায়, তা হলে সেখানেও আল্লাহর অস্তিত্বের অগণিত নিদর্শন খুঁজে পাবে। উদাহরণস্বরূপ–

সূর্য আজ যমীন হতে যে-পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করছে; যদি এর অর্ধেক কম দূরত্বে নিচে নেমে আসত, তা হলে যমীনে কোনো সবুজ ফসল বাকি থাকত না; এত গরম হয়ে যেত। আর যদি সূর্য বর্তমান থেকে দ্বিগুণ দূরত্বে চলে যায়, তা হলে যমীনে কোনো ফসল পাকত না; সব সময় বরফ জমে থাকত। তা হলে কে সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে এতটা দূরত্বে স্থাপন করেছেন যে, আমাদের ফলগুলোও পেকে যাচ্ছে; শাক-সবজিগুলোও উৎপাদিত হচ্ছে এবং সূর্যের তাপ থেকে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করছে?

পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে। আপনারা দেখেছেন, গাড়ির চাকা অনেক সময় নড়বড়ে হয়ে যায়। তখন গাড়িতে উপবিষ্ট ব্যক্তি অনুভব করতে পারে। তখন সে বলে, ভাই! গাড়ির চাকাগুলো ঠিক করে নিন। তখন ড্রাইভার তাকে ঠিক করে নেয়, যেন তার ব্যালেন্স ঠিক হয়ে যায়। তো সেই গাড়ি মাত্র একশত মাইল গতিতে চলে, তাতে যদি কয়েকশো গ্রাম ওজনের তারতম্য হয়ে যায়, তখন এত নড়াচড়া

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ২০, ২১

শুরু করে দেয়। তাহলে পৃথিবীর মতো বিশাল বস্তু এক হাজার মাইল গতিতে চলছে; তাহলে তার ব্যালেন্স কতটা পারফেক্ট ও নিখুঁত ভেবে দেখেছেন কি? কেউ অনুমান করতে পারবে? আমরা তো উপলব্ধিও করতে পারি না যে, পৃথিবী ঘুরছে কি ঘুরছে না। তো যমীনকে এমন নিখুঁত ও পারফেক্ট ব্যালেন্স কে দান করল? তিনি আল্লাহ রব্বুল ইযযত।

ডারউইন মতবাদের অসারতা

বস্তুবাদীরা সাধারণত বলে থাকে, মাখলুক নিজে-নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। একটা থিউরি ছিল, যার নাম ইভোলিউশন। এখন তো বিজ্ঞানীরা সেই থিউরিকে নিজেরাই রিজেক্ট করে দিয়েছে। ভালো হয়েছে যে, আমাদের কাজ তারা করে দিয়েছে। কিন্তু কোনো এক যুগে ডারউইনের এই মতবাদ খুব চর্চিত ছিল। তারা বলত, পৃথিবী প্রথমে পানি ছিল। সেটা মাছ হয়ে গেল। সেখান থেকে বড় হতে-হতে বানরের রূপে এল। এরপর বানর থেকে মানুষের রূপে আবিষ্কার হলো। এটা ছিল তার লজিক। একেই ইভোলিউশন বলে।

নাস্তিকরা আপনাকে এই উত্তরই দেবে। তবে এখানে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি হলো, তারা বলে, একটি জীব জীবন লাভের পর প্রথম ষ্টেজ থেকে দ্বিতীয় ষ্টেজে পৌঁছতে প্রায় কয়েক হাজার বছর লেগে গেছে। কয়েক হাজার বছর পর দ্বিতীয় জীব সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখানে কয়েক হাজার বছর সময়ের কথা বলে। কিন্তু যখন বানর থেকে মানুষ হওয়ার প্রসঙ্গ এল, তখন বলল, এখানে তেমন বেশি সময় লাগেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেছে। তো তাদেরকে একটা প্রশ্ন করা জরুরি যে, মানবদেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হওয়া সহজ; কিন্তু মস্তিষ্ক তৈরি হওয়া সবচেয়ে কঠিন। মানবদেহের সবচেয়ে বিচিত্র ও জটিল অঙ্গ এই মস্তিষ্ক, যে গোটা মানবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এবার দেখুন, তারা বলে, দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হতে অনেক সময় লেগে গেছে আর সবচেয়ে জটিল অঙ্গ মস্তিষ্ক ও বিবেক তৈরি হতে সময় লেগেছে অনেক কম। আপনি তাদের একটু জিজ্ঞাসা করবেন, ভাই! সবচেয়ে জটিল অঙ্গ সৃষ্টি হতে তো বেশি সময় লাগার কথা; উল্টোটা হলো কেন? তারা এখানে একটা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে থাকে যে, এখানে মিসিং লিংক হয়েছে। অর্থাৎ– তারা যখন এই ব্যাখ্যা দেয় যে, ওটা থেকে এটা সৃষ্টি হয়েছে; এটা থেকে ওটা সৃষ্টি হয়েছে। বানর থেকে

মানুষ সৃষ্টি হয়েছে; তখন মাধ্যখানে একথাও বলে যে, এখানে মিসিং লিংক হয়েছে। এই মিসিং লিংক ছাড়া তারা যুক্তি দাঁড়ই করাতে পারে না।

অথচ এক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, কুরআন বলে দিয়েছে, বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি; বরং মানুষকে যখন অপরাধের কারণে বিকৃতির আযাব দেওয়া হয়েছে, তাদের চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের বানর বানিয়ে দিয়েছেন।

এবার দেখুন, চৌদ্দশত বছর পূর্বে তো এই থিওরির নাম-গন্ধও ছিল না। তখন একথা কেন উঠল না যে, মানুষকে হাতি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গাধা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে? অথবা মানুষকে বলদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে? বানরের প্রসঙ্গ কেন এল? কুরআনে মাজীদে তো আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করছেন, 'আমি তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হলাম, এরপর-

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

'আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হয়ে যাও!'[১]

তারা বলে, বানর আর মানুষের মধ্যে কিছু বিষয় একরকম, তাই সাইন্স এ দাবির দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু মিল আছে বলে বিষয়টাকে উল্টো বোঝার তো দরকার নেই। কিছু বিষয় বানর ও মানুষের মাঝে এক রকম তো হবেই। কারণ, মানুষকে বিকৃত করেই বানর বানানো হয়েছে, তো এখানে মিল থাকাটাই স্বাভাবিক; মিল না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক।

তো কুরআন তাদের থিউরির বহু বছর আগেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে, বানর মানুষ হয়নি; বরং মানুষকে আল্লাহ আযাবস্বরূপ বানরের রূপ দান করেছেন। তারা বানর হয়ে গেছে।

কুদরতের নিয়ম ও তার সৌন্দর্য

আজকাল লোকেরা বলাবলি করে, জনাব! এখন তো সাইন্স এতই অগ্রসর হয়ে গেছে যে, আপনি যদি ডাক্তারের নিকট গিয়ে বলেন, আমার ছেলেসন্তান চাই, তা হলে তারা আপনাকে ছেলে দিতে পারবে। কথা এতটুকু ঠিক; কিন্তু এতে সাইন্সবিদদের কীর্তি কোথায়? তারা এমন আহামরি কী আর করল? এ তো আল্লাহ রব্বুল ইযযতের বানানো নিয়ম ও শৃঙ্খলার কৃতিত্ব। তারা আল্লাহর নেযামকে গবেষণা করে জানল, কীভাবে ছেলে জন্ম নেয় এবং

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৬৫

কীভাবে মেয়ে জন্ম নেয়। এরপর গবেষণার ফলাফলের ওপর আমল করে তারা একটা ছেলে দুনিয়ায় আনার পদ্ধতি আবিষ্কার করল। তো এখানে একথা স্পষ্ট যে, ছেলে জন্ম দেওয়া এবং তার প্রক্রিয়া সৃষ্টি; সে তো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন; আপনি তো সেটা আবিষ্কার করেছেন মাত্র। আল্লাহর নেযাম নিয়ে গবেষণা করে সেই অনুযায়ী কাজ করে কোনো বস্তু বানিয়ে ফেলা; এ তো আপনার কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহর কৃতিত্ব। আমরা তো তোমাদের কৃতিত্ব তখন স্বীকার করব, যখন তোমরা আল্লাহর নেযামকে এক পাশে রেখে নিজেরা কোনো নেযাম তৈরি কর এবং তোমাদের সেই নিজেস্ব নেযাম অনুসারে কোনো বস্তু সৃষ্টি কর। তা হলে তোমাদের কৃতিত্ব আমরা স্বীকার করে নেব। কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো আপনারা? যদি আল্লাহর বানানো কানুন দিয়ে কিছু সৃষ্টি কর, তা হলে সেটা তোমাদের কৃতিত্ব নয়। কথা পরিষ্কার। নিজের কানুন দিয়ে ছেলে বানাও; তারপর দাবি করো। তাছাড়া পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে, যা না দেখেই মানুষ বিশ্বাস করে। কেউ দাবি করছে, আমরা চাঁদের দেশ ভ্রমণ করে এসেছি। দুনিয়াও বিশ্বাস করে নিচ্ছে। যারা বিশ্বাস করছে, তারা তো কেউ ভ্রমণ করেনি; কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করছে। তা বাস্তব হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্যও দিচ্ছে।

এক নাস্তিকের ঔদ্ধত্ব

আমাকে এক শহরে সফর করতে হয়েছিল। সেখানে এক উকিল ছিল নাস্তিক। তার বাবা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। সে বলতে লাগল, জনাব! আমি না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না। যা বিশ্বাস করি, তা দেখে তারপর বিশ্বাস করি। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি; কিন্তু সে বুঝতে রাজি নয়। যখন দেখলাম, যে বুঝতে চাচ্ছে না, ভাবলাম, এই ঘি বাঁকা আঙুল ব্যতীত বের হবে না। আমি বললাম, এটাই কী তোমার চূড়ান্ত কথা যে, না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করবে না? সে বলল, হাঁ, এটাই আমার চূড়ান্ত কথা যে, না আমি দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করব না। আমি তার কাছ থেকে পাক্কা স্বীকারোক্তি নিয়ে বললাম, আচ্ছা! এই যে আপনার পাশে লোকটি বসে আছেন, ইনি কে? সে বলল, ইনি আমার পিতা! আমি বললাম, তাকে যে পিতা বলে বিশ্বাস করছ, তা কি দেখে বিশ্বাস করছ, নাকি না দেখে? এবার তার পিতাও তাকে বকুনি দিতে লাগল। সে খুব বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, ইনি তোমার পিতা; একথার কোনো প্রমাণ কি তোমার মায়ের কাছে চেয়েছ?

এমনটা কেউ চায় না। মা বলে দিয়েছেন, বেটা! ইনি তোমার আব্বু আর আমরা তাই মেনে নিয়েছি। জীবনভর নিজের পিতার স্থানে এই লোকটির নাম লিখে আসছ শুধু মায়ের কথা বিশ্বাস করে; স্বচক্ষে দেখার ওপর বিশ্বাস করে নয়! তো দুনিয়ায় এমন অনেক কিছু আছে, যা মানুষ না দেখেই বিশ্বাস করে নেয়।

আমরা যদি শুধু মায়ের সাক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস করে নিজের পিতাকে স্বীকার করে নিই, তা হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস করে আল্লাহর অস্তিত্বকে কেন স্বীকার করব না? আমাদের মা তো শুধু মানুষ, মিথ্যাও বলতে পারেন; কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মহাসত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর কথা তো মিথ্যা হতেই পারে না।

কুদরতের কারিশমা বোঝার নির্দেশ

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা মানুষকে চোখ খুলে এদিক-সেদিক তাকিয়ে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। যেমন– কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا

'যমীনে ভ্রমণ করো এবং দেখো। (উপদেশ গ্রহণ করো)।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

'তারা কি উটের দিকে তাকায় না যে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?'[২]

ইসলাম নিজেই চায়, মানুষ সৃষ্টির দিকে চোখ মেলে দেখুক, কুদরতের কারিশমা বুঝুক এবং উপদেশ গ্রহণ করুক।

চুল গজানোর মধ্যে কুদরতের মহিমা

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের অস্তিত্বের দলিল অগণিত। আপনি তাদের সামনে সেগুলো পেশ করুন, যারা বলে, সব কিছু কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত এমনি-এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে। যদি সব কিছু এমনি-এমনিই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাহলে সৃষ্টির কানূন ও পদ্ধতিও তো একই রকমের হওয়া উচিত।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১১

২. সূরা গাশিয়া : আয়াত ১৭

সেই হিসেবে মানুষ যদি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তো এর অর্থ হলো, তার দেহের যেখানে-যেখানে চুল আছে, সেগুলো বড় হওয়ার গতিও একই রকমের হবে। কিন্তু বাস্তবতা তার চেয়ে ভিন্ন। যেমন–

দাড়ি বড় হওয়ার গতি এক রকম।

মাথার চুল বড় হওয়ার গতি এক রকম।

চোখের পলক এক গতিতে বড় হয়।

ভ্রূগুলো ভিন্ন গতিতে বড় হয়।

শরীরের পশমগুলো ভিন্ন গতিতে বড় হয়।

এবার বলুন, সব ধরনের চুলের বেড়ে উঠার গতি তো এক রকম নয়। কোনটা কাটলে বড় হয় আবার কোনটা না কাটলেও বড় হয় না। এই ভিন্ন-ভিন্ন নেযাম একই শরীরে চালু করলেন কে? কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত কি এটা সম্ভব?

এখন বলুন, মাথার চুল যে গতিতে বাড়ে, সেই গতিতে যদি চোখের পলকগুলোও বাড়ত, তা হলে মানুষকে কেমন দেখাবে? যদি ভ্রূগুলোও মাথার চুলের গতিতে বড় হতে থাকে, তা হলে মানুষকে কেমন দেখাবে? ভূতের মতো দেখাবে না! কী বলেন? যদি বগলের চুলগুলোও মাথার চুলের গতিতে বেড়ে উঠে, তা হলে? তো প্রত্যেক অঙ্গের চুলগুলো বেড়ে ওঠার ভিন্ন-ভিন্ন গতি হওয়া কি একথা প্রমাণ করে না যে, এই বিস্ময়কর কুদরতের পেছনে কোনো মহান সত্তার হস্তক্ষেপ আছে, যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন? এখন চুল বড় হচ্ছে, যে অঙ্গের জন্য যেটা সঙ্গত সেই গতিতে। কী চমৎকার এই সৃষ্টিনৈপুণ্য! সুবহানাল্লাহ!!

হাড্ডিগুলো বেড়ে উঠার মধ্যে কুদরতের সৌন্দর্য

এরপর ভেবে দেখুন, যদি দেহের প্রত্যেকটি হাড্ডি এক গতিতে বেড়ে উঠত, তা হলে কী অবস্থা হতো? বাচ্চাদের পা শুরুতে এক ফুট লম্বা হয়। যুবক হলে কয়েক ফুট লম্বা হয়ে যায়। যদি এই গতিতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেড়ে উঠত, তা হলে শুরুতে কান যে পরিমাণ ছিল, তার চেয়ে ৬/৭ গুণ বেশি লম্বা হয়ে যেত। তখন বর্তমানের চেয়ে ছয়গুণ লম্বা কান দেখতে কেমন লাগত? খুব সুন্দর তাই না? পাগুলো ছিল এক ফুট, লম্বা হলো কয়েক ফুট, হাড্ডিও লম্বা হলো। এই গতিতে যদি দাঁতও লম্বা হতো, তা হলে মানুষ সর্বদা হা করে থাকতে হতো; মুখ বন্ধ করতে পারত না। বলুন তো, সেই

সত্তা কে, যিনি দাঁতকে বড় করলেন এক গতিতে, মাথার হাড্ডি বড় করলেন ভিন্ন গতিতে। যেখানে যতটুকু দরকার ছিল ততটুকুই বড় করলেন মানুষকে সুন্দর দেখানোর জন্য? তিনি হলেন আল্লাহ। এমন কুদরতি কারিশমা দেখানোর ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। অন্য কারো মধ্যে এমন ক্ষমতা কল্পনাও করা যায় না।

মুখের আকৃতির ভিন্নতার মধ্যে কুদরতের কারিশমা

এরপর মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকান, নির্দিষ্ট চার-পাঁচটি অঙ্গ দিয়ে মুখমণ্ডল সাজিয়েছেন। দুটি চোখ, নাক, মুখ, কপাল, কান ইত্যাদি এই কয়েকটি অঙ্গ সবার মুখেই আছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকের মুখের আকৃতি ভিন্ন-ভিন্ন কারো সঙ্গে কারো চেহারার মিল নেই। কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে। সুবহানাল্লাহ! আপনি যদি একজন দক্ষ পেইন্টারকে কিছু মানুষের চেহারা আঁকাতে দেন, দেখবেন, যে দশ-পনেরোটি ছবির পর বাকিগুলো একই রকমের আঁকতে থাকবে। কারণ, সবগুলো মুখ সেই একই নাক, মুখ, কপাল ইত্যাদি দিয়েই আঁকতে হচ্ছে, এই পার্থক্যবোধ কতক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব? মানুষ তো! পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযত গোটা পৃথিবীব্যাপী কোটি-কোটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাদের কারো সঙ্গে কারো চেহারার হুবহু মিল নেই। প্রত্যেকটা মুখই ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন ধরনের। বরং প্রত্যেকটা মানুষের আঙ্গুলের রেখাগুলো পর্যন্ত ভিন্ন-ভিন্ন; কারো রেখা কারো সঙ্গে মিলে না। সুবহানাল্লাহ! কে বানিয়েছেন এসব? এসব কি নিজে-নিজে হয়ে গেছে, নাকি কারো হস্তক্ষেপে? যদি সকল বস্তু নিজে নিজেই হতো, তা হলে সকল আকৃতি-প্রকৃতিও একই ধরনের হতো। এসব কিছু ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টি করার কাজ কেবল আমার রব মহান আল্লাহই পারেন। অন্য কেউ এসব জানেও না, পারেও না। মাটিও এক, পানিও এক; কিন্তু সেখান থেকে উৎপাদিত ফলের কোনোটার রং লাল, কোনোটার রং হলুদ, কোনোটার রং কালো, তো কোনোটা সবুজ। কোনোটার স্বাদ মিষ্টি তো কোনোটার স্বাদ টক, কোনোটি ঝাল, আবার কোনোটা টক। অথচ এই ফলের গাছগুলো একই মাটি-পানি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে। কুদরতের এই কারিশমা আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কে দেখাতে পারবে? কেউ না। কখনো না। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্।

আল্লাহর অস্তিত্বের একটি চমৎকার দলিল

এক নাস্তিক প্রশ্ন করল, আচ্ছা তোমরা আল্লাহকে না দেখে তার অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস রাখ? মুসলিম উত্তর দিল, দেখো, একটি গাছের পাতা। একে যখন বকরি খেল, তখন দুধ তৈরি হলো। যখন হরিণ খেল, তখন তার নাভীর কস্তুরি হলো; যা বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী। যখন রেশমের পোকা খেল, তখন তা থেকে রেশম উৎপন্ন হলো। যখন মৌমাছি খেল, তখন তা দিয়ে মধু তৈরি হলো। তো পাতা তো সেই একটিই। বিভিন্ন প্রাণীরা তা খাচ্ছে আর বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস তৈরি হচ্ছে। নাস্তিকদের পক্ষে সম্ভব হলে তারাও এমন দু-চারটা মেশিন তৈরি করে দেখাক, যাতে পানি আর পাতা ঢাললে একটাতে দুধ তৈরি হবে, অন্যটাতে মধু, অন্যটাতে রেশম! মানুষ পারবে এমন মেশিন বানাতে? কখনো না। তো এসব মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযতের কুদরতি কারিশমা। তিনি ব্যতীত আর কেউ এসব সৃষ্টি করতে পারবে না। এ-কারণে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখি এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিশ্বাস রাখি। এতে কোনো দ্বিধা নেই।

দৃঢ় ঈমানের পরিচয়

ইমাম রাযী (রহ.) আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর একশত দলিল লিখেছেন। একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে শয়তানের সাথে দেখা হলো।

শয়তান : আরে আল্লামা রাযী! কী খবর? কী কাজ করছ?

ইমাম রাযী : আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর একশত দলিল জমা করেছি।

শয়তান : এটা কোনো ব্যাপার হলো? বলো আমাকে; আমি সব দলিল খণ্ডন করে দেব।

ইমাম রাযী : না-না, পারবে না; আমার ঈমান খুবই মযবুত।

শয়তান : এসো মুনাযারা হয়ে যাক। দেখো, এই যে গ্রাম্য লোকটি তার ঈমান তোমার ঈমানের চেয়ে অনেক পাকা; তোমার ঈমান কাঁচা।

ইমাম রাযী : এটা কী করে সম্ভব! একশত দলিল লিখেছি। আমি আলেম আর তুমি বলছ এই গ্রাম্য লোকটির ঈমান আমার চেয়ে পাকা; আমার ঈমান কাঁচা? বিষয়টা বুঝলাম না।

শয়তান : এখনি তোমাকে দেখাচ্ছি।

এই বলে সে গ্রাম্য লোকটির নিকট গিয়ে বলল, এই বুড়ো! শুনেছ? 'আল্লাহ' বলতে তো কিছুই নেই। একথা শুনার সঙ্গে-সঙ্গে সে জুতা হাতে

তুলে গর্জে উঠে বলল, দাঁড়া শয়তান! তোকে মজা দেখাচ্ছি। শয়তান পড়িমরি করে পালিয়ে এল। এবার ইমাম রাযী (রহ.)কে উদ্দেশ করে বলল-

দেখলে তো! তার ঈমান কত পাঁকা! 'আল্লাহ নেই' কথাটা সে শুনতেই জ্বলে উঠেছে, সহ্য করতে পারেনি। আর তুমি তো সহ্যও করেছ এবং মুনাযারা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ। আমি যদি কোনো ভারি দলিল দিতাম, তা হলে তুমি নিরুত্তর হয়ে যেতে এবং আমার যুক্তি মেনে নিতে। সুতরাং বোঝা গেল, তোমার ঈমান কাঁচা। গ্রাম্য বৃদ্ধের ঈমান অনেক পাকা।

তো আমাদের ঈমানও এ-রকম পাকা হতে হবে। কারণ, আল্লাহ রব্বুল ইযযতের অস্তিত্বের ঈমান আমাদের অন্তরে যতটা দৃঢ় হবে, সেই পরিমাণ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাধনা করতে পারব। এতে আমাদেরই লাভ।

কদু বড় আর আম ছোট করে সৃষ্টির হেকমত

এক বুদ্ধিমান দেখল, কদুর গাছের চিকন-চিকন লতার মধ্যে বড়-বড় কদু ঝুলছে। আরেকটু সামনে গিয়ে দেখল, বিশাল আম গাছ; কিন্তু ফলগুলো ছোট-ছোট। সে ক্লান্ত হয়ে গাছের নিচে শুয়ে মন্তব্য করছে, লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার সকল কাজই নাকি হেকমতপূর্ণ! হুঁ, কই? আমি তো দেখছি তাঁর কাজের কোনো দূরদর্শিতাই নেই। এত বড় কদুটা ঝুলিয়ে রেখেছে চিকন-চিকন লতায় আর এত বিশাল আম গাছে ফল ঝুলিয়েছেন ছোট-ছোট। এটা কি হলো? কাজের কোনো সিস্টেমই তাঁর জানা নেই। নাউজুবিল্লাহ!

এসব ভাবতে-ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। গাছের মধ্যে পাখিরা আম খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা পাকা আম পড়ে সোজা তার কানপট্টিতে আঘাত হানল। ধড়ফড় করে উঠে কান মলতে-মলতে বলল, হে আল্লাহ! আপনার কাজের মধ্যে কত দূরদর্শিতা! কেমন হেকমতপূর্ণ আপনার সৃষ্টি। এই আম গাছে যদি কদুর মতো বড়-বড় আম ঝুলানো হতো, তাহলে আজ আমার কী দশাটাই-না হতো। যাহোক, হোঁচট খেলে মানুষের বুঝে আসে। তাদের উচিত ছিল নিজেদের অন্তরগুলোকে বোঝাবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে একথার মধ্যে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। পৃথিবীতে এমন কত কিছুই তো আছে মানুষ তা দেখে না; অথচ বিশ্বাস করে। তা হলে আল্লাহর অস্তিত্বের এত প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেন এই গোমরাহি? আসলে হেদায়াতের জন্য নসিব লাগে।

ঈমানের হেফাযত করতে হবে

আমাদের অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি আছেন, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। সেজন্য আমাদের প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হবে। নিজের ঈমানের হেফাযত করুন। একজন মানুষের নিকট সবচেয়ে দামি জিনিস হলো তার ঈমান। ঈমান থেকে মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। এই ঈমান রক্ষায় মানুষ যখন নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তখন তাকে 'শহীদ' বলা হয়। তো ঈমান আমাদের নিকট অনেক বড় নেয়ামত। এই নেয়ামতের মধ্যে আরো সমৃদ্ধি আনা জরুরি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি মুসলিম? তা হলে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিন। হাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসলিম। আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি।

এক বিজ্ঞানীর স্বীকারোক্তি

এক বিজ্ঞানী ছিল। নাম লর্ড ক্যালন। সে লিখেছে, তোমরা যতই গবেষণা করে যাবে, অবশেষে আল্লাহ তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব তোমাদের মেনে নিতেই হবে। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আপনি যদি আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শনগুলো দেখতে চান, তাহলে বিস্তারিত আলোচনার দিকে ধাবিত হোন। খুব স্বাভাবিক কথা যে, যদি ভাসাভাসাভাবে দেখেন, তাহলে কোনো নিদর্শনই দৃষ্টিগোচর হবে না। তবে এ নিয়ে যত বেশি ভাবতে থাকবেন, গবেষণা করতে থাকবেন, তার বাস্তবতা আপনার সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকবে এবং ভেতর থেকে আওয়াজ আসবে, হাঁ আল্লাহ অবশ্যই আছেন; তিনিই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয়টি এতই মৌলিক যে, এ ছাড়া মানুষের ঈমানই থাকে না। তাই এ-বিষয়ে একটু স্ববিস্তার আলোচনা হওয়া দরকার। কারণ, এমন অনেকেই আছেন, যাদের অন্তরে এ জাতীয় প্রশ্নগুলো জাগে। তখন এর সদুত্তর জানা না থাকার কারণে দ্বিধা ও সংশয়ে ভোগেন। আল্লাহ আমাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিন, সুদৃঢ় করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

খুতুবাতে যুলফিকার

২৪তম খণ্ড

আল্লাহপ্রেমের প্রাকৃতিক চাহিদা

'মানুষের দেহের যেমন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, আত্মারও তেমনি এমন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। যেমন– আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন–

تَحْتَاجُ الْقُلُوْبُ اِلٰى اَقْوَالِهَا مِنَ الْحِكْمَةِ كَمَا يَحْتَاجُ الْاَجْسَامُ اِلٰى اَقْوَاتِهَا مِنَ الطَّعَامِ

'মানুষের দেহের যেভাবে খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে, এমনিভাবে মানুষের অন্তরেরও আল্লাহর প্রেমমাখা কথামালার প্রয়োজন পড়ে। যখন বান্দা আল্লাহর প্রেমভরা কথা শোনে, তখন তার অন্তর প্রশান্তি অনুভব করে।'

আল্লাহপ্রেমের প্রাকৃতিক চাহিদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

মানবদেহের প্রাকৃতিক চাহিদা

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের সৃষ্টিনৈপুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো মানুষ। এর মাঝে তিনি অন্তর সৃষ্টি করেছেন, যেখানে থাকে আবেগ ও অনুভূতি। মানুষ যখন পৃথিবীতে আগমন করে, তখন তার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্যও এসে যায়। যেমন– শারীরিকভাবে ক্ষুধা-পিপাসা লাগা একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক মানুষ ক্ষুধার্ত হবে; প্রত্যেক মানুষ পিপাসার্তও হবে। এ-কারণেই ছোট শিশুর যখন ক্ষুধা লাগে, তখন সে কাঁদতে থাকে। মানুষ যখন কিছু সময় আহার না করে, তখন ক্ষুধার কারণে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। যদি পানি পান না করে, তা হলে পিপাসার কারণে ছটফট করতে থাকে। মানুষ পিপাসা সহ্য করতে পারে না। এটা শরীরের প্রয়োজন ও প্রাকৃতিক চাহিদা।

আত্মার প্রাকৃতিক চাহিদা

এভাবে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক কিছু চাহিদা আছে। উদাহরণস্বরূপ ইল্‌ম হাসিল করা, জ্ঞান অর্জন করা এবং অজানাকে জানা এসব মানবাত্মার প্রাকৃতিক চাহিদা। আপনি কোথাও সফর করছেন। হঠাৎ দেখলেন, কিছু লোক এক জায়গায় জড় হয়েছে। আপনি গাড়ি থামিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা

করছেন, ভাই! কী হয়েছে এখানে? তো আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী হয়েছে? এই জিজ্ঞাসা ইল্‌ম অর্জনের প্রাকৃতিক চাহিদার কারণে, ফিতরি জযবার কারণে। অর্থাৎ– যে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তা জানার চাহিদা প্রাকৃতিক। কিছু লোক আছেন, যারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকার পাতায় চোখ না বোলাতে পারলে চিত্তে প্রশান্তি আসে না। তাদের অন্তর চায়, সারা পৃথিবীতে আজ কী ঘটছে তা আমি জানি।

দুধের বাচ্চার ইল্‌ম অর্জন

দুধের ছোট্ট বাচ্চারাও ইল্‌ম অর্জন করে। আপনি দেখবেন, তারা যখন কোনো বস্তু দেখে, তখন তা ধরার চেষ্টা করে। ধরার পর সে বুঝতে পারে, এটি শক্ত না নরম। এমনকি তার সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রেখে দিন; সে সেটাও ধরার চেষ্টা করবে। বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুও যদি সামনে পড়ে, তা-ও সে ধরতে চেষ্টা করে। সে তো অবুঝ। সে না আগুনের জ্বালানোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে, না সাপ-বিচ্ছুর দংশনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে। সে তো একটি নতুন বস্তু দেখে তা ধরতে চাচ্ছে। মা যদি তাকে আগুন ধরতে না দেয়, তখন অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকে।

এমনিভাবে আপনি তার সামনে বাল্ব কিংবা অন্য কোনো বস্তু রাখুন সে সেটা ধরতে চেষ্টা করবে। ধরতে গেলে স্পর্শ শক্তি দিয়ে সে বুঝতে পারে, বস্তুটি শক্ত না নরম। সে এভাবেই ইল্‌ম অর্জন করে। এরপর শিশু সেটা তার রং, আকৃতি ইত্যাদি গভীর মনোযোগ দিয়ে অবলোকন করে। এভাবেও সে ইল্‌ম অর্জন করে থাকে।

তারপর সে একে মুখে নিতে চেষ্টা করে, মুখে নিয়ে স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করে। কাঠের টুকরা হোক কিংবা প্লাস্টিকের টুকরো সেটা মুখে তুলে নেবে। তার তো জানা আছে এটা কী জিনিস। কিন্তু ফিতরিভাবে তার এতটুক জানা আছে যে, একে মুখে দিয়েও জানা সম্ভব। হয় সেটা মিষ্ট হবে নতুবা টক; তেতো হবে, নতুবা ঝাল। সে তা মুখে দিয়ে জানার চেষ্টা করে। এমনকি জলন্ত কয়লা পর্যন্ত সে মুখে পুরে নেয়। তারপর মুখে দিয়ে চিবিয়ে সে বুঝতে পারে, এটা কেমন বস্তু। এবার সেটা মাটিতে নিক্ষেপ করে বাজিয়ে দেখতে চায়। এজন্য আপনি দেখবেন, শিশুদের নজরে কোনো বস্তু পড়লে প্রথমে সে এটা দেখবে, তারপর ধরবে। মুখে দেবে তারপর মাটিতে নিক্ষেপ করবে। সে জানে না, এটা মাটিতে নিক্ষেপ করলে ভেঙে যাবে; বরং সে এর শব্দ শুনতে চাচ্ছে যে, মাটিতে নিক্ষেপ করলে শব্দটা কেমন হবে? প্রত্যেক শিশু এই কাজগুলো প্রাকৃতিকভাবে করে থাকে। সে বিভিন্নভাবে

নিজের অজানা বস্তুকে জানতে চায়। এটা-ই হলো ইল্‌মের জযবা ও আকর্ষণ, যা ফিতরিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

আইডিয়েলের সন্ধান

এমনি এক জযবার নাম হলো 'মহব্বত', যা আইডিয়েল সন্ধান করতে থাকে। এটাও ফিতরিভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। দেখবেন, এই মহব্বত ভালো থেকে বেশি ভালোর সন্ধানে থাকে। উত্তম থেকে মহোত্তমের পেছনে ছোটে। যদি ঘর হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালো ঘর। যদি পোশাক হয়, তা হলে সর্বোত্তম পোশাক। যদি কাউকে ভালোবাসার পাত্র হিসেবে নির্বাচন করতে হয়, তা হলে সবচেয়ে সুন্দর মানুষকে সে ভালোবাসবে।

এটা তার মধ্যে এক ধরনের ফিতরি জযবা। যখন সে কাউকে সর্বদিকে পরিপূর্ণ পেয়ে যায়, তখন তাকে পছন্দ করে ফেলে; তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে অন্যকে পাওয়ার এই যে আকর্ষণ ও অনুসন্ধান প্রবণতা পাওয়া যায়, একে দার্শনিকরা বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

এ্যাডলর-এর অভিমত

এ্যাডলর বলছেন, এটা হলো শক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ– মানুষের মধ্যে একটি মৌলিক যোগ্যতা থাকে যে, আমি ইল্‌ম অর্জন করব, সম্পদ অর্জন করব, জনপ্রিয়তা অর্জন করব এবং অবশেষে ক্ষমতার মসনদে উপবেশন করব। তো তার মধ্যে যেন ক্ষমতা লাভ করার জযবাটা-ই মূল। এটিই তাকে অন্যান্য কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

ফ্রাইড-এর অভিমত

ফ্রাইড একজন দার্শনিক ছিলেন। তার ভাষায় এটি মূলত সহজাত প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তিনি বলেন, ক্ষমতা কিছুই না; বরং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে-সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, তারই নাম মহব্বত। এবার সে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য উত্তম থেকে উত্তম জিনিস তালাশ করে। মনমতো স্ত্রী, উন্নত বাড়ি, অঢেল সম্পদ তার চাই। কেন? ইনজয় করার জন্য। জীবনকে উপভোগ করার জন্য। তো এই সহজাত প্রবৃত্তি সকল প্রবৃত্তির সারাংশ। এজন্যই কেউ বলেছিলেন, মার্কস নামের এক দার্শনিক ছিল। সে বলেছিল, মূল চালিকাশক্তি হলো মানুষের কর্মজীবনের অবস্থা। প্রবাদ আছে, 'যখন পেটে খাবার না থাকে, তখন সব কথাই তিক্ত লাগে।' সে বলেছিল,

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার স্পৃহা মানুষকে অধীর করে তোলে। যেমন– একজন কাউকে প্রশ্ন করেছিল, ভাই! দুয়ে দুয়ে কত হয়? সে উত্তর দিল, চার রুটি।

চূড়ান্ত কথা

চূড়ান্ত কথা হলো, এই দার্শনিকদের দর্শন ভুল বলে মনে হচ্ছে। কারণ, যেব্যক্তির হাতে এই কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো এসে গেল– ক্ষমতা, সুন্দরী নারী, আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রশান্তি তো তার ভাগ্যেও জোটেনি। এরপরও সে অস্থির, অশান্ত। এতেই প্রমাণিত হয়, এসব বস্তু মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। অন্য কিছু অবশ্যই আছে, যাকে অর্জন করার জন্য মানুষের মধ্যে স্বভাবজাত ব্যাকুলতা পাওয়া যায়।

ইসলাম সেই স্বভাবজাত ব্যাকুলতার নাম দিয়েছে 'মহব্বতে ইলাহী'। ইসলাম বলছে, মূলত তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার জন্য তার মধ্যে একরকম স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে। এজন্যই আপনি তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে দেন, তার মন ভরবে না। এরা বিলাসিতা করছে, মউজ-ফুর্তিতে মেতে থেকে জীবনকে উপভোগ করছে, তারপরও তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছুর জন্য হাহাকার আছেই। ভেতরটায় শূন্যতা খাঁখাঁ করবেই। সুতরাং এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যা মানুষকে ব্যাকুল করে রাখে, মূলত এটা তার স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার এক অদম্য স্পৃহা।

সব বান্দা-ই আল্লাহকে বিশ্বাস করে

এই ফিতরি জযবা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বান্দার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এ-কারণে প্রত্যেক বান্দা কোনো-না-কোনোভাবে আল্লাহকে অবশ্যই বিশ্বাস করে। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, হিন্দুরা রাম মানে; অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ-নিজ হিসাব অনুযায়ী বিশ্বাস রাখে। তো মানুষ কাউকে-না-কাউকে অবশ্যই বিশ্বাস করে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন মূর্তিপূজারীদের কিশতিগুলো তুফানের কবলে পড়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন তারা–

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

'তারা একনিষ্ঠ হয়ে তার দীন স্বীকার করে ডাকত।'[১]

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ২২

অন্তরের ক্ষুৎ-পিপাসা মেটানোর অস্থিরতা

মানুষের দেহের যেমন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, আত্মারও তেমনি এমন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। যেমন– আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন–

تَحْتَاجُ الْقُلُوْبُ اِلٰى اَقْوَالِهَا مِنَ الْحِكْمَةِ كَمَا يَحْتَاجُ الْاَجْسَامُ اِلٰى اَقْوَاتِهَا مِنَ الطَّعَامِ

'মানুষের দেহের যেভাবে খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে, এমনিভাবে মানুষের অন্তরেরও আল্লাহর প্রেমমাখা কথামালার প্রয়োজন পড়ে। যখন বান্দা আল্লাহর প্রেমভরা কথা শোনে, তখন তার অন্তর প্রশান্তি অনুভব করে।

এ-ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'শোনো! আল্লাহর স্মরণের সাথেই অন্তরের প্রশান্তি নিহিত।'[১]

نہ دنیا سے نہ دولت نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

'দুনিয়া, সম্পদ আর ঘর আবাদ করার দ্বারা প্রশান্তি আসে না,
অন্তরের প্রশান্তি আসে একমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারা।'

এ-কারণেই-

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

'আমি হয়েছি, তুমি হয়েছো, আমীর হয়েছে
তার ঘন কাল চুলের আমরা বন্দি হয়ে গেছি।'

সবাই তো আল্লাহকে পেতে চায়। আজ আপনারা এখানে কেন সমবেত হয়েছেন? আল্লাহর ভালোবাসাই তো এখানে টেনে এনেছে। কী পুরুষ, কী নারী, শত-শত মাইল সফর করে এখানে এসেছেন। এ তো কেবল অন্তরের সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যা নিবারণের জন্য অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে।

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

মহব্বতে ইলাহীর জযবা চেনার উপায়

মহব্বতে ইলাহীর জযবা কোনো বাহ্যিক জিনিস দ্বারা চেনা যাবে না। তবে যাকে আল্লাহ অন্তরদৃষ্টি দান করেছেন, সে চিনতে পারবে।

کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں
نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی
نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو
تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی

'পৃথিবীর ব্যাপারস্যাপার অন্য রকম মনে হয়
দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে যখন আবেগ মিশে যায়।
আবেগভরা দৃষ্টি যদি তোমার ভাগ্যে না জোটে
তাহলে তোমার অস্তিত্ব হৃদয় ও দৃষ্টির জন্য এক কলঙ্ক।

এই আবেগভরা দৃষ্টি, প্রেমমাখা চাউনি, যা আল্লাহকে সন্ধান করে, তা এই আবেগ ও প্রেমধারী হৃদয়বান আল্লাহওয়ালাদের অনুসন্ধান করে।

কবি বলেন–

اس سے ملنے کی ہے یہی اک راہ
ملنے والوں سے راہ پیدا کر

'তাঁর (আল্লাহর) সঙ্গে মিলনের পথ একটাই
যাদের মিলন নিয়মিত হয়ে থাকে, তাদের মাধ্যমে পথ তৈরি কর।'

এ-কারণেই আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা হয়। এখানে আল্লাহর প্রেমই মূল। বাকি সব তার শাখা-প্রশাখা।

নিজের মধ্যেই তালাশ করো!

শাইখ হযরত ওয়ায়িজ কাশ্মীরি (রহ.) বলেন–

افسانہ خویش مختصر کن
بہ نشین دردوں خود سفر کن

'নিজের কাহিনি সংক্ষিপ্ত করো। এদিক-ওদিক ছোটাছুটির পরিবর্তে তুমি একটু স্থির হয়ে বসো এবং নিজের মধ্যেই ভ্রমণ করো।'

কারণ, সেই প্রিয়তমকে নিজের মধ্যেই ভ্রমণ করলে পাওয়া যাবে।

শাইখ ওয়ায়িজ কাশ্মীরি (রহ.) আগে গিয়ে বলছেন–

هر علم و خیال و فهم و ادراک
در دل که جز اوست آن بدر کن

'আল্লাহ ব্যতীত তোমার অন্তরে যত চিন্তা, ভাবনা, জল্পনা আছে সব বের করে দূরে নিক্ষেপ করো।'

مطلوب بس ایست در دو عالم
از دل تو گزر ازاں حضر کن

'উভয় জাহানে শুধু একটা-ই চাওয়া, তোমার অন্তর থেকে অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছে যাও। প্রত্যাশা একটা-ই।'

ایں است وصال جاں جاناں
ذی راح بہر کسے خبر کن

'এই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। এর বাস্তবতা সম্পর্কে তুমি সবাইকে অবগত করে দাও।'

দুনিয়া-আখেরাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত

দুটি নেয়ামত অনেক বড়।

از نعمت ایں جہاں ثنائے تو بس است
از نعمت ایں جہاں لقائے تو بس است

'হে আল্লাহ! এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত আপনার প্রশংসা করা এবং এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত আপনার দিদার (সাক্ষাৎ)।'

দুনিয়ায় তিনি এই নেয়ামত দান করুন, যেন আল্লাহর প্রসংশা করা নসিব হয়ে যায় এবং আমরা মন ভরে তাঁর প্রশংসা করব, তার বড়ত্ব গাইব। যেখানে বসব, সেখানেই তার প্রেমের এমন কথা বলব যেন মুখে স্বাদ এসে যায়, অন্তরে প্রশান্তি এসে যায়। সাথে-সাথে শ্রোতাদের অন্তরেও তাঁর মহব্বতের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ঈমানি নূরের উপকারিতা

যখন মানুষের মধ্যে ঈমানের নূর না থাকে, তখন সে পথ থেকে ছিটকে পড়ে যায়। অন্ধকারে চলা পথচারীর কাছে যদি টর্চলাইট না থাকে, তখন সে নিজের পথ হারিয়ে অন্য পথে চলতে থাকে। এ-কারণেই যারা ঈমান ব্যতীত হাকিকতকে পাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা সবকিছুর পর এই ফলাফলই বের করেছে যে, সৃষ্টির ভালোবাসা-ই সবকিছু।

তিনটি বিস্ময়কর কথা

স্মরণ রাখবেন, মানুষের প্রেম আর আল্লাহর প্রেমের মধ্যে তিনটি বিস্ময়কর বিষয় আছে।

এক. যেব্যক্তি কোনো মাখলুককে ভয় পায়, সে তার কাছ থেকে দূরে পালানোর চেষ্টা করে। আর আল্লাহকে যে ভয় করে, সে আল্লাহর কাছে আসার চেষ্টা করে।

দুই. মাখলুকের ভালোবাসার চূড়ান্ত পর্যায় হলো, তোমার দেহ আমার কাছে থাকুক; অন্তর যেখানে ইচ্ছা সেখানে। দুনিয়ার মানবজাত, পশুজাত ও প্রবৃত্তিজাত ভালোবাসার সারকথা এটাই যে, দেহটা আমার কাছে হোক; অন্তরে কী আছে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা চান, হে আমার বান্দা! তোমার দেহ যেখানেই থাকুক; কিন্তু অন্তরটা আমার কাছে থাকুক। আল্লাহু আকবার!

তিন. মাখলুকের সাথে ভালোবাসার পরিণতি হলো, একদিন-না-একদিন তাকে প্রিয়তম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আর যে আল্লাহর সঙ্গে প্রেম রাখবে, অবশ্যই তাকে একদিন প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে। সুবহানাল্লাহ!

পাষাণ হৃদয়গুলোকে গলানোর উপায়

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের নাম এত প্রিয়, এত বরকতময় যে, কুরআনে মাজীদই সাক্ষ্য দিচ্ছে–

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'আপনার প্রভুর নাম বরকতময়।'[১]

---

১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৭৮

হায়! যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের নামের বরকত সম্পর্কে জানতাম! যদি এ নামগুলো বারবার আমরা আমাদের অন্তরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করি, তা হলে এ-নাম আমাদের অন্তরের মধ্য দিয়ে নিজেই তার প্রবাহের পথ বানিয়ে নেবে। আমরা দেখেছি, পানির পাম্প যদি কোথাও লিক থাকে, এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে সেখান থেকে পানি টপকে পড়ে। নিচে শক্ত পাথরের ফ্লোর। সেই পাথরের ফ্লোরের গায়ে বিন্দু-বিন্দু পানির ফোঁটা এক সময় গর্ত সৃষ্টি করে ফেলে। যদি পানির মতো কোমল ফোঁটাগুলো পাথরের গায়ে নিজের পথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়, তা হলে আল্লাহর কোনো বান্দা যদি তার পাষাণ হৃদয়ের ওপর বারবার 'আল্লাহ' নামের প্রবাহ চালায়, তা হলে সেখানে খোদাপ্রেমের প্রবাহ কেন জারি হবে না?

বিপ্লব সৃষ্টিকারী নাম

আল্লাহ তা'আলার নাম বিপ্লব সৃষ্টি করে। এই নামের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি যেখানে ব্যবহার হয়, সেখানে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। যেমন–

উদাহরণ-১. একজন যুবক-যুবতি। উভয়ে একে অপরের জন্য গায়রে মাহরাম। এরা পরস্পরে কথা বলা, সালাম-কালাম সব কিছুকে শরীয়ত হারাম করেছে। কিন্তু যখন এদের মধ্যে আল্লাহর নাম নিয়ে বিবাহ পড়ানো হয়, তখন আল্লাহর নামের বরকত দেখুন! এখন আর তারা বেগানা নয়; বরং একে অপরের জীবনসঙ্গী হয়ে যায়। যে একেবারেই বেগানা ছিল, সে এখন আপনজনদের চেয়ে বেশি আপন হয়ে গেল। যে নারীর ওপর একবার চোখ ফেরানোও হারাম ছিল, আল্লাহর নামের বরকতে বিবাহের মাধ্যমে সেই নারী স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।

উদাহরণ-২. একটা বকরি বা ছাগল যখন জবাই ব্যতীত এমনিই কোনো কারণে মারা যায়, তখন তার গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায়। কিন্তু যদি এই বকরিটার গলায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ছুরি চালিয়ে মারা হয়, তখন তার গোশত খাওয়া আপনার জন্য হালাল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

দুনিয়ার মহব্বত দূর করার উপায়

রানি বিলকিস যখন তার সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করল, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর চিঠি এসেছে, আমাদের কী উত্তর দেওয়া উচিত? তখন তারা আগে বেড়ে উত্তর দিয়েছিল, এগিয়ে যাও; আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

এই প্রশিক্ষণ শুরু থেকেই চলে আসছে।

কুরআনও বলছে–

فَانْظُرِىْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ

'ফয়সালা আপনি করুন; আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'[১]

কিন্তু বিলকিস ছিল বুদ্ধিমতী। সে বলল–

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا

'নিশ্চয়ই (বিজয়ী) বাদশাহ যখন লোকালয়ে প্রবেশ করে, তখন সে তাকে তছনছ করে দেয়।'[২]

এ তো হলো, আয়াতে কারীমার বাহ্যিক ভাবার্থ।

হযরত থানুবি (রহ.) বলেন, এই আয়াতে একটি চমৎকার ইস্তিআরা (আরবি সাহিত্যের অলংকার শাস্ত্রীয় পরিভাষা বিশেষ) রয়েছে। যেমন– এখানে জনপদ দ্বারা যদি 'অন্তরের বসতি' উদ্দেশ্য হয় এবং 'বাদশাহ' দ্বারা 'সব বাদশাহর বাদশাহ' আল্লাহর নাম উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তা হলে এর অর্থ এমন হবে-

وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

'এবং সেখানকার সম্মানিতদের অপমানিত করে।'[৩]

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا

'নিশ্চয়ই যখন আল্লাহর নাম অন্তরের বস্তিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে যায়।'

وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

'এবং দুনিয়ার যে-মহব্বত অন্তরে সম্মানিত হয়ে বসে আছে, সেই মহব্বতকে অন্তর থেকে অপদস্থ করে বের করে দেয়।'[৪]

---

১. সূরা নামল : আয়াত ৩৩
২. সূরা নামল : আয়াত ৩৪
৩. সূরা নামল : আয়াত ৩৪
৪. সূরা নামল : আয়াত ৩৪

অলসতা হতে বাঁচার আদেশ

এ-কারণে আল্লাহ রব্বুল ইযযত ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

'তোমরা গাফেল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[১]

অর্থ কী? অর্থ হলো, আল্লাহকে স্মরণ রাখা তোমাদের জন্য অবশ্যক। এটি অকাট্য আদেশ। ভিন্ন শব্দে অর্থ দাঁড়াবে, 'আমাকে ভুলে যেও না; সর্বদা আমাকে স্মরণে রেখো।'

বিবেক অন্তর ও দৃষ্টির প্রধান মুরশিদ

নবীজি এক হাদীছে ইরশাদ করেছেন–

اَلْحُبُّ اَسَاسِيْ

'ভালোবাসাই আমার বুনিয়াদ।'

আপনি চিন্তা করে দেখুন, গোটা দীনে ইসলামের বুনিয়াদই 'আল্লাহর ভালোবাসা।' কবি ইকবাল কথাটি এভাবে বলেছেন–

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دیں بت کدہ تصورات

'বিবেক, অন্তর ও দৃষ্টির প্রধান মুরশিদ হলো ভালোবাসা
ভালোবাসা না হলে গোটা শরীয়ত ও দীন কিছু কাল্পনিক মূর্তিমাত্র।

অর্থাৎ– যদি ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা না থাকে, তো এই দীন ও শরীয়ত প্রাণহীন কিছু কাল্পনিক আনুষ্ঠানিকতার সমষ্টি হয়ে যায়, এর চেয়ে অন্য কোনো সার্থকতা তাতে অবশিষ্ট থাকে না।

মাখলুকের ভালোবাসার সীমারেখা

নশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষকে বসবাস করতে হয়, একে অপরের সাথে লেনদেন করতে হয়, ওঠাবসা করতে হয়। ভালোবাসা ব্যতীত তো মানুষ অপরের প্রতি লক্ষ রাখতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা কয়েক ধরনের মহব্বতকে বৈধ করে দিয়েছেন।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫

যেমন– রক্তের সম্পর্কে মাহরাম আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসা বৈধ করে দিয়েছেন আর যারা এই সীমারেখার বাইরের, তাদের ভালোবাসাকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন। মা-বাবার ভালোবাসা, ভাই-বোনের ভালোবাসা, পীর-মুরীদের ভালোবাসা, ওস্তাদ-ছাত্রের ভালোবাসা, শুধু দীনি সম্পর্কের ভিত্তিতে কাউকে ভালোবাসা এসব ভালোবাসা হলো শাখা-প্রশাখা। আর এগুলোর মূল শিকড় হলো আল্লাহর ভালোবাসা। এ-কারণেই আল্লাহ মাখলুকের ভালোবাসাকে হারাম করেননি বরং এর সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এই ভালোবাসা তোমাদের জন্য এই সীমা পর্যন্ত হালাল। আর যদি এই সীমারেখার বাইরে পা রাখ, তবে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে। তবে এটাও স্মরণ রাখবে যে, বৈধ ভালোবাসাগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ তা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যদি স্ত্রীর ভালোবাসা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, সন্তানের ভালোবাসা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে সেই ভালোবাসাগুলোকে পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যাও। তোমার গন্তব্য অন্য কোথাও। এসব নিয়ে ভাববার সময় হাতে নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিবার এবং তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ এবং ওই ব্যবসা যার ক্ষতির আশঙ্কা করছ এবং তোমাদের ভিটা-বাড়ি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা হতে বেশি প্রিয় হয়, তা হলে অপেক্ষা করো ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ-না আল্লাহর আযাব এসে যায়।'[১]

তো বোঝা গেল, উল্লিখিত সকল প্রকারের ভালোবাসা বৈধ যদি তা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যদি বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে সেগুলো পদদলিত করে আল্লাহর ভালোবাসার গন্তব্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

উপরিউক্ত আয়াতে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো, আল্লাহর ভালোবাসা হতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের– অন্যদের সমকক্ষ নয়।

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ২৪

যেমন– তিনি ইরশাদ করেছেন–

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ

'তোমাদের নিকট সর্বোচ্চ প্রিয়।'[১]

অর্থাৎ– আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসা বান্দার ওপর সর্বোচ্চ পর্যায়ের হতে হবে। অন্যদের প্রতি যে-ভালোবাসা আছে, তার চেয়ে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার পরিমাণ একটু হলেও বেশি হতে হবে।

যাহোক, আমাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে। তারপর আল্লাহর নেসবত মাখলুকের সঙ্গে।

যা হৃদয় জয় করে নেয়

মহব্বতে ইলাহীর এই জযবা যার মধ্যে যে পরিমাণ হবে, সে সেই পরিমাণ কামেল হবে। আল্লাহ তার বান্দাদের এই নেয়ামত দিয়ে থাকেন। এ-কারণেই এমন কামেল মানুষ যদি কোথাও থাকেন, তার মন সেদিকে আকর্ষিত হয়, তার সান্নিধ্যে থাকতে মন চায়–

وہ ادائے دلبری ہو کر نوائے عاشقانہ
جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

'সে তো প্রিয়তমের ভঙ্গি হওয়াতে প্রেমের সম্পদে পরিণত হয়েছে। যে অন্তরসমূহকে জয় করে নেয়, সে-ই তো প্রকৃত যুগবিজেতা।'

আল্লাহর ভালোবাসা তাদের মধ্যে এমনভাবে পাওয়া যায় যে, এটা অন্তরসমূহ জয় করতে থাকে। এ-কারণেই বাদশাহদের রাজত্ব হয় মানুষের দেহের ওপর আর আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব হয় মানুষের অন্তরের ওপর। লোকেরা একবার আসে আর সারা জীবনের জন্য সওদা করে যায়।

چلیں کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں
یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے

'আমি চললাম যে, তোমার মাহফিলটা এক নজর দেখে আসি।
কিন্তু এখানে এলাম তো নিজের অজান্তেই বসে পড়লাম।'

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ২৪

মহব্বতে ইলাহীর ব্যাকুলতা কীভাবে প্রশান্তিলাভ করবে!

এখন মন তো চায়, আল্লাহর ভালোবাসার যে-ব্যাকুলতা আছে, তা যেভাবেই হোক পুরা হয়ে যাক। কিন্তু আল্লাহ্ তো এমন সত্তা, যাকে না দেখা যায়, না শোনা যায়, না ভালোভাবে বোঝা যায়। তিনি তো আমাদের ধারণা ও কল্পনার অনেক ঊর্ধ্বে। তা হলে এমন প্রিয়তমের ভালোবাসার ক্ষেত্রে হৃদয়ের ব্যাকুলতা কী দিয়ে প্রশমিত করব? আমরা তো তার দিক ঠিক করতে পারি না, ধরন নির্ধারণ করতে পারি না। তাঁর সঠিক আকৃতিও আমরা কল্পনায় আনতে পারি না। কিন্তু আমরা যেহেতু মানুষ, তাই ভালোবাসার এই ব্যাকুলতা পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত অন্তরও তো প্রশান্ত হয় না। যেমন– কেউ যদি কোনো সৃষ্টিজীবকে ভালোবাসে, তখন তার মন সব সময় তাকে পেতে চায়, দেখতে চায়, একটু তার পাশে বসতে চায় এবং অবশেষে তাকে আপন করে নিতে চায়। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে তো এসব হওয়া সম্ভব নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেব্যক্তি তাঁর প্রিয়জনকে কাছে পেতে চায়; কিন্তু পায় না, দেখতে চায়; কিন্তু দেখতে পায় না, তখন সে প্রিয়জনের স্মৃতিগুলো নেড়েচেড়ে, তার নামে কবিতা আবৃতি করে হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার ব্যাকুলতাকে পূর্ণতা দিতে চায়। উদাহরণস্বরূপ–

যে-ছেলে দেশে থাকে না; প্রবাসে আছে, মা তার পোশাক হাতে নিয়ে তাকে স্মরণ করেন।

যে-সন্তান মারা যায়, তার ব্যবহৃত কামরায় গিয়ে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র নেড়েচড়ে মৃত সন্তানকে মনে করে আর কাঁদে।

সারকথা, লোকেরা বিভিন্ন স্মৃতি দিয়ে প্রিয়জনকে স্মরণ করে। মহান আল্লাহও বান্দাদের সঙ্গে একই আচরণ করেছেন যে, হে আমার বান্দারা! তোমার মস্তিষ্ক ও ভাবনার পরিধি সীমিত। আমি হলাম অসীম। ফলে এই অসীম কল্পনায় আমাকে আনতে পারবে না। আমি দুনিয়ায় একটি নিদর্শন বানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সেই নিদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের খোদাপ্রেমের ব্যাকুলতাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিয়ো। সেই নিদর্শনের নাম হলো 'বাইতুল্লাহ' তথা আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ।

আল্লাহ তা'আলা একটি জায়গার ওপর নিজের তাজাল্লি নাযিল করে বললেন, এবার এই ঘরের দিকে মুখ করে তোমরা নামায পড়ো। সুবহানাল্লাহ!

আমরা একটা দিক পেয়ে গেলাম। যদি অন্তত কোনো দিক নির্ধারিত না করা হতো, তা হলে আমাদের অন্তরে দ্বিধা থাকত যে, কোন দিকে ফিরে ইবাদত করব– পূর্ব দিকে, না পশ্চিম দিকে? উত্তর দিকে, না দক্ষিণ দিকে? তবে বাইতুল্লাহর কারণে আমরা একটা দিক পেয়ে গেলাম। সাথে-সাথে সংশয়েরও অবসান ঘটল। পৃথিবীতে মানুষ যেখানেই থাকুক, বাইতুল্লাহর দিকে ফিরেই নামায আদায় করে।

مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

'কাবা শরীফের দিকে মুখ করে...'

তো দিক নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কারণে এখন অন্তরের ব্যাকুলতার জন্য এক রাশ প্রশান্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেখানে গিয়েই খোদাপ্রেমের ব্যাকুলতা পূর্ণতা লাভ করে।

কারো মধ্যে যদি এর চেয়ে বেশি ব্যাকুলতা থাকে, আবেগ ও জযবার আপ্লুত হয়, তা হলে সে হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধে এবং আল্লাহর ঘরের দিদারের উদ্দেশ্যে এক আশেকানা সফরে বের হয়।

আমরা দেখেছি, প্রেমিক চায়, সে তার প্রিয়তমের সঙ্গে হাত মিলাবে। যেমন– হাদীছেও একথা এসেছে যে, যেব্যক্তি 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুমু খেল, সে যেন এমন মনোভাব রাখে যে, আমি আমার প্রকৃত প্রিয়তমের সঙ্গে মুসাফাহা তথা হাত মিলানোর সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

আল্লাহ তা'আলা একটি স্থানকে 'মুলতাযাম' বানিয়ে দিয়েছেন, (অর্থাৎ– হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মাঝখানের সামান্য জায়গা) হাদীছে এসেছে, যে বান্দা সেখানে গিয়ে লেপ্টে যাবে, সে যেন এমন অনুভব করে যে, আমি আমার হাকীকী মাহবুবের সঙ্গে কোলাকুলি করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

হাদীছে এও এসেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতাযাম নামক স্থানে গিয়ে এমনভাবে লেপ্টে যেতেন যে, তার সীনা মোবারক বাইতুল্লার দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে যেত, গালও লেগে থাকত, দু' হাত উপরে তুলে লেপ্টে যেতেন। অর্থাৎ– শিশুরা যেভাবে মায়ের বুকের সঙ্গে লেপ্টে যায়, আল্লাহর হাবীবও সেভাবেই মুলতাযামে লেপ্টে যেতেন।

একবার নবীজি মুলতাযামে লেপ্টে থেকে পেছনে সরে এলেন। দেখলেন, হযরত ওমর দাঁড়িয়ে আছেন। তখন নবীজির চোখ ছিল অশ্রুশিক্ত। বহুদিন

পর প্রিয়তমের সঙ্গে কোলাকুলি হলো, তো আনন্দে চোখে পানি চলে এল। হযরত ওমর এ দৃশ্য দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তাকে দেখে নবীজি ইরশাদ করলেন, এটি-ই সেই স্থান, যেখানে অশ্রু ধরে রাখা যায় না।

বান্দার মন চায়, সে প্রিয়তমের আঁচল ধরবে। তার জন্য বাইতুল্লাহর ওপর গেলাফ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি সেই হাকীকী মাহবুবকে সেজদা করতে চাও, তা হলো এসো-

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى

'তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ো!'[১]

তো সেজদা করার জন্য মাকামে ইবরাহীমকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

প্রিয়জনের হাতে পান করতে ইচ্ছে হয়। এজন্য যমযম বানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করলেন, যখন তোমরা যমযমের পানি পান করবে, কল্পনা করবে, আমি আমার মাহবুবের হাতে পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এক আরিফ বিল্লাহ বলেন–

شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا
تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا
مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا
جام، زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا
ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا
ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا
میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی
گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا

'হে খোদা! আমি তোমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। আমাকে তুমি তোমার ঘরে এনেছ। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

বহু দিনের তৃষ্ণা তুমি নিবারিত করেছ।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৫

আমাকে যমযমের শরাব পান করিয়েছ। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। বুকে আমার ঢেলে দিয়েছ শীতলতা হে সাকী! তুমি মুলতাযামে বুক লাগিয়েছ। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। আমি ছিলাম পথহারা! তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। কাবার চতুর্দিকে ঘুরিয়েছ! আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

এ-কারণেই যারা সেখানে যায়, তাদের ফিরে আসতে মন চায় না। লোকেরা বলে, চলো, সময় হয়ে গেছে, ফ্লাইট নিকটবর্তী; কিন্তু বাইতুল্লাহ থেকে পৃথক হতেই মন চায় না।

عشق کو حسن کے انداز سکھالوں تو چلوں
منظر کعبہ نگاہوں میں بسالوں تو چلوں
باب کعبہ سے پھر اک بار لپٹ کر رولوں
اور چند اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں

ইশ্‌ককে সৌন্দর্যের ঢং শিখিয়ে তবেই যাব।
কাবার দৃশ্য চোখে বসিয়ে নিই; তারপর যাব।
কাবার দরজায় বুক লাগিয়ে আরেকবার কেঁদে নিই; তারপর যাব।
অনুশোচনার অশ্রু আরো কয়েক ফোঁটা ফেলে নিই; তারপর যাব।
সেখান থেকে আসতে মন চায় না।
এক বুযুর্গ বলেন–

دل وجاں کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک
ترے کوچے میں پھر پھر کر وہیں پر اس کو وار آئے
وہ عالم کیف و مستی کا وہ طوفان اشک باراں کا
الٰہی زندگی میں پھر وہ آئے بار بار آئے
متاع عقل و دانش جمع کی تھی عمر بھر میں جو
وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے

এ পর্যন্ত মন ও প্রাণের যত সম্পদ প্রিয় ছিল,
তোমার গলিতে ফিরে-ফিরে সেগুলো সেখানেই বিলীন হয়ে যাক

সেই ভাব ও আবেগ এবং মহব্বতের সাগরে তুফান
প্রভু! আমার জীবনে যেন আসে, বারবার যেন আসে।
মহব্বতের বাজিতে হারাম শরীফের প্রাঙ্গণে যেন বারবার আসে।

আল্লাহর দিকে ছুটে যাওয়ার অর্থ

আমাদের এমন জীবন যাপন করা উচিত, যেন আল্লাহর পথে যত ধরনের বাধাবিপত্তি আসে, তা ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

'তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চল।'[১]

যেমন– কোনো প্রাণী রশিতে বাঁধা থাকে। যখন তা ছিড়ে যায়, তখন সে পালাতে থাকে। একেই 'ফেরার' বলে। বিপদে আবদ্ধ ছিল; হাতকড়া খুলে গেল। সে পালিয়ে গেল। বলে, সে ফেরার হয়ে গেছে। তো আল্লাহ বলেছেন–

হে লোকেরা! তোমরা প্রবৃত্তির রশিতে বাঁধা অবস্থায় আছ। সেই প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের রশি ছিঁড়ে আল্লাহর দিকে খুব দ্রুত ভাগতে থাকো।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

'তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চলো।'[২]

এ-কারণেই মুজাহিদীনের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ

'প্রকৃত মুজাহিদ সে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফস ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে।'

নফস তার খাহেশ পূরণ করতে চায়। মানুষ যেন তার খাহেশাতকে ভাঙে এবং আল্লাহর দিকে পা বাড়ায়। প্রকৃত অর্থে যে আল্লাহর দিকে ছুটে চলে, তাকেই মুহাজির বলা হয়। হাদীছে এসেছে–

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبِ

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫০
২. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫০

'মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে অপরাধ ও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে নেকির দিকে ছুটে আসে।'

হিজরতের কয়েকটি স্তর

এক হলো জেহালত তথা মূর্খতা হতে ইল্‌ম তথা জ্ঞানের দিকে হিজরত। আরেক হলো, গাফলত তথা উদাসীনতা হতে ফিকির তথা চিন্তাভাবনার দিকে হিজরত। আরেকটি হলো, পাপ থেকে আনুগত্যের দিকে। আরেকটি হলো, মাখলুক তথা সৃষ্টি থেকে খালেক তথা স্রষ্টার দিকে হিজরত। মানুষও সেখান থেকে আগে বেড়ে তার প্রভুকে পাওয়ার চেষ্টা করবে।

মাখলুক থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি

এবার মাখলুক থেকে আত্মরক্ষার একটি পদ্ধতি শুনুন। আত্মরক্ষার অর্থ হলো মাখলুকের এমনসব নফসানি যুক্তি-তর্ক, যা আমাদেরকে শরীয়তপরিপন্থী কাজে বাধ্য করে। তো এ থেকে আত্মরক্ষার উত্তম পদ্ধতি হলো, আল্লাহর যিকির বেশি-বেশি কর। যেমন– আল্লাহ বলেন–

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨

'স্বীয় প্রভুর নামে যিকির করো এবং আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ মনোযোগী হও।'[১]

অর্থাৎ– মাখলুক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং আল্লাহর সঙ্গে বন্ধন কায়েম করো।

সাক্ষাৎ চার প্রকার

দেখুন, মাখলুকের মধ্যে কিছু মানুষের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ করতে হয়। মাখলুকের সেই সাক্ষাৎ চার ধরনের।

এক. খাদ্যের মতো সাক্ষাৎ : অর্থাৎ– কিছু সাক্ষাৎ আছে, যা খাদ্যের মতো তাৎপর্য বহন করে। খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত যেমন মানুষ থাকতে পারে না, তদ্রূপ এই লোকগুলোর সাক্ষাৎ ব্যতীতও তারা থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী, সন্তানাদি, খাদেম। এরা মানুষের জন্য খাদ্যের সমপর্যায়ের। এদের সাক্ষাৎ মানুষের জীবনের জন্য অতিশয় জরুরি ও অপরিহার্য।

---

১. সূরা মুয্‌যাম্মিল : আয়াত ৮

দুই. ওষুধের মতো সাক্ষাৎ : কিছু-কিছু লোকের সাক্ষাৎ হয় ওষুধের মতো। মানুষ যেমন অপারগতার সময় তেতো ওষুধও গিলে ফেলে, তদ্রূপ কিছু মানুষের সঙ্গে বাধ্য হয়ে সাক্ষাৎ করতে হয়। যেমন– বিচারক, প্রশাসনের কোনো অফিসার কিংবা ফাসেক-ফাজের আত্মীয়। এরা হলো ওষুধের মতো। তেতো হলেও এদের সাক্ষাৎ থেকে বাঁচা অসম্ভব। সাক্ষাৎ করতে মন চায় না; তারপরও আল্লাহর হুকুমকে সামনে রেখে সাক্ষাৎ করতে হয়। যদি সে বিচারক হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য সাক্ষাৎ করতে হয়। এ হলো ওষুধের মতো সাক্ষাৎ।

তিন. বিষের মতো সাক্ষাৎ : কিছু সাক্ষাৎ আছে বিষের মতো। মানুষ যেমন বিষ পান করলে শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তেমনি মানুষ যখন এ-জাতীয় সাক্ষাৎ করে, তখন রূহানীভাবে মৃত্যুবরণ করে। আর সেই বদকার মানুষটির সাক্ষাৎ এই ব্যক্তির জন্য প্রাণঘাতী বিষের মতো মনে হয়। প্রাণঘাতী বিষ থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে হয়, তেমনি অসৎ সঙ্গ থেকেও পূর্ণ আত্মরক্ষা করা উচিত।

চার. নিঃশ্বাসের মতো সাক্ষাৎ : চতুর্থ প্রকারের সাক্ষাৎ মানুষের জন্য নিঃশ্বাসের মতো হয়। শ্বাসের মাধ্যমে যেমন মানুষের জীবনের সম্পর্ক থাকে, তেমনি কিছু সাক্ষাৎ আছে যেগুলোর সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক থাকে। যেমন– শাইখ ও মুরুব্বীর সাক্ষাৎ। একে আমাদের মাশায়েখগণ নিঃশ্বাসের মতো বলেছেন। নিঃশ্বাস ব্যতীত যেমন মানুষের শারীরিক জীবন নিথর হয়ে যায়, তদ্রূপ রূহানী মুরুব্বী ব্যতীত আত্মার জীবন সুস্থভাবে চলতে পারে না।

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান

প্রথমত প্রকৃত স্রষ্টা ও মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমরা যে প্রতিদিন মুরাকাবায় বসি, এটি প্রকৃত মাহবুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পৃথিবীর নিয়ম হলো, বিচারকের সঙ্গে যদি কেউ দেখা করতে আসে, তখন তাকে অপেক্ষারুমে অপেক্ষা করতে হয়। বলা হয়, স্যার ব্যস্ত আছেন; একটু অপেক্ষা করুন। তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবার বলুন, যদি দুনিয়ার মন্ত্রী-এমপিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে মহান আল্লাহর জন্য অপেক্ষা কেন করা লাগবে না।

সুতরাং আপনি যখন প্রতিদিন মুরাকাবায় বসবেন, তখন একথা কল্পনা করুন যে, আমি দুনিয়ার অপেক্ষারুমের আমল পূরণ করছি। যখনই মৃত্যুর মাধ্যমে আখেরাতের দরজা খুলে যাবে, আমি আমার প্রকৃত মাহবুব তথা

প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হব। এ-কারণেই মানুষের মন চায়, সে মুরাকাবা করবে, স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে থাকবে। কিন্তু চোখে দেখতে তো পারব না। কবি বলেন–

ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ مئے لادی
صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟

'হে সাকী! সে কে ছিল, যে আমাকে সুরা পান করিয়েছিল?
আযলের দিন পান করেছিলাম; এখনো তার নেশা কেন কাটছে না?

তো আযলের দিন অর্থাৎ– যেদিন আল্লাহ সবার রূহকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?'[১]

তখন তো আমরা সেই সুরা পান করে বলেছিলাম, কেন নয় হে আল্লাহ? অবশ্যই আপনি আমাদের রব।

কবি বলেন–

ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ مئے پلادی
صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟
حبل الورید سے بھی نزدیک، پھر ترسنا
اے پاس رہنے والے! آنکھوں سے دور کیوں ہے؟

'হে সাকী! সে কে ছিল, যে আমাকে সুরা পান করিয়েছিল?
আযলের দিন পান করেছিলাম, এখনো তার নেশা কেন কাটছে না?
ঘাড়ের রগ হতেও নিকটে; তারপরও এই ব্যাকুলতা!
হে নিকটস্থ সত্তা! দৃষ্টির আড়ালে কেন তুমি?

তো মন চায়, আল্লাহ যখন বান্দার এত নিকটে, তাহলে তাঁকে এক নজর দেখে নিই; কিন্তু চোখে যদি পর্দা পড়া থাকে, তা হলে সেই আলো কীভাবে দেখবে? আমাদের অন্তরে যুলমতের পর্দা পড়ে আছে। তাই এজন্য আল্লাহর সেই নূর দৃষ্টিগোচর হয় না।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭২

আল্লাহর তাজাল্লির দর্শন

একজন লোক ঘুমিয়ে আছে। এখন তার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি যদি তার নিকটে এসে চলেও যায়, সে তাকে দেখতে পাবে না। কারণ, সে ঘুমিয়ে আছে। তদ্রূপ আমরাও গাফলতের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছি। যদি আল্লাহর তাজাল্লির কোনো মুহূর্তে এসেও যায়, আমরা তার দিদার থেকে বঞ্চিত থাকব। আল্লাহওয়ালারা এই দুনিয়াতেই অন্তরের চক্ষু দ্বারা সেই তাজাল্লিগুলো দেখতে পান। আর আমাদের মতো সাধারণ লোকজন কেয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হব।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন আল্লাহর দিদার কীভাবে নসিব হবে? তিনি উত্তর দিলেন, আকাশের চাঁদকে যেভাবে সবাই দেখতে পায়, কোনো ভিড় হয় না, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাকেও সবাই দেখতে পাবে, কোনো ভিড় হবে না।

একটি ইল্‌মি নুকতা

আমি যেহেতু একজন তালেবে ইল্‌ম, তাই এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করে যাচ্ছি। তা হলো, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর তাজাল্লি দেখাবেন, যেন মুমিন বান্দারা দিদার লাভে ধন্য হতে পারে। জান্নাতে পূর্বের চোখ দিয়ে দিদার হবে না; বরং ওই চক্ষু দেওয়া হবে, যা দিয়ে আল্লাহর দিদার সম্ভব হবে। কুরআনে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে–

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

'আমি নির্ধারিতের চেয়েও অতিরিক্ত দান করব।'[১]

তো এই তাজাল্লি জান্নাতে লাভ হবে। এখানে ইল্‌মি বিষয়টি হলো, আল্লাহ তা'আলার দিদার তো হবে। যারা দিদার লাভ করবে, তারা আল্লাহর সৌন্দর্য জামাল দেখে কীভাবে পিছে সরবে? শিশু তো মায়ের বুক থেকে দুধ পান করে এজন্য সরে যায় যে, তার পিপাসা মিটে গেছে। যদি পিপাসা মেটার পূর্বে মা তাকে সরিয়ে দেয়, তখন সে কাঁদে। তো এখানেও সে-রকমের একটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, যদি মুমিনদের সামনে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার জাতের তাজাল্লি উদ্ভাসিত হয় আর মুমিন সেখান থেকে পিছে সরে

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ৩৫

আসে, তাহলে তা মুমিনের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে, অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি কাজ হবে। কারণ এমন কি হতে পারে যে, মাহবুব সম্মুখে আর তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছ? প্রিয়তম তোমার দিকে তাকিয়ে আর তোমার দৃষ্টি অন্য কোথায়! না।

পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে পিছে ঠেলে দেন, তা হলে সেটা তো কৃপণতার সদৃশ হয়ে যাবে। কেউ একজন তোমার সাক্ষাতের জন্য এল, তার তৃপ্তি না হতেই তুমি কিনা তাকে বলছ, যাও! পেছনে যাও! ওলামায়ে কেরাম এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এখানে মূল ঘটনা হলো, আল্লাহর তাজাল্লি দু-ধরনের। একটি হলো জামালি (সৌন্দর্যকেন্দ্রিক) অপরটি হলো জালালি (প্রতাপ ও শক্তিমত্তাকেন্দ্রিক)। যখন জামালি তাজাল্লি হবে, তখন মুমিন বান্দা তার দিদারে হারিয়ে যাবে। যেইমাত্র জালালি তাজাল্লি দেবেন, তখন সবাই পেছনে সরে আসবে।

উদাহরণস্বরূপ মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা থাকে। তো মাছিকে দোকানী যতই তাড়াক সে কিন্তু ঘুরেফিরে আবার সেই রসগোল্লার ওপর বসে। তো মুমিন বান্দার অবস্থাও এমন হবে। তাকে সরানোর দ্বারা সে সরবে না। তবে যখনই জালালি তাজাল্লি পড়বে, তখন মুমিনও পেছনে সরে আসবে। তারপর তারা জান্নাতি নেয়ামতসমূহের মধ্যে হারিয়ে যাবে। আবার যখন জামালি তাজাল্লি হবে, তখন পুনরায় সবাই আল্লাহর দিকে মনোযোগী হবে।

আল্লাহপ্রেমের মূল ভিত্তি

তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রথম বিষয় হলো সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা। কারণ, যেলোক সুন্নতের ওপর আমল করে, সে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

'যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত রাখ, তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহও তোমাদের মহব্বত করবেন।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩১

তো ইত্তিবায়ে সুন্নত তথা সুন্নাতের অনুসরণ এমন নেয়ামত, যা বান্দাকে আল্লাহর প্রিয় বানিয়ে দেয়। এ-কারণেই সালেকের উচিৎ, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত শরীরকে সুন্নতের সাজে সাজিয়ে নেবে এবং আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো বেশি-বেশি আল্লাহর যিকির করা। কারণ, বেশি-বেশি যিকির করার দ্বারা বেশি-বেশি ইবাদতের তাওফীক হয়ে যায় এবং বেশি-বেশি ইবাদতের দ্বারা মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা পায়। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার এত বেশি ইবাদত করতে থাকে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।

তৃতীয় বিষয় হলো মাখলুক থেকে বিমুখতা। অর্থাৎ– মাখলুকের সঙ্গে যে প্রবৃত্তির চাহিদাকেন্দ্রিক মহব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে, সেসব থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা অন্তরে বসিয়ে নেওয়া। যে-বান্দা এই তিনটি কাজ করে নিল, ধরে নিন আল্লাহর প্রকৃত প্রেম তার নসিব হয়ে গেল।

তিনিই তোমার উপাস্য

প্রত্যেক এমন বস্তু, যা মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলে, সেই বস্তু তার উপাস্য হয়ে যায়। যেমন– হাদীছে এসেছে–

كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ مَعْبُوْدُكَ

'প্রত্যেক ওই বস্তু, যা তোমাকে আল্লাহ থেকে উদাসীন করে দেবে, সেটাই তোমার মাবুদ।'

এর অর্থ হচ্ছে, আমরা যদি প্রবৃত্তির কারণে আল্লাহ হতে গাফেল থাকি, তাহলে আমরা 'প্রবৃত্তির পূজারি' হয়ে যাব আর প্রবৃত্তি হয়ে যাবে আমাদের মাবুদ তথা উপাস্য। প্রবৃত্তির পূজা ভিন্ন জিনিস আর আল্লাহর পূজা ভিন্ন জিনিস। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর এমন মহব্বত দান করুন যেন অন্য সব ভ্রান্তসম্পর্কগুলো থেকে আমরা চিরমুক্তি পেয়ে যাই।

مُرَادِيْ مِنْكَ نِسْيَانُ الْمُرَادِ

إِذَا رَمَتِ السَّبِيْلُ إِلَى الرَّشَادِ

'তোমার নিকট আমার প্রত্যাশা হলো, সকল প্রত্যাশা থেকে বিস্মৃত হয়ে যাওয়া যখন পথ আমাকে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে চলবে।'

তিনটি সোনালি উক্তি

সাইয়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) আমাদের সেলসেলায়ে আলিয়ার প্রাণপুরুষ। তাঁর তিনটি উক্তি আছে, যেগুলো স্বর্ণের কালিতে লিখে রাখার মতো।

এক. তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেছেন, তা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের আযমত ও বড়ত্ব সম্পর্কে, যার সম্পর্কে হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, গোটা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে আল্লাহর আযমত সম্পর্কে এমন উঁচু কথা আর কেউ বলেননি। কী বিস্ময়কর ছিল কথাটি! তিনি বলেন–

سُبْحَانَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلْ لِخَلْقِهٖ سَبِيْلًا اِلَّا بِالْعِجْزِ عَنْ مَّعْرِفَتِهٖ

ওই সত্তা মহাপবিত্র, যিনি নিজের পরিচয় পাওয়ার জন্য অক্ষমতা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা রাখেননি।'

দেখুন, একথা থেকে কী পরিমাণ আল্লাহর মারেফাত প্রকাশ পাচ্ছে! অর্থাৎ– যে বান্দা আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করবে, সে-ই তাঁর মারেফাত তথা পরিচয় লাভ করতে পারবে।

দুই. দ্বিতীয় যে-কথাটি তিনি বলেছেন, তা হলো–

لَا خَيْرَ فِيْ قَوْلٍ لَّا يُرَادُ بِهٖ وَجْهَهٗ وَلَا خَيْرَ فِيْ مَالٍ لَا يُنْفَقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

'সেই কথায় কোনো কল্যাণ নেই, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা করা হয়নি এবং সেই সম্পদের মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই, যা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়নি।'

তিন. আর তৃতীয় কথাটি হলো–

مَنْ ذَاقَ خَالِصَ مَحَبَّةِ اللّٰهِ شَغَلَهٗ ذٰلِكَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَاَوْحَشَهٗ مِنْ جَمِيْعِ الْبَشَرِ

'যেবান্দা আল্লাহর খাঁটি প্রেমের স্বাদ পায়, এই স্বাদ তাকে দুনিয়া অন্বেষণ থেকে বিমুখ করে দেয় এবং মানুষের সাহচর্যের ব্যাপারে তাকে সন্ত্রস্ত করে দেওয়া হয়।'

এতে বোঝা গেল, যে বান্দা একবার মাওলার মহাব্বতের স্বাদ দেখে নেবে, তা হলে দুনিয়ার শয়তানি ও প্রবৃত্তির প্রেম কখনো আল্লাহর পথে তাকে বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারবে না।

معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں
رہے وہ ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

তোমার সঙ্গ যদি না হয়, তখন পুষ্পদামেও আমি ভয় পাব।

পক্ষান্তরে সঙ্গ যদি থাকে তোমার, তবে মরুভূমিতেও ফুলবাগানের স্বাদ পাব।

এই মহব্বত একটি বিস্ময়কর নেয়ামত। এপথে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা খুবই সহজ।

راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں
عشق کا ہے بہت بڑا احسان

'মহব্বতের সেতু বহু বছর ধরে পার হচ্ছি।
এ তো ইশকের অনেক বড় করুণা।'

প্রকৃত প্রেম যদি থাকে, তা হলে এই দৌলত ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়।

সেই সেজদার স্থান

আবু খুযাইমা (রাযি.) নামে এক সাহাবি ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি খুব ভালোবাসতেন– একেবারে নিখুঁত ভালোবাসা। প্রেম যখন হয়, তখন বান্দা স্বপ্নেও তার প্রিয়তমকে দেখতে পায়। কিতাবে লেখা আছে, একবার তিনি এরূপ স্বপ্ন দেখলেন। ঘুম থেকে উঠে সকালে তিনি নবীজিকে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ শোনালেন।

নবীজি উত্তর দিলেন, 'তুমি সত্য স্বপ্ন দেখেছ।' এসো! এবার তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করো।

তারপর নবীজি শুয়ে গেলেন এবং হযরত খুযাইমা তাঁর কপালের ওপর সেজদায়ে শুকর আদায় করলেন। সুবহানাল্লাহ!

মহব্বত জিনিসটাই এমন। এমন সেজদার স্থান কজনের ভাগ্যে জোটে? আসল বিষয় হলো মহব্বত, যা বান্দাকে এমন দুর্লভ নেয়ামতও পাইয়ে দেয়। হায়! আমরাও যদি এমন মহব্বতের অধিকারী হতাম; তা হলে আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে যেত!

প্রেমের দাবিদারদের ভয় লাগে

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় মনে রাখবেন। দুনিয়ার নফসানি ও শয়তানি প্রেম-ভালোবাসাকে খুব ভয় করা উচিত। এ থেকে শত-শত মাইল দূরে থাকা উচিত। কুরআনে কারীম হতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আরজ করছি। সেটা হলো, নারীরা তাদের প্রেমের দাবিদারদের থেকে খুব সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। কেন? কারণ, হযরত ইউসুফ (আ.)কে হযরত ইয়াকুব (আ.) ভালোবেসেছিলেন। তাই তাকে কূপে নিক্ষেপিত হতে হয়েছে। যখন জুলেখা তাঁকে ভালোবাসল, তো এবার তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করা হলো। এ-কারণেই মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন-

'নারীদের উচিত, তারা যেন তাদের প্রেমপ্রত্যাশীদের থেকে খুব দূরে থাকে। কারণ, হতে পারে সে যখন কারো প্রেমপ্রস্তাব গ্রহণ করে নেবে, তখন সে লাঞ্ছনার গর্তে নিক্ষেপিত হবে অথবা জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে আবদ্ধ হবে।

উদ্দেশ্য পূরণের সময়

সাধারণত আমরা দেখেছি, সালেকীন যারা যিকির-আযকারও করেন, নেককারও, মুত্তাকীও; কিন্তু বারবার লিখছেন, জনাব! উদ্দেশ্য পূরা হচ্ছে না, উদ্দেশ্য পূরা হচ্ছে না। তো ভাই! স্মরণ রাখবেন, উদ্দেশ্য পূরা হওয়ার সময় কিন্তু সারা জীবন। কখনো-কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হয় অন্তিম মুহূর্তে। বলুন তো! পারিশ্রমিক আপনি কখন পরিশোধ করেন? যে আপনার ঘরে কাজ করার জন্য আসে, তাকে আপনি কখন মজুরি দেন? কাজের শুরুতেই, নাকি শেষে? সকালে কাজ শুরু করলে পেমেন্ট কখন করেন? সন্ধ্যায় করেন তাই না? কারণ, সেটাই পারিশ্রমিক পরিশোধের আসল সময়। তো আমরা যেভাবে শ্রমিকের মজুরি কাজের শেষে পরিশোধ করি, আল্লাহও কখনো-কখনো এমনটা করেন, সব সময় নয়। বান্দা সারা জীবন আল্লাহর সন্ধানে লেগে ছিল; তিনি ধরা দেননি। যখন অন্তিম মুহূর্ত এল, এবার তার ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করলেন। এ-কারণে এসব বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে নেই; বরং লেগে থাকতে হবে।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন–

اندریں راہ می ترش و می خراش

تا دم آخر دم فارغ مباش

تا دم آخر دم آخر بود

کہ عنایت باب وصاحب سر بود

মাঝপথে তুমি হয়ত ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তথাপি তুমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হাল ছেড়ো না যতক্ষণ-না মাওলার করুণা এসে পৌঁছে।

কুরআনে মাজীদে তিন ধরনের মানুষের আলোচনা

কুরআন মাজীদ তিন ধরনের মানুষের আলোচনা করেছে। এক ধরনের মানুষের ব্যাপারে বলেছে–

اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ

'জান্নাতের অধিবাসী।'[১]

দ্বিতীয় ধরনের মানুষের ব্যাপারে বলেছে–

وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ

'জাহান্নামের অধীবাসী।'[২]

তৃতীয় ধরনের মানুষের ব্যাপারে বলছে–

السّٰبِقُوْنَ ۙ

'অগ্রগামী দল।'[৩]

এই অগ্রগামী দলটিই মূলত আল্লাহকে মহব্বতকারী এবং তাঁর পথে অগ্রগামী। তিনি আরো বলেন, এরা সংখ্যায় কম হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এই কম সংখ্যার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমীন।

মৃত্যু যাকে ভয় পায়

একটি কথা বুঝুন। কোনো বুযুর্গ কতিপয় যুবককে প্রশ্ন করল, বলো তো আমরা কাকে ভয় পাই?

একজন বলল, কারেন্টকে।

অপরজন বলল, সাপকে।

---

১. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৮

২. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৯

৩. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ১০

আরেকজন বলল, ডাকাতকে।

একজন বলল, বাঘকে।

একজন পেছনে বসা ছিল। সে বলে উঠল, আমরা স্ত্রীকে ভয় পাই।

যাহোক, প্রত্যেকের কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থাকতেই পারে। এই বেচারার হয়ত পরিস্থিতিই এমন ছিল।

তো এরপর সেই বুযুর্গ ব্যাপারটা খুলে বললেন যে, দেখো, আমরা যখন কারেন্টকে ভয় পাই, তখন এর কারণ থাকে যে, আমরা বিশ্বাস করি; যদি কারেন্ট লাগে, তাহলে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মারবে; এরপর সে মারা যাবে। সাপকে ভয় পাই এজন্য যে, সাপ দংশন করলে বিষের কারণে মানুষ মারা যাবে। বাঘকে ভয় পাই এজন্য যে, সে যদি মওকামতো পায়, তাহলে খেয়ে ফেলবে আর আমরা মারা যাব। এতে বোঝা গেল, মানুষের অন্তরে মূলত ভয় হলো মৃত্যুর। সারা দুনিয়াই মৃত্যুকে ভয় পায়। আর মৃত্যু ভয় করে ইশকে ইলাহীর জযবাকে। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযি.) মৃত্যুকে বিজয় করে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন–

'শত্রুর ভিড়াভিড়ি আমি যেখানে বেশি দেখি, সেদিকেই পা বাড়াই।'

তিনি সারা জীবন এই জযবা নিয়েই আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে স্পর্শও করেনি। কারণ, তিনি মৃত্যুকে বিজয় করে নিয়েছিলেন।

মৃত্যুর জন্য যারা অপেক্ষা করে

আল্লাহওয়ালারা মৃত্যুকে ভয় পান না; বরং তাঁরা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষায় থাকেন। এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যখন মালাকুল মাউতকে দেখলেন, বললেন 'আহ! কত কাঙ্ক্ষিত মেহমান এসেছেন! আমি দীর্ঘ বিশ বছর ধরে আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

এক সাহাবি শহীদ হচ্ছিলেন। ওই মুহূর্তে বলছিলেন–

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

'কাবার রবের শপথ! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি।'

আল্লাহর ভালোবাসায় সমৃদ্ধির কারণ

আমাদের মাশাইখগণ তাদের ভক্ত-মুরীদদের অন্তরে আল্লাহর প্রেমের এই জযবা ও আবেগই জাগ্রত করতেন। আপনিও যদি তাদের সোহবতে

এসে কিছুদিন সময় কাটান, তাহলে আপনার অন্তরেও আল্লাহর ভালোবাসার জযবায় সমৃদ্ধি আসবে। আপনার অন্তরই সাক্ষ্য দেবে, হাঁ, এখন অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার অনুভূতিটাই ভিন্ন।

পবিত্র কুরআনে 'ইশ্‌ক' শব্দটি নেই কেন?

একটি শব্দ হলো 'মহব্বত' (অর্থ ভালোবাসা) আর অপর একটি শব্দ হলো 'ইশ্‌ক' (অর্থ মহব্বত, ভালোবাসা)। উভয়টিই আরবি শব্দ। কিন্তু কুরআনে শুধু 'মহব্বত' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে; ইশ্‌ক শব্দটি ব্যবহার হয়নি। তবে হাদীছে 'ইশ্‌ক' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। আমি একবার এর অনুসন্ধান চালাই। প্রায় ছয় মাস তালাশ করার পর অবশেষে 'কানযুল উম্মাল'-এ একটি রেওয়ায়াত পেয়েছি, যাতে 'ইশ্‌ক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।'

আমাদের ভাষায় 'ইশ্‌ক' শব্দটির ব্যবহার বেশি হয়। ফারসি ভাষায় তো অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

شاد باداے عشق! سودائے ما

اے دوائے جملہ علت ہائے ما!

اے دوائے نخوت و ناموس ما!

اے کہ افلاطون و جالینوس ما!

'সাধুবাদ তোমাকে হে এশক! হে আমাদের সম্পদ! হে আমাদের সকল ব্যাধির নিরাময়! হে আমাদের আফলাতুন ও জালিনুস!'

তবে কুরআন মাজীদে মহব্বত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে– ইশ্‌ক শব্দের ব্যবহার হয়নি। এর কারণ কী? বহুদিন এ প্রশ্নটি আমার মাথায়ও ঘুরপাক খেয়েছে। এতে কী রহস্য আছে যে, কুরআনে মাজীদে মহব্বত বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে! যেমন–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

'সে তাদের মহব্বত করে এবং তারাও তাকে মহব্বত করে।'[১]

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

'যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে ভীষণ ভালোবাসে।'[২]

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

কিন্তু 'ইশ্‌ক' শব্দের ব্যবহার হয়নি? অবশেষে এর হাকিকত আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে বসে বুঝে এসেছে।

দেখুন! মহব্বতকারী ও আশেক ব্যক্তির মাঝে একটু পার্থক্য আছে। আশেকের মধ্যে মহব্বত পাগলামির সীমা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইশ্‌ক হওয়ার পর তার মধ্যে মহাবুবের সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সম্মান-অসম্মানের পরোয়া তার থাকে না। ইশ্‌ক হলো পাগলামির হালত। আশেক কী চায়? চায় আমার ইচ্ছা পূরণ হোক। তার ইচ্ছা তাকে পরাভূত করে দেয়। তাই সে অনুযোগ করে বলে–

شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو

کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا

'মিলনের রাত খুব কম। আসমানকে বলো,

বিচ্ছেদের নামে আরেকটি রাত যেন সংযোজন করে দেয়।'

আশেক চায়, মিলনের রাত যেন দীর্ঘ হয়। কারণ, সে তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পুরা করতে চায়। মহব্বতের মধ্যে এমন অবস্থা হয় না। মহব্বতকারী আপদমস্তক আনুগত্যকারী হয়। মাহবুব খুশি হলে সেও খুশি হয়। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির সন্তুষ্টিতেই তার সন্তুষ্টি নিহিত থাকে। মহব্বতের কাইফিয়ত হয় এমন–

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

'বিচ্ছেদও ভালো নয়; মিলনও ভালো নয়। বন্ধু যে-অবস্থায় রাখেন, সেটাই ভালো, তাতেই তৃপ্তি।'

তো যেহেতু মহব্বতের মধ্যে আদব বিজয়ী থাকে আর ইশ্‌কের মধ্যে কামনা বিজয়ী থাকে; এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মহব্বত শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মহব্বতের তীব্রতা

স্মরণ রাখবেন, সমস্ত মাখলুকের মোকাবেলায় মানুষের মর্যাদা ও সম্মান কেবল এই মহব্বতের তীব্রতার কারণেই হয়েছে। যদি এই মহব্বতের তীব্রতা না থাকে, তাহলে মানুষ ও জন্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আর সেই মহব্বতই আপনাদের এখানে টেনে এনেছে।

কল্যাণের ইচ্ছা

আল্লাহ যে আমাদের এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা কিছু না দিতে চাইতেন, তাহলে তলব করার যোগ্যতাই দিতেন না। যখন তিনি কারো মধ্যে তলবের যোগ্যতা দান করেন, তখন এর অর্থ হলো, তিনি প্রথমেই তাকে দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছেন।

অফিসার যখন কাউকে কিছু না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন কর্মচারীকে বলেন, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎই করতে চাই না। সে তাকে সাক্ষাতের সুযোগই দেয় না। কাজই যখন করবে না; দেওয়াও কিছু হবে না। বলে, তাকে তাড়িয়ে দাও। তো সাক্ষাতের সুযোগই যখন দেয় না, তখন এর অর্থ হলো, এর ব্যাপারে পূর্ব থেকেই না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যখন আমাদের এখানে পৌঁছিয়েই দিয়েছেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কল্যাণের ফয়সালা করেছেন। 'আলহামদুলিল্লাহ!

ইশ্‌কের পথে ব্যালেন্স রক্ষা করুন

এপথে আমরা মহব্বত নিয়েও চলব এবং বিবেক-বুদ্ধি নিয়েও চলব। বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করব। আমি দেখেছি, কিছু লোক ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারে না। যেমন– যিকির-আযকারে মশগুল হলো তো এমন হলো যে, পরিবার-পরিজনকেই ভুলে গেল। অথবা সংসারের কাজে এমন মশগুল হলো যে, যিকির-আযকার ভুলে গেল।

এ-কারণে ইশ্‌ক ও বিবেক যদি এপথে এক সাথে চলে, তাহলে বান্দার আধ্যাত্মিক উড্ডয়ন খুব দ্রুত হয়।

আমি একথা বলি না যে, আপনি আপনার অফিস বন্ধ করে দিন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিন এবং এসে যিকির শিখুন। আমি তো বলি, শুধু আপনার অবসর সময়টুকু বের করে নিন। আর এটা কোনো কঠিন কাজও নয়। এই অবসরটুকু তো আপনাকে কোথাও না কোথাও কাটাতেই হবে। কেউ এ-সময় টিভির পর্দার সামনে বসে যায়, কেউ সংবাদপত্রে ডুবে যায়, কেউ সেলফোন নিয়ে গল্পে লিপ্ত হয়। আমি বলি, আপনি এ-সময়টুকু আল্লাহর যিকির ও ধ্যানে কাটান।

এটা সেলফোন নয়– হেলফোন (হেল অর্থ নরক)

সেলফোন তো নয় এ যেন আজব এক হেলফোন। লোকেরা একে সেলফোন বলে; কিন্তু আমি এর নাম দিয়েছি হেলফোন (দোযখের ফোন) কারণ, এর অধিকাংশ কল এমন হয়, যা বান্দাকে দোযখ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছাড়ে। আমি একাধিকবার লক্ষ করেছি, কথা হলো দু-মিনিটের; অথচ আধা ঘণ্টার পূর্বে ফোনই রাখছে না! অপর দিকের ব্যক্তিটি বলছেও, ঠিক আছে জনাব, ঠিক আছে; ওকে-ওকে; সে বুঝতে পারছে, সে জান বাঁচাতে চাচ্ছে, কিন্তু আমরা ফোন রাখছিই না! খুব নির্ভাবনায় বসে কথা চালিয়ে যাচ্ছি। বহিঃবিশ্বের লোকেরা তো বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কার্ড খতম না হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফোন বন্ধ হতে পারে না। এবার অপর দিকের লোকটির চাই নামাযের তাকবীরে উলা ছুটে যাক তাতে কোনো পরোয়া নেই।

আরে ভাই! সেলফোনকে সেলফোনের সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। আমাদের ফারেগ সময়গুলো টেলিফোনে কথা বলে, সংবাদপত্র পড়ে আর টিভি দেখে কাটানোর জন্যে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণের জন্য। বলুন, অবসর সময় কীসের জন্যে? আল্লাহর স্মরণের জন্যেই তো।

তাহাজ্জুদ পড়া নসিব হবে যেভাবে

আপনি রাতের বেলা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন। ঈশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস গড়ুন। দেখবেন, তাহাজ্জুদে ওঠা সহজ হয়ে যাবে। যদি আপনি ঘুমানোই একটা-দুটার সময়, তাহলে তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা ফজরের নামাযও ঠিকমতো পড়তে পারবেন না। আর আজকাল প্রায় সবারই এ-অবস্থা চলছে। শয়তান এত খারাপ যে, সে নিয়ত করাবে তাহাজ্জুদের; অথচ শোওয়াবে রাত দুটার সময়। সে তো জানেই, যার ক্লান্ত শরীর ঘুমাবে রাত দুটার সময়, তার অন্তর আশা করে কী করবে? চোখই তো খুলতে পারবে না ঘুমের চাপে! আমার তো মনে হয়, কিছু লোক জাগ্রতই হয় ঈশার পর। তাদের দিন শুরুই হয় রাতের বেলা। এ-সময় তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে ঘুরতে বের হয়।

বিজাতীয় অভ্যাস

এই যে বাইরে ঘোরা এটাও একটা মারাত্মক মুসিবত। আমাদের মাশায়েখদের কারো এই অভ্যাস ছিল না। স্ত্রীদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া

এটা ফাসেকদের অভ্যাস, বিজাতিদের কালচার। আফসোস, আজ মুসলমানের সন্তানরা সেই অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আপনি বাইরের কিছু খেতে চাচ্ছেন, সেটা ঘরে নিয়ে আসুন। তারপর ঘরেই বসে খান। বেগানা পুরুষদের সামনে স্ত্রীদের নিয়ে খাওয়াদাওয়া করা এটা কোন ধরনের ভদ্রতা।

তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কারণে তাহাজ্জুদ নসিব হবে

ঈশার পর দিন নয়, রাত শুরু হয়। এ-কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশার পূর্বে ঘুমানোকে আর ঈশার পর অনর্থক কথাবার্তায় সময় কাটানোকে অপছন্দ করতেন। তবে যদি কোনো দীনি মজলিস হয়, তবে সেটা ভিন্ন কথা। এখানে উদ্দেশ্য হলো দীন। দীনি উদ্দেশ্যে জাগ্রত থাকতে পারে। তবে সাধারণত এ অভ্যাসই রাখা উচিত যে, ঈশার পর তাড়াতাড়ি শুয়ে যাব। এটি একটি সুন্নত আমল। এতে তাহাজ্জুদের মতো আরেকটি সুন্নতের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে। যদি ঈশার পর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর সুন্নতের ওপর আমল ছেড়ে দেন, তাহলে তাহাজ্জুদের নেয়ামত এমনিতেই ছুটে যাবে।

সারা রাত জেগে ইবাদত

তারা ছিলেন ভিন্ন ধরনের লোক, যারা আল্লাহর স্মরণে সারা রাত পার করে দিতেন। আমাদের শরীরে তো এত শক্তি নেই। ঘুম পুরা না হলে তো আমরা নামাযে ঠিকমতো শব্দও উচ্চারণ করতে পারি না। আল্লাহর ওইসব বান্দা, যারা রাত জেগে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন, তাদের জীবন বড় বিস্ময়কর ছিল!

পাগলি রায়হানার ব্যাপারে শোনা যায়, সে তাহাজ্জুদের সময় জেগে একটি কবিতা বলত, যার একাংশ এমন-

چاہنے والی اپنے پیارے کی طرف جارہی ہے

'আশেকরা তাদের প্রেমাভিসারে ছুটে চলছে।'

এরপর উজু করে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেত এবং সাহরির শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকত।

সে বক্তা আবূ আমের-এর খাদেমা ছিল। তিনি বলেন, সে আমাকে একদিন কথায়-কথায় বলল, আমার জন্য তো বারো মাসই সমান; দিনে রোযা রাখি আর রাতে আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকি।

স্বাদের সঙ্গে পরিচয়

এখানে আমি আপনাদের একটি সূক্ষ্ম বিষয় বলব, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন; উপকার হবে। আপনি পাথরের ওপর পানি ঢালুন। সে পানি তো চুষে নেবে; কিন্তু স্বাদ ও মজার অনুভূতি তার হবে না। কিন্তু মুখে মিষ্টি শরবত ঢালুন; জিহবা তা চুষেও নেবে; সঙ্গে-সঙ্গে মজাও অনুভব করবে। কারণ কী? কারণ হলো, জিহবা জীবিত আর পাথর মৃত। এমনিভাবে কিছু মানুষ আছে, যাদের অন্তর পাথরের মতো। তারা নামায তো পড়ে নেয়, কেরাতের শব্দ উচ্চারণ তো করে; কিন্তু তার স্বাদ পায় না। পক্ষান্তরে কিছু লোকের অন্তর হয় জীবিত। যখন তাদের মুখ থেকে কেরাতের শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন তা থেকে তাদের অন্তরও মজা অনুভব করে।

এক মালিক তার দাসিকে বলল, বিছানা ঠিক করো। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি কোনো প্রভু আছেন? সে বলল, হাঁ; আছেন। দাসি বলল, আপনার প্রভু কি ঘুমান? সে বলল, না, তিনি ঘুমান না। দাসি বলল, এ তো বড়ই লজ্জার কথা যে, প্রভু জেগে আছেন আর গোলাম ঘুমাচ্ছে! আল্লাহর সঙ্গে প্রেমও করবে আবার তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়েও থাকবে এটা কেমন প্রেম? এজন্যে প্রত্যেক সাধক সবসময় কাঁদবে এবং আল্লাহর কাছে চাইবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার প্রিয় বান্দাদের প্রিয় মুহূর্তে আপনার সম্মুখে হাজিরি দেওয়া হতে বঞ্চিত করবেন না।

নামায বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যম

যখন আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে আসবে, তখন এই নেয়ামত খুব সহজেই আপনার ভাগ্যে জুটবে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! এ কথাটি খুব মনোযোগসহ শুনুন! নামাযকে যুগের বিচারকের সামনে মসিবত মনে করে পড়বেন না; বরং বন্ধুর সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ মনে করে পড়বেন। এটা বিচারকের কাঠগড়া নয়; এটা তো বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উসিলা। যখন এই উসিলার মাধ্যমে বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব, তখন তাহাজ্জুদের সময় আমাদের জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর ভালোবাসা নিশ্চিতকারী আমলসমূহ

আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে ইরশাদ করেন–

'যারা আমার জন্য পরস্পর ভালোবাসা রাখবে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর ওয়াজিব করে নিলাম।'

অন্যত্র ইরশাদ করেন, 'আমার জন্য আমার পথে সম্পদ ব্যয়কারীর জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব।'

অন্যত্র বলেন, যারা আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব।

আসুন, আমরা আল্লাহর ভালোবাসা নিশ্চিতকারী আমলগুলো পালন করি এবং আমলের স্বাদ গ্রহণ করি।

বান্দার আলোচনা কীভাবে স্থায়িত্ব পায়

একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, জনাব! কিছু লোক দুনিয়াতে খুব প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু মৃত্যুর পর তার আলোচনাই শেষ হয়ে যায়; কেউ তার কথা আলোচনা করে না। আবার কিছু লোক এমনও আছে, যারা জীবদ্দশায় খুব একটা প্রসিদ্ধ ছিল না; কিন্তু মৃত্যুর পর তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি বেড়ে যায়। এর কারণ কী? তো এক আল্লাহওয়ালা উত্তর দিলেন, দেখো, আল্লাহ তা'আলার গুণাগুণ চিরস্থায়ী। তাই যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর আখলাক নিজের মধ্যে ধারণ করে আল্লাহর গুণগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে, তো সে মারা গেলেও আল্লাহর গুণগুলো যেহেতু চিরস্থায়ী সেই সুবাদে আল্লাহর গুণের সঙ্গে-সঙ্গে তার নামের স্থায়িত্বও সংরক্ষণ করেন। সুবহানাল্লাহ! কী সুন্দর উত্তর! যখন অন্তরে মহব্বত থাকে, মস্তিষ্কও তখন কাজ করে এবং বান্দার মধ্যে দূরদর্শিতা তৈরি হয়ে যায়।

তোমার মধ্যে নেসবতের নূর আছে

আবুবকর ওররাক (রহ.) একবার মাহফিলে বললেন,

চারটি বস্তু পাওয়া অসম্ভব। এক ছাত্র বলল, সেগুলো কী-কী?

ওস্তাদ বললেন,

এক. হালাল লোকমা।

দুই. মুখলিস বন্ধু।

তিন. রিয়ামুক্ত ইবাদত।

চার. লালসামুক্ত আলেম।

এই চারটি নেয়ামত কোথাও পাওয়া যায় না।

ছাত্র উত্তর দিল, হযরত! আমি এ চারটি বস্তু লাভ করেছি। ওস্তাদ তার কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এই বস্তুগুলো কীভাবে লাভ করেছ?

উত্তরে ছাত্র বলল,

এক. আমি ক্রোধের ঢোক পান করে ফেলি। এটা হালাল লোকমার মতো।

দুই. আমি কুরআনকে আমার বন্ধু বানিয়ে নিয়েছি। এটি দুনিয়াতে আমার সবচেয়ে মুখলিস ও নিষ্ঠাবান বন্ধু।

তিন. আমি নিয়মিত মুরাকাবা করি। এটি রিয়ামুক্ত ইবাদত।

চার. আমি আল্লাহকে ভালোবেসেছি। কারণ, আল্লাহ এমন আলেম, যার মধ্যে কোনো লোভলালসা নেই। তিনি এমন আলেম, যিনি মাখলুকের কোনো সম্পদের লোভ করেন না।

ওস্তাদ এই উত্তর শুনে খুশি হয়ে ছাত্রকে ওই মজলিসেই খেলাফত ও ইযাজত দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মধ্যে নেসবতের নূর রয়েছে। সেই নেসবতই বাতেনি মারেফতকে তোমার মুখ থেকে বের করছে।

কোমল হওয়ার দীক্ষা

কুরআনে আছে, যখন আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)কে আদেশ দিলেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

'আপনি ফেরাউনের নিকট যান; সে আবাধ্য হয়ে গেছে।'[১]

তখন একথাও বলেছেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

'আপনি তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলবেন।'[২]

এখানে মুফাসসিরীনে কেরাম একটি বিস্ময়কর তত্ত্ব লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুককে এত ভালোবাসেন, এত মায়া করেন যে, ফেরাউনের মতো কাফের, যে নাকি 'আমিই তোমাদের বড় খোদা'-এর ঘোষণা দিয়েছিল। তার কাছে আল্লাহ নবী পাঠাচ্ছেন এবং বললেন, তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো। তাহলে বলুন, যে-বান্দা আল্লাহর সামনে সেজদায় মাথা রেখে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলে, তার প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা কী পরিমাণ হবে? সুবহানাল্লাহ!

---

১. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ১৭

২. সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৪

ভালোবাসা-ই কথা শেখায়

ভালোবাসা-ই মানুষকে কথা শিখিয়ে দেয়। কেননা, বান্দা যখন ভালোবাসার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন সে নিজে-নিজেই বলতে শুরু করে– কারো শেখানো লাগে না। যেমন– বনী ইসরাঈলের এক বৃদ্ধ বসে-বসে আনমনে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছিল, হে আল্লাহ! আমি শুনেছি আপনার স্ত্রী নেই, ছেলেপুলে নেই। আপনি একটা কাজ করুন। আমার কাছে চলে আসুন। আমিই আপনার সেবা করব। আপনাকে খাওয়াব, পরাব, গোসল করিয়ে মাথায় তেল লাগিয়ে দেব, চুল আঁচড়ে দেব।

হযরত মুসা (আ.) ঘটনাক্রমে সেপথে যাচ্ছিলেন। এদৃশ্য দেখে তাকে সতর্ক করে বললেন, এই বৃদ্ধ! এভাবে আল্লাহর শানে কথা বলা আদবের খেলাফ। সেই বেচারা তো এসব ভালোবাসার টানে বলছিল। পয়গম্বরের কথা শুনে খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যখন হযরত মুসা (আ.) কিছু সামনে এগিয়ে গেলেন, তার প্রতি আসমান হতে ওহী অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ বললেন, হে আমার প্রিয় নবী!

تو برائے وصل کردن آمدی

نہ برائے فصل کردن آمدی

'আপনি তো সম্পর্ক জোড়া দিতে এসেছেন; সম্পর্ক ভাঙতে নয়।'

অর্থাৎ– আপনি নবী। আপনার কাজ আমার সঙ্গে আমার বান্দার সম্পর্ক গড়ে দেবেন। এই বান্দা তো এসব আমার ভালোবাসায় বলছিল। আপনি তার কথাগুলো তো শুনলেন; হৃদয়ের উত্তাপটা অনুভব করলেন না?

একটি বিস্ময়কর কথা

ওলামায়ে কেরাম এ-ঘটনার প্রেক্ষিতে লিখেছেন, যে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে এমনসব কথাবার্তা বলে, যেগুলো তার শানের খেলাফ ও আদবের পরিপন্থি, কিন্তু বলছে, মহব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে, তো মহব্বতের কারণে খেলাফে শান কথাবার্তাকে যদি আল্লাহ এত পছন্দ করেন, তাহলে যে-কথাগুলো মহব্বতের সাথে-সাথে তার শান অনুযায়ী হবে, তাকে তিনি কী পরিমাণ পছন্দ করবেন! এ-কারণেই যেখানে আল্লাহর ভালোবাসার কথা চলে, সে সব মজলিসে

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

'তাদের ওপর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল হয়।'

তাদের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা নেমেন আসেন। আল্লাহর রহমত তাদের ওপর অবারিতভাবে বর্ষিত হতে থাকে। যতক্ষণ মজলিস চলতে থাকে, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টনি দিয়ে রাখেন। এরপর যখন তারা আসমানে ফিরে যান, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? অথচ আল্লাহ তা জানেন। তারা তখন মজলিসের কথা বলেন। আল্লাহ উত্তরে বলেন, হে ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো; আমি এই সকল বান্দার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ! এরা তো মজলিসে অংশগ্রহণকারী বান্দা; ক্ষমা পেয়ে গেল। কিন্তু এমন কিছু বান্দাও আছে, যারা মজলিসে অংশ গ্রহণ করেনি, তবে তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে, তাদের ব্যাপারে কী হুকুম?

তখন আল্লাহ বলেন–

هُمْ رِجَالٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

'আমার এ বান্দারা এত প্রিয় যে, তাদের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থানকারীও বঞ্চিত হবে না।'

মুহতারাম! যখন আল্লাহ তা'আলা তামাশার দর্শকদেরও ক্ষমা করে দেন, তাহলে যারা শত-শত মাইল পথ অতিক্রম করে এসব মজলিসে যোগদান করে, তাদের আল্লাহ ক্ষমা না করে কীভাবে থাকতে পারেন? অবশ্যই তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং একটি কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহ যখন আমাদের এখানে পৌঁছিয়েই দিয়েছেন, এতে স্পষ্ট প্রমাণ মিলে, আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা করেছেন।

এক বৃদ্ধের চমৎকার দু'আ

একবার সম্ভবত শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত ছিল। লোকেরা মসজিদে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল ছিল। কেউ নামায পড়ছে, কেউ দু'আ করছে। এই অধমের পাশে বসে এক বৃদ্ধ দু'আ করছিল। কিন্তু তার দু'আর ভাষা এত আজব ছিল যে, তার দু'আর বাক্যটি আমার রাতকে সার্থক করে দিল। লোকেরা বলে থাকে, তুমি আমার দিনটিকে সার্থক করে দিলে। আর আমি বলব, সে আমার রাতকে সার্থক করে দিল।

সে পাঞ্জাবি ভাষায় দু'আ করছিল–

اللہ! میاں! ہک واری جنت وچ وڑن دیویں، اگاں آپے لگا ویساں

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তত একবার জান্নাতে প্রবেশ করতে দিন; এরপর আমি নিজেই এগিয়ে যেতে পারব!'

আল্লাহু আকবার! সে তো ভালোবাসার টানে বলছিল কথাগুলো। ওয়াহ আল্লাহ! ওয়াহ! বৃদ্ধদের কথাও বড় আজীব লাগে!

একলা থাকা সে তো তোমাকেই মানায়

একব্যক্তির চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে; কিন্তু অন্তরটা ছিল দুর্দান্ত যুবক। তার স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। এমন লোকদের জন্য দ্রুত বিবাহের সম্বন্ধ পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়। বেচারা খুব চেষ্টা করল; কিছুই হলো না। যেখানেই প্রস্তাব পাঠায়, সেখান থেকেই উত্তর আসে 'না'। একদিন সে উজু করে উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলল–

اللہ! کلا تاں تو ہی چنگا لگنا ایں اے

اے اللہ! اکیلا تو، تو ہی اچھا لگتا ہے

'হে আল্লাহ! একলা থাকা তো তোমাকেই মানায়।'

অর্থাৎ– আমাকে একলা রেখে কী লাভ? কোনো জোড়া মিলিয়ে দাও; একলা থাকা তো তোমার শান! সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তার দু'আ কবুল করে নিলেন এবং একদিন পরই তার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। বাস্তবিকই! আমি দেখেছি, যার বিবাহের ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছে, সে যদি নির্জনে আল্লাহকে বলে, 'আল্লাহ! একলা থাকা তো তোমাকেই মানায়', খুব শীঘ্রই তার বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

এক বৃদ্ধের বিস্ময়কর দু'আ

এক বৃদ্ধ ছিল। তাকে বলা হলো, দু'আ করো; কবুল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, দু'আ একটিই করবে; একাধিক নয়। এখন তার তো অনেক কিছুর প্রয়োজন– দীর্ঘ হায়াত, সুস্থতা, ধনসম্পদ ইত্যাদি। কিন্তু চাইতে হবে একটা; সব নয়। এবার বৃদ্ধ এমন একটি দু'আ করল যে, এতে তার সকল ইচ্ছা লুকায়িত ছিল। সে বলল- 'হে আল্লাহ! আমি যেন আমার নাতিকে স্বর্নের চামচ দিয়ে খেতে দেখি!'

দেখুন, সে সুস্থও হয়ে গেল, নাতি জন্ম লাভ করা পর্যন্ত হায়াতও পেয়ে গেল। নিঃসন্তান ছিল; সন্তানও পেয়ে গেল। তারপর এ-পরিমাণ ধনসম্পদও হলো যে, নিজের নাতিপুতিকে সোনার চামচ দিয়ে খেতেও দেখে নিল।

হৃদয়ের জানালা খুলে দাও

আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলি, নীরবে-নির্জনে বসে নিজের রবকে ডাকি, হৃদয়ের জানালা খুলে দিই, হৃদয় উজাড় করে তার কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাকে আপন করে নাও!

একটি চমৎকার কথা

একটি কবিতা! এটি এক নারী কবির কবিতা যদিও; কিন্তু কথার মর্মার্থ বড়ই চমৎকার। তিনি বলছেন–

اس شرط پہ کھیلوں گی پیا! پیار کی بازی
جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو میں تیری

'এক শর্তে তোমার সঙ্গে বাজি ধরতে রাজি আছি হে প্রিয়তম! যদি আমি জিতে যাই, তাহলে তুমি আমার হবে। আর যদি হেরে যাই, তাহলে আমি তোমার হব।'

বাহ! বাহ! প্রেম বলে কথা। প্রিয়তমকে কাছে চাই-ই চাই।

একটি প্রেমভরা দু'আ

এক আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তিনি একটি দু'আ করলেন। প্রেমভরা দু'আর স্বাদই ভিন্ন! বললেন,

يَارَبِّ اَنْتَ تَعْلَمُ اِنِّيْ اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَاِنْ لَّمْ اَكُنْ صَالِحًا

'হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি নেককার লোকদের ভালোবাসি যদিও আমি নেককার নই।'

এবার দেখুন, ভালোবাসা কী ধরনের দু'আ করাচ্ছে! এসব কথা আমি আপনাদের সামনে এজন্য বলছি যে, আজ রাত যখন তাহাজ্জুদে উঠবেন, তখন আপনিও এভাবে প্রেমভরা দু'আ করবেন। দু'আ করার এক-দুটা ঢং যখন সামনে আসে, তখন মস্তিষ্ক আপনা-আপনি পরবর্তী কাজ শুরু করে দেয়।

বুযুর্গ পরে বলছেন–

وَيَارَبِّ اَنْتَ تَعْلَمُ اِنِّيْ اَكْرَهُ الْفَاسِقِيْنَ وَاِنْ كُنْتُ فَاسِقًا

'হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি ফাসেকদের ঘৃণা করি যদিও আমি ফাসেক, পাপী।'

তারপর বলছেন–

يَارَبِّ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ يَزِيْدُ فِيْ مُلْكِ شَيْئًا مَا سَئَلْتُكَ الْجَنَّةَ

'হে আমার রব! আমি যদি জানতাম, আমার জান্নাতে প্রবেশ করার দ্বারা আপনার বাদশাহিতে কোনো সমৃদ্ধি হবে, তা হলে আমি আপনার কাছে জান্নাত চাইতাম না।'

তারপর বললেন–

وَلَوْ اَعْلَمُ اَنَّ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ تَنْقُصُ فِيْ مُلْكِ شَيْئًا مَا سَئَلْتُكَ النَّجَاةَ مِنْهَا

'আর যদি জানতাম, আমার জাহান্নাম থেকে মুক্তি আপনার বাদশাহির মধ্যে কোনো ধরনের কমী করে দেবে, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে কখনো মুক্তি চাইতাম না।'

তারপর আরো মজার কথা বললেন–

يَارَبِّ اِنْ لَّمْ تَرْحَمْنِيْ اَنْتَ وَمَنْ يَرْحَمُنِيْ

'হে রব! আপনি যদি আমাকে দয়া না করেন, তবে আর কে দয়া করবে?'

এভাবে যখন বান্দা প্রেমভরা দু'আ করে, তখন আল্লাহর রহমত অবশ্যই তার দিকে ছুটে আসবে।

আরেকটি অপূর্ব দু'আ

ইমাম আসমায়ী (রহ.) বলেন, আমি একবার এক কবরস্তানে গিয়ে দেখি, সেখানে এক নারী একটি কবরের পাশে বসে বিস্ময়কর দু'আ করেছে। তার ভাষ্য ছিল এমন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ شَيْئٍ وَاِنَّكَ كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ شَيْئٍ وَاِنَّكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ فَاِنَّكَ يَا رَبِّ قَدْ خَلَقْتَنِيْ اَبَوَيَّ مِنْ قَبْلِيْ ثُمَّ خَلَقْتَنِيْ بَعْدَهُمَا فَاِنَّكَ اَنْسَتَنِيْ بِهِمَا مَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ فَكُنْ لَهُمَا رَاحِمًا وَكُنْ لِيْ بَعْدَهُمَا حَافِظًا

'হে আল্লাহ! আপনি সব কিছুর পূর্বে ছিলেন এবং সব কিছু ধ্বংস হওয়ার পরও থাকবেন। আপনি সকল বস্তুর স্রষ্টা। হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বে আমার পিতামাতাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আমাকে সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনিই আমার অন্তরে তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তারা এখন আপনার কাছে। আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন আর আমাকে হেফাযত করুন।

ইমাম আসমায়ী (রহ.) বলেন, আমি তার মুখে এ দু'আ শুনে খুব বিস্মিত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কথায় দারুন শক্তি আছে। সে আমাকে উত্তর দিল, আল্লাহর পানাহ, আপনি আমার জন্য বেগানা। আমার সঙ্গে এতটা নির্দ্বিধায় কথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, তার কথা শুনে আমি খুব লজ্জিত হলাম এবং তৎক্ষণাৎ বহুদূর চলে গেলাম।

তো দেখুন, আল্লাহপ্রেমীরা আল্লাহর সঙ্গে কী ধরনের কথাবার্তা বলেন! আমাদের ভাগ্যেও যদি আল্লাহর এমন ভালোবাসা নসিব হয়ে যায়, তাহলে আমরাও দু'আ করা শিখে যাব। আর যে চাওয়ার মতো চাইতে জানে আল্লাহ তার আঁচল ভরে দেন।

বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের আদব

দুনিয়ার নিয়ম হলো, বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে লোকেরা সুগন্ধি ব্যবহার করে। নতুন বউ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে সুগন্ধি লাগায়। দুলাও তার নতুন বউয়ের কাছে যেতে সুগন্ধি মাখে। বন্ধুরাও বড় কারো অফিসে যেতে সুগন্ধি মেখে যায়। তো নেক আমল ও সুগন্ধির দুনিয়াতে আমাদেরও বেশি-বেশি নেক আমল করা উচিত। এটা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে সুগন্ধি লাগানোর মতো। নতুন বউকে কেন সাজানো হয়? কারণ হলো, যেন প্রথম সাক্ষাতেই তাকে ভালো লেগে যায়, স্বামী তাকে পছন্দ করে। নতুন বউকে যদি ভালো লাগার জন্য সাজানো হয়, তাহলে আমাদের উচিত, নামাযের একাগ্রতা ধীরতা ও স্থিরতা দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে আল্লাহর সামনে যাই। কারণ, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নজর সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের ওপর পড়বে। তাই নামায আমরা খুব শান্ত হয়ে একাগ্রতার সাথে পড়ব, যেন কেয়ামতে আমাদের নামাযকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

বন্ধুরা আমার! বুকে হাত রেখে বলুন, এমন দু-রাকাত নামায কি কখনো আমরা পড়েছি? আসুন, আজই নিয়ত করুন, আমরা তাহাজ্জুদে উঠব এবং

ধীর-স্থির হয়ে একাগ্রতার সাথে দু-রাকাত নামায পড়ব। যতক্ষণ নামাযে থাকব, একটা মুহূর্তের জন্যও মনকে এদিক-সেদিক যেতে দেব না।

বান্দার প্রতি আল্লাহর অভিযোগ

এক কিতাবে একটি আজিব কথা পড়েছি। তাতে লিখা ছিল, আল্লাহ বলেন–

عَبْدِىْ قَدْ طَهَّرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِيْنَ

'হে আমার বান্দা! তুমি মাখলুককে দেখানোর জন্য বছরের-পর-বছর চেহারা সাজিয়েছ।'

فَهَلْ طَهَّرْتَ مَنْظَرِىْ سَاعَةً

'আমার জন্য কী কখনো নিজেকে সাজিয়েছ?'

একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ বলছেন, বান্দা আমার! তুমি মানুষকে দেখানোর জন্য বছরের-পর-বছর নিজেকে সাজিয়েছ।

স্ত্রীরা বিউটি পার্লারে গিয়ে স্বামীর জন্য ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সাজে।

স্বামী তার স্ত্রীর জন্য গোসল করে সুগন্ধি লাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

লোকেরা তার অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলে সাজসজ্জা করে।

আমরা মেহমানের আগমন-সংবাদ শুনলে ভালো পোশাক পরে সাজি।

কোনো অনুষ্ঠানে যেতে হলে তখনও সাজসজ্জার পাবন্দি করি।

অথচ আল্লাহ বলছেন–

عَبْدِىْ قَدْ طَهَّرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِيْنَ

'আমার জন্যও কী কখনো সেজেছ বান্দা!'

যদি তুমি ইখলাসের সাথে উজু করতে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে তোমার গুনাহগুলোও ধুয়ে যেত। চেহারায় পানি পড়তেই চেহারার গুনাহগুলো ধুয়ে যেত। উজু শেষ করতেই তোমার পুরা শরীর পাক হয়ে যেত। এরপর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে তাওবার নিয়ত করতে, আমার সামনে যখন সেজদায় মাথা রাখতে, তাহলে আমার রহমতে তুমি সিক্ত হতে, তোমার হৃদয় পাক হয়ে যেত।

فَهَلْ طَهَّرْتَ مَنْظَرِیْ سَاعَةً

'হে বান্দা আমার! তুমি কি কখনো আমার জন্য সেজেছ?'

যদি আল্লাহ আমাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা তো নিজেদের সূফী বলে বাহবা কুড়িয়েছ। বলো তো, এমন ইখলাস নিয়ে কখনো দু-রাকাত নামায পড়েছ? কখনো মুসল্লায় দাঁড়ানোর সময় এ কল্পনা করেছ যে, হাঁ; আমি আমার আল্লাহর সামনে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এমন অনুভূতি নিয়ে সম্ভবত আমরা কখনো নামাযই পড়িনি। যদি কখনো পড়ে না থাকেন, তাহলে আজ রাতে তাহাজ্জুদে উঠুন এবং স্বীয় প্রভুকে বলুন–

'হে আল্লাহ! এই শরীরটা আমি মাখলুকের জন্য শতবার সাজিয়েছি। উচিত ছিল, একে তোমার জন্য সাজাব; কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি। আজ আমি তাকবীরে তাহরীমাহ 'আল্লাহু আকবার' বলে দুনিয়ার সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার দরবারে দাঁড়িয়েছি। প্রভু দয়াময়! আমি আপনার ভালোবাসা পাওয়ার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়েছি। আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়েছি। এই ভিক্ষার ঝুলি আপনার সামনে মেলে ধরলাম। আপনি আমাদের ঝুলি ভরে দিন। আমরা আপনার কাছে আপনাকে চাচ্ছি। আল্লাহ! আপনাকে ছাড়া এ-জীবনের মূল্যইবা কী? আপনাকে ছাড়া এ-জীবনের স্বাদই বা কোথায়?

যখন এভাবে আল্লাহর কাছে চাইবেন, তখন আল্লাহ রব্বুল ইযযতের দয়ার সাগরে জোশ এসে যাবে। তিনি আমাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করে দেবেন এবং আপন নূর দিয়ে হৃদয়কে আলোকিত করে দেবেন।

میں جو بھولوں تجھے تو مر جاؤں
تیرا پہرہ ہو میری سانسوں پر
کسی کو معلوم کہ جان کب نکلی؟
محو تھے ہم تو یاد جاناں میں

আমি যখনই তোমাকে ভুলে যাব, আমার প্রাণ বের হয়ে যাক
আমার নিঃশ্বাসের ওপর তোমার প্রহরা হোক।
কে জানে, কখন প্রাণ বের হয়ে গেছে
আমরা তো প্রিয়তমের স্মরণের বিভোর ছিলাম।

আল্লাহ আমাদেরও এমন স্মরণ দান করুন, যেন প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার বিষয়টি টেরও না পাই। আমীন।

আল্লাহকে মানিয়ে নাও

আজ স্বীয় প্রভুর সঙ্গে পাক্কা তাওবা করে তাকে মানিয়ে নিন। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের পাপের দ্বারা আল্লাহকে কেবল অসন্তুষ্টই করেছি। এখন তাকে মানানো প্রয়োজন। বন্ধুকে পাওয়ার জন্য লোকেরা অনুনয়বিনয় করে। আজ আমরাও আমাদের প্রভুর সামনে সেজদায় পড়ে আত্মসমর্পণ করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার সামনে লুটিয়ে পড়েছি, আপনার কুদরতি পায়ে পড়েছি। হে আল্লাহ! আজ আমাদের সেজদা অবশ্যই কবুল করে নিন। আপনার দরজা থেকে আমাদের খালিহাতে ফিরিয়ে দেবেন না। হে রব্বে কারীম! আমাদেরকে শূন্য হাতে তাড়িয়ে দিয়েন না। হে আমার মাওলা! আজ বুঝতে পারছি, আমরা পাপী। আপনাকে মানাতে চাচ্ছি, অনুনয়বিনয় করে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছি। বছরের-পর-বছর আমরা গুনাহের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের অন্তরে আপনার মহব্বত ঢেলে দিন। হে আল্লাহ! এই অন্তর কবে পরিষ্কার হবে? অন্তরের এসব নাপাকি কবে দূর হবে? আমরা এই নাপাক অবস্থায় কেয়ামতের দিন আপনার সামনে দাঁড়াতে চাই না। আমাদের গুনাহগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের অপরাধগুলো স্বীকার করছি। আমরা কবীরা গুনাহ করেছি। বড়-বড় পাপ করেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনার দরবারে আজ আমরা অপরাধী হয়ে আত্মসমর্পণ করেছি; আমাদের প্রতি করুণা করুন। হে আল্লাহ! দুনিয়ার মানুষের কাছে যদি করুণার দরখাস্ত করা হয়, তখন দুনিয়াদারও রহমদিল হয়ে যায়। আপনি তো সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহশীল। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন। এই মজলিসে যত নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে ক্ষমা করে নিন।

প্রভু গো! ফেরাউনের মতো কট্টর কাফেরের সঙ্গে নরম আচরণের কথা যদি আপনি আপনার নবীকে বলতে পারেন, যে নাকি নিজেকে বড় খোদা দাবি করেছে, আল্লাহ! আমরা 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা'-এর স্বীকারোক্তি দানকারী জামাত। আমাদের প্রতি কি দয়া করবেন না? হে পরওয়ারদেগার! আমাদের প্রতি নরম আচরণ করুন। আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! ভবিষ্যতের জন্য আপনিই আমাদের রক্ষক হয়ে যান। আমাদের

আপনার নিরাপত্তায় নিয়ে নিন। গুনাহের যিল্লতি থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমাদের সবাইকে আপনার আনুগত্যের মর্যাদায় ভূষিত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অনুপম সৌন্দর্য

'আল্লামা কুরতুবি (রহ.) লিখেছেন, আল্লাহ রব্বুল ইযযত তার প্রিয় হাবীবকে অনুপম সৌন্দর্য দান করেছেন। তবে সেই সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেননি।

ইমাম যুরকানি (রহ.) আল্লামা কুরতুবি (রহ.)-এর কথা নকল করে বলেন–

لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِاَنَّهٗ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهٖ لَمَا اَطَاقَتْ اَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهٗ

'আমাদের সম্মুখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, তা যদি পূর্ণ প্রকাশ করা হতো, তাহলে তা দেখার পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের চোখগুলোর থাকত না।'

অনুপম সৌন্দর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

সারা পৃথিবীর মাহবুব

উভয় জাহানের সরদার, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমাদ মুযতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সারা পৃথিবীর প্রিয় মানুষ বা মাহবুবে কুল। তিনি স্রষ্ঠারও প্রিয়, সৃষ্টিরও প্রিয়। অর্থাৎ– উদ্ভিদ, প্রাণী সব কিছুর মাহবুব তথা প্রিয়।

যেমন– তিনি অনুদ্ভিদ পদার্থেরও প্রিয় ছিলেন। তাঁরই ভাষ্য–

اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ

'উহুদ এমন এক পাহাড়, যে আমাদের ভালোবাসে; আমরাও তাকে ভালোবাসি।'

তিনি উদ্ভিদেরও প্রিয় ছিলেন। যেমন– মসজিদে নববীর 'হান্নানাহ' নামক একটি খুঁটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদে কেঁদেছিল, যার কান্নার শব্দ উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেয়েছিলেন।

তিনি প্রাণীদেরও প্রিয় ছিলেন। যেমন– হাজ্জাতুল বিদা তথা বিদায় হজে নবীজি যখন 'আল-বিদা' নামক স্থানে কুরবানি করেছিলেন, তখন উটগুলোকে যখন আনা হলো, তখন উটেরা প্রতিযোগিতা করে নিজেদের গর্দানগুলো নবীজির সামনে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিল যেন তাকেই প্রথম কুরবানি করা হয়।

তিনি মানুষেরও প্রিয় ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের গোটা জামাত ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিক জামাত।

তিনি জিন জাতিরও প্রিয় ছিলেন। জিনেরা এসে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আশেকীনে রাসূলের দলভুক্ত হয়েছিল।

তিনি ফেরেশতাদেরও প্রিয় ছিলেন। আসমানে হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) নবীজির আশেক ও সঙ্গী ছিলেন।

এভাবে সমস্ত মাখলুকের প্রসঙ্গ তো শেষ হলো। উদ্ভিদ, অনুদ্ভিদ, প্রাণী জীব, মানুষ, জীন ও ফেরেশতা সবাই নবীজিকে ভালোবাসত। এবার বাকি আছে স্বয়ং মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযতের পবিত্র সত্তা। তো তিনিও ঘোষণা করছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার প্রিয়। তিনি যখন আল্লাহরও প্রিয় হলেন, তাহলে আল্লাহর সমস্ত মাখলুকের নিকটও প্রিয় হয়ে গেলেন। সেই অর্থে তিনি বিশ্ব মাহবুব।

নবীজির প্রতি ভালোবাসা বাড়ানোর পদ্ধতি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা সম্পর্কে যে-পরিমাণ ইল্‌ম থাকবে, তাঁর প্রতি ততই ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে। এ-কারণে মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ-না সে নবীজিকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে বেশি ভালোবাসবে। হাদীছে এসেছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও অন্যান্যদের থেকে বেশি প্রিয় না হব।'

সেই ভালোবাসা বৃদ্ধি করার জন্য আজ নবীজির জীবন আলোচনা করব।

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟
کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لئے

'হে খোদা, মুখে এবার নাম এল যে, আমার কথা আমার জিহবাকে চুমু দিল। প্রিয়জনের নাম মুখে উচ্চারণ করলে বড়ই মধুর লাগে।

فیض چشم حضور کیا کہنا
ساغر دل چھلک چھلک جائے

نام پاک ان کا ہو؟ لیوں سے ادا

شہد گویا ٹپک ٹپک جائے

'হে সাগের! হুজুরের ফয়েজের কথা কী আর বলব? হৃদয়টা উথলে ওঠে। তার পবিত্র নাম যখন মুখে উচ্চারিত হয়, তখন মনে হয় বুঝি মধুর ফোঁটা টপকে পড়ছে।

কেউ-কেউ তো এমনও বলে দিল–

ہزار بار بشویم دہن بمشک وگلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست

'আমি হাজারবার মুখকে মেশক ও গোলা দিয়ে যদি ধুয়ে নিই, তবুও মনে হবে, (হে আমার হাবীব) আপনার নাম মোবারক মুখে উচ্চারণ করা বেয়াদবি।

অনুপম রূপ-সৌন্দর্য

আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাঁর প্রিয় হাবীবকে এমন রূপ দান করেছেন, যার কোনো তুলনা দুনিয়ায় হতে পারে না।

رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیا ٹھہرے

حسینوں میں حسیں ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے

হাশেমী রাসূল। তিনি তো শেষ নবী হিসেবে সম্মান লাভ করলেন। সুন্দরদের মাঝেও এমন সৌন্দর্য লাভ করলেন যে, স্বয়ং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হয়ে গেলেন।

আল্লামা কুরতুবি (রহ.)-এর উক্তি

আল্লামা কুরতুবি (রহ.) লিখেছেন, 'আল্লাহ রব্বুল ইযযত তার প্রিয় হাবীবকে অনুপম সৌন্দর্য দান করেছেন। তবে সেই সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেননি।

ইমাম যুরকানি (রহ.) আল্লামা কুরতুবি (রহ.)-এর কথা উদ্ধৃত করেন–

لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامَ حُسْنِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهٗ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامَ حُسْنِهٖ لَمَا اَطَاقَتْ اَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهٗ

'আমাদের সম্মুখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, তা যদি পূর্ণ প্রকাশ করা হতো, তাহলে তা দেখার পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের চোখগুলোর থাকত না। এ-কারণে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের সৌন্দর্যকে কম করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই কম সৌন্দর্যকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করাও খুব কষ্টসাধ্য কাজ-

جمال وحسن کی الفاظ میں بعبیر ناممکن
مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن

'তাঁর সৌন্দর্য ও রূপের শাব্দিক ব্যাখ্যা দিতে চাইলে তা অসম্ভব। আলোর দেহের ছবি যদি আঁকতে চায়, তা অসম্ভব।

অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনার উদ্দেশ্য

আজকের এই মাহফিলে অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনার দুটি উদ্দেশ্য আছে, এক উদ্দেশ্য হলো-

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

'প্রিয়তমের আলোচনা, তার সাক্ষাতের চেয়ে কম নয়। অর্থাৎ– যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা হবে, তো এ যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে স্বাদ অনেকটা এমনই।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, আমাদের অন্তর যখন নবীজির সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে, তখন দুনিয়ার সুন্দরীদের সৌন্দর্য আমাদের চোখে ম্লান হয়ে যাবে। এরপর অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য উৎসর্গ হবে।

کوئی لغزش نہ ہو جائے الٰہی اس سے ڈرتا ہوں
بھروسے پر ترے اس کام کا آغاز کرتا ہوں

'হে প্রভু! এ কাজে হাত দিতে ভয় লাগে পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়। তোমার ওপর ভরসা রেখে এ কাজের সূচনা করছি।'

অনুপম সৌন্দর্য সাহাবাদের দৃষ্টিতে

হালীমা সা'দিয়ার দৃষ্টিতে : হালিমা সা'দিয়া বলেন, যখন এই শিশুটিকে নেওয়ার জন্য আমি তাঁর ঘরে গেলাম, তখন সে আরাম করছিল। তাঁকে

একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তার রূপ-সৌন্দর্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম পাছে তার চোখ খুলে না যায়। আমি খুব ধীরে-ধীরে তার কাছে গেলাম। নিজের অজান্তেই আমার হাত তাঁর বুকের ওপর রাখি। সে মুচকি হেসে আমার দিকে চোখ মেলে তাকাল। আমি দেখে আশ্চর্য হলাম, তার চোখ থেকে এমন নূর বের হলো যে, সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত সব কিছু আলোকিত হয়ে গেল।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) বলেন–

وَلَمَّا دَخَلْتُ بِهٖ اِلٰى مَنْزِلِىْ لَمْ يَبْقَ مَنْزِلٌ مِّنْ مَنَازِلِ بَنِىْ سَعْدٍ اِلَّا شَمَمْنَا مِنْهُ رِيْحَ الْمِسْكِ

'যখন এই শিশুটিকে নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন পুরো ঘর একটি মনোমুগ্ধকর সুবাসে ভরে গেল। বনু সা'দের এমন কোনো পরিবার বাকি ছিল না, যারা এর সুবাস নিতে আমার ঘরে আসেনি। সুবহানাল্লাহ! নবীজির গায়ের সুবাস গোটা কবিলায় ছড়িয়ে গিয়েছিল।

যুবাইর ইবনে মুতঈম-এর দৃষ্টিতে : সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজ-নিজ ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু নিজস্ব স্টাইল আছে। একেকজন একেক বস্তু দিয়ে উদাহরণ পেশ করে থাকেন। যুবাইর ইবনে মুতইম (রাযি.) হলেন সেই সাহাবি, যার ব্যাপারে নবীজি ইরশাদ করেন–

اِنَّ بِمَكَّةَ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ اَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ وَاَرْغَبُ لَهُمْ فِى الْاِسْلَامِ

'কুরাইশের চার ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের ব্যাপারে আমার ইচ্ছা, তারা ইসলাম কবুল করে নিক। তাদের মধ্যে হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈমও ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধের পর স্বীয় গোত্রের কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিলেন। তখন তাকে লক্ষ করে নবীজি ইরশাদ করলেন–

لَوْ كَانَ مُطْعِمٌ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهٗ

'যদি তোমার পিতা জীবিত থাকত এবং এই মৃত কাফেরদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলত, তবে আমি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিতাম।'

নবীজি মুতঈম-এর এতটা মর্যাদা কেন দেখালেন? তার কারণ ছিল, তিনি নবীজির ওপর দুটি অনুগ্রহ করেছিলেন। প্রথম অনুগ্রহ ছিল, কুরাইশরা যখন আবূ তালিবের হাবেলীতে মুসলমানদের আবদ্ধ করে সামাজিক বয়কট করেছিল, তখন সেই বয়কট ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে মুতঈমও

ছিল। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো, নবীজি যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরছিলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিল। তখন মুতঈম নবীজিকে নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার সুযোগ করে দিলেন।

এই দুটি অনুগ্রহের কারণে তিনি একথা বলেছিলেন। সেই যুবাইর বর্ণনা করেছেন–

اِلْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهٖ مِثْلِ شَقَّةِ الْقَمَرِ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দিকে তাকাতেন, তখন তার চেহারা মুবারক এমন উজ্জ্বল মনে হতো যেন চাঁদের টুকরা জ্বলজ্বল করে।

বারা ইবনে আযিব (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সমবয়সি ছিলেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে তাঁকে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। তিনি খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তার থেকে প্রায় ৩০০ হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য খুব মজা নিয়ে বর্ণনা করতেন। তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো–

اِنَّهٗ سُئِلَ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ: لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ.

আচ্ছা! বলো তো নবীজির চেহারা কি তরবারির মতো ঝকঝক করে? তিনি উত্তর দিলেন, না, না! তা তো চাঁদের মতো ঝকঝক করে।

এক সাহাবি তো চাঁদের টুকরা বললেন। অপরজন চাঁদের সঙ্গে উপমা দিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) ফকীহ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবীজি বলেন, আমার আয়েশা দীনের অর্ধেক। আরো বলেছেন, খাবারের মধ্যে 'সারীদ' যেমন, অন্যদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও তেমন। তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে মাজীদে পেশ করেন। তিনি বলছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ اِلَّا شَبَّهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

নবীজির চেহারা মোবারক সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর গায়ের রং সবচেয়ে আলোকিত। কোনো প্রশংসাকারী তাঁর প্রকৃত প্রশংসা

করতে পারবে না। তবে এতটুকু বলতে পারবে যে, তাঁর উপমা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সঙ্গে হতে পারে।

লক্ষ করুন, এক সাহাবি চাঁদের টুকরা বললেন। অপরজন বললেন, চাঁদের মতো। আর হযরত আয়েশাও বললেন, চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো।

হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : ইনি হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-এর মামা ছিলেন। হযরত খাদীজা (রাযি.)- এর প্রথম স্বামীর ঘরের সন্তান ছিলেন। নাম ছিল হিন্দ। যখন হযরত খাদিজার বিবাহ নবীজির সঙ্গে হলো, তখন তিনি নবীজির তত্ত্বধানে চলে এলেন। এমন সন্তানদের আরবি ভাষায় 'রবীব' বলা হয়। অর্থাৎ– স্ত্রীর প্রথম স্বামী থেকে আসা সন্তান। তো সম্পর্কে তো তিনি নবীজির ছেলে হয়ে গেলেন। এরপর হযরত খাদীজার ঘরে নবীজির আরো সন্তান জন্ম নিল। সেই হিসেবে তিনি হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর মা-শরীক ভাই ছিলেন। আর মায়ের ভাই যেহেতু মামা হয়, তাই হযরত হাসান (রাযি.) হিন্দ (রাযি.)কে মামা ডাকতেন। তো হযরত হাসান (রাযি.) বলতেন, আমার মামা হিন্দ ইবনে আবী হালাহ নবীজির রূপ-লাবণ্য খুব মজা করে বর্ণনা করতেন। আর আমিও চাই, তিনি আমার প্রিয় নানাজানের সৌন্দর্য আমার সামনে বর্ণনা করুন, যেন নানাজানের প্রতি আমার ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। তো তিনি একবার নবীজির সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেন–

يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

'নবীজির চেহারা এমন ঝলমল করত যে, মনে হতো চৌদ্দ তারিখের চাঁদ ঝলমল করছে।'

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযি.) একজন সাহাবি ছিলেন। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সময় ছিল রাত। আকাশে চৌদ্দ তারিখের চাঁদ ঝলমল করছিল। দৃশ্যটা এমন ছিল যে, একদিকে নবীজির নূরানি চেহারা, অপর দিকে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদ। এ-দৃশ্য দেখে তিনি বললেন,

فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ

আমি একবার নবীজির নূরানি চেহারা দেখছিলাম আরেকবার পূর্ণিমার চাঁদ। আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল, হে আল্লাহর হাবীব! আপনি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর।

কবি বলেন–

چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے
چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے

চাঁদের আলো তো সূর্য থেকে ধার করা। কিন্তু আমার প্রিয় রাসূলের চেহারার নূর ছিল একান্তই নিজস্ব। এজন্য এই তুলনা সঠিক নয়।

একজন বলছিল–

کوئی منظر حسین نہیں لگتا
اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا
چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا
چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا

কোনো দৃশ্যই ভালো লাগে না। এখন তো এই মন কোথাও বসে না। চাঁদও ভালোভাবে দেখে নিয়েছি– সে-ও তোমার মতো সুন্দর নয়।

এক সাহাবি ছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)। তাদের পরিবার ছিল বড়ই আজিব। তাঁর মুহতারামা আম্মা হযরত সুমাইয়া (রাযি.) ইসলামের প্রথম শহীদ নারী ছিলেন। আবুজাহ্‌ল ও আবুলাহাব যখন তাঁকে কষ্ট দিত, তখন নবীজি বলতেন–

صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ

হে ইয়াসির-এর পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো। কারণ, তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। অন্য স্থানে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ

'জান্নাত তিন ব্যক্তির জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে। তারা হলো, আলী, আম্মার ও সালমান।'

তো সেই আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)-এর নাতি এক মহিলা সাহাবি রবী বিনতে মু'আব্বিয (রাযি.)কে নবীজির চেহারার আকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন–

لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً

'যদি তাকে দেখতে, তাহলে একটি উজ্জ্বল সূর্যের মতো দেখতে পেতে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ছয় নম্বর সাহাবি ছিলেন। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন–

لَقَدْ رَاَيْتَنِيْ سَادِسَ سِتَّةٍ

'আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে নিজেকে সাত নম্বর মুসলমান পেয়েছি।'

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন। জুতা উঠাতেন, মেসওয়াক তুলে দিতেন, বিছানা বিছিয়ে দিতেন, উজু করিয়ে দিতেন, খোঁজখবর নিতেন। তাঁকেই আল্লাহ তা'আলা আবুজাহ্লের মাথা কাটার সৌভাগ্য দান করেছেন। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আদেশ করলেন, হে ইবনে মাসুদ! আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। তিনি সূরা নিসার কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। তিনি বললেন–

كُنْتُ اِذَا رَاَيْتَ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ قُلْتُ كَاَنَّهٗ دِيْنَارًا

'যখনই আমি নবীজির চেহারার দিকে তাকাতাম, তখন আমার মনে হতো, এ যেন একটি দিনার।'

সেকালে নতুন-নতুন রুপার টাকা খুব চকমক করত। সেযুগে যেহেতু দিনারের প্রচলন ছিল, তাই তিনি দিনারের কথা বললেন।

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)- এর দৃষ্টিতে : হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) যিনি সাইয়্যিদুল মুহাদ্দিছীন ছিলেন, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْيَضُ كَاَنَّمَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ

'আল্লাহর রাসূল ছিলেন ধবধবে সাদা, যেন রুপা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যখন এত রূপ-সৌন্দর্য আছে, তাহলে তো তার সঙ্গেই মহব্বত করে মজা পাওয়া যাবে। দুনিয়ার চেহারাগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর হাবীবের চেহারা-ই কল্পনা করুন; হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে–

کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں
تجسس چار سو ہے اور میں ہوں

ترے قربان اور میرے تصور!

وہ گویا روبرو ہے اور میں ہوں

تجھے ہر گز نہ جانے دوں گا دل سے

خیال یار ! تو ہے اور میں ہوں

'কারও অনুসন্ধান আছে আর আমি আছি।

চারদিকে খোঁজ আছে আর আমি আছি।

তোমার উৎসর্গ আর আমার কল্পনা,

যেন দুটোই স্বর্গ আর আমি আছি।

তোমাকে কখনও অন্তর থেকে যেতে দেয় না বন্ধুর কল্পনা!

তুমি আছ আর আমি আছি।'

কোনো ব্যক্তি যদি তাহাজ্জুদের সময় নবীজির চিন্তা মনে আনে, তখন তো মহব্বতের মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এজন্যই আশেকদের জন্য তাহাজ্জুদের সময়টা সর্বোত্তম। এ-সময়–

رات کا خاموش منظر اور تصور یار کا

ہے یہی اک وقت راحت عشق کے بیمار کا

রাতের নিস্তব্ধ প্রহর আর প্রিয়তমের কল্পনা

ইশকের রোগীর জন্য এটাই একমাত্র শান্তির সময়।

ইশকের রোগীরা তখন হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করে।

دنیا کا طلب گار رہا ہے نہ رہے گا

سرکار کے قدموں کے نشاں ڈھونڈنے والا

نظروں میں رہے جس کے جمال رخ سرکار

اس شخص کا دنیا میں اجالا ہے اجالا

'দুনিয়ার প্রত্যাশী ছিলও না, থাকবেও না

যারা নবীজির আদর্শের চিহ্ন খুঁজে বেড়ায়।

নবীজির দিকে যার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে

তার দুনিয়া তো আলোকিতই আলোকিত!'

হযরত আনাস (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত আনাস (রাযি.) এমন একজন সাহাবি, যিনি দশ বছর যাবত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন। তাঁর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে খুব ছোট বয়সে নবীজির খেদমতে পেশ করেছিলেন। তিনি নবীজির জন্য তরকারি কেটে আনতেন। এ-কারণে তার উপাধি হয়ে যায় 'আবুহামযা' অর্থাৎ– তরকারি সংগ্রহকারী।

একবার তাঁর খেদমতে খুশি হয়ে নবীজি তাঁর হায়াত, সম্পদ ও সন্তানাদিতে বরকতের দু'আ করলেন। হাদীছে আছে, তাঁর সম্পদে এত বরকত হলো যে, মানুষের বাগানে বছরে একবার ফল আসে; কিন্তু তাঁর বাগানে ফল আসত দুবার। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানাদির মধ্যেও বরকত দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর নাতিপুতিসহ সর্বমোট ১২৫ জন আওলাদ স্বচক্ষে দেখে গেছেন। হায়াতেও বরকত হয়েছিল। তিনি ১০৩ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

একবার তাঁর ঘরে এক মেহমান তাশরীফ আনলেন। দাসি তার হাত ধুইয়ে দিল। হাত মোছার জন্য কিছু না পেয়ে সে একটি তোয়ালে নিয়ে এল, যেটি একটু ময়লা ছিল। এটা দেখে হযরত আনাস (রাযি.) তাকে বকুনি দিল। আর এক্ষুনি পরিষ্কার করে আনছি বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। তিনি তোয়ালেটা একটি জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলেন। কিছুক্ষণ পর যখন বের করল, দেখা গেল সেটি খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং খুব নরম-নরম লাগছে। মেহমানকে দেওয়া হলে সে খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, কী ব্যাপার ভাই! এত অল্প সময়ে এটি কীভাবে এমন পরিষ্কার হলো, আবার শুকিয়েও গেল? তখন হযরত আনাস (রাযি.) তাকে বললেন, একবার নবীজি আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। তিনি এই তোয়ালেটা দিয়ে হাত মুছেছিলেন। এরপর থেকে আগুন একে জালানো ছেড়ে দিয়েছে। যখনই এটি ময়লা হয়, আমরা আগুনে ফেলে দিই। আগুন এর ময়লা খেয়ে ফেলে; কিন্তু একে জ্বালায় না। আমরা তা পরিষ্কার অবস্থায় তুলে নিই।

তো সেই আনাস (রাযি.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْيَضَ الْوَجْهِ

'নবীজির গায়ের রং ধবধবে সাদা ছিল।'

একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। এক নবীন পাঠান যুবক দাওরায়ে হাদীছ শেষ করে এল। হাদীছের দরস দিচ্ছিল। লোকেরা তিন-চার দিন

পর্যন্ত তার হাদীছের দরস শুনতে লাগল। পঞ্চম দিন এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বলল, শোনো যুবক! আজকের পর আর তুমি দরস দেবে না। সে জিজ্ঞেস করল, কেন? আমি তো হাদীছের দরস দিচ্ছি। বৃদ্ধ বলল, আমি এ-কদিন ধৈর্য ধরে ছিলাম। তুমি প্রতিদিনই 'কালা-কালা রাসূলুল্লাহ বলেছ। আরে বেটা! তোর বাপ কালা হবে; আমাদের নবী না। তিনি সাদা ফর্সা ছিলেন।

সেই বৃদ্ধ কলা-কলা (অর্থ বললেন) কে কালা-কালা (কালো রঙের) মনে করে বসেছিল। তো হযরত আনাস (রাযি.) বলতেন–

كَانَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ الْجِسْمِ

'নবীজির দেহের অবকাঠামো খুবই সুন্দর ছিল।'

আবু তুফাইল (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত আবু তুফাইল (রাযি.) এমন একজন সাহাবি ছিলেন, যিনি সকল সাহাবির মধ্যে সর্বশেষ মারা গেছেন। তাঁর ইন্তেকাল ১১০ হিজরিতে হয়েছে। তিনি বলেন–

كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا

'নবীজি লাবণ্যময় সাদা ছিলেন।'

مَلِيْح ملح থেকে উদগত। অর্থ লবণ থেকে উৎগত। যেমন– কেউ যদি নোনতা বস্তু খায়, তখন আর তা ছাড়তে মনে চায় না।

'নমকীন চেহারা' এটা একটা উর্দূ শব্দ। যার অর্থ হলো এমন আকর্ষণীয় চেহারা যে, তা থেকে চোখ ফেরানো যায় না। একবার দেখলে আবার দেখতে মন চায়। হযরত আবু তুফাইলও একথাই বলছিলেন যে, নবীজির চেহারা মোবারক এমনই ছিল। খাঁটি কথা হলো–

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے

یہ کہکشاں تو آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے قدموں کی دھول ہے

'যার প্রতি সৌন্দর্য কুরবান হয়, সে তো নবীজির সৌন্দর্য।

এসব দুনিয়াবি রূপ-জৌলুস সে তো তাঁর পায়ের ধুলামাত্র।'

কবি বলেন–

اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات

دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات

آپ آئے تو وو عالم میں بہار آئی ہے
پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے
آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے
کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے

'আপনি এলেন তো উভয় জাহানে বসন্ত নেমে এল।
ফুলেরা ফুটল, তারকারাজি আলো পেল।
আপনার সৌন্দর্য নিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কুরআনে বহু চেহারা দ্বারা নূরানি চেহারার কসম খেয়েছেন।'

নবীজির নূরানি চেহারার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

'প্রিয় রাসূল! আপনি যখন আকাশপানে তাকান, তখন আমি আপনার নূরানি চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি।'[১]

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) নবীজির কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একবার নবীজি স্বপ্নে দেখলেন, ওমর (রাযি.) খুব লম্বা জামা পরিধান করে আছেন আর বাকিরা তাদের শরীর উপযোগী জামা পরেছেন। যখন নবীজি এই স্বপ্ন শোনালেন, তখন ওমর (রাযি.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ-স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হবে? তিনি উত্তরে বললেন, এই জামা প্রত্যেকের দীনদারির প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এত দীনদারি দান করেছেন, যার পরিমাণ সবার চেয়ে তোমার বেশি। সেই ওমর (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলছেন–

بِأَبِيْ وَأُمِّيْ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ

'আমার পিতামাতা কুরবান হোন। আমি নবীজির পূর্বে ও পরে তাঁর মতো এত রূপবান মানুষ আর দেখিনি।'

এ-কথাটি-ই হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন–

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৪

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُّ عَيْنِيْ
وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

তোমার চেয়ে সুন্দর অন্য কাউকে আমার চোখ কখনো দেখেনি।
তোমার চেয়ে রূপবান সন্তান কোনো নারী জন্ম দেয়নি।
তুমি সকল দোষত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে সৃজিত হয়েছ।
যেন তোমাকে তোমার পছন্দমতো রূপ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সৌন্দর্যের নিগূঢ় রহস্য

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য জেনে নিন যে, নবীজির এত সৌন্দর্য কেন ছিল। হাদীছে এসেছে, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম যখন তাদের দৃষ্টি জান্নাতি হুর-গেলমানের ওপর পড়বে, তখন তারা তাদের রূপ ও সৌন্দর্য দেখে নির্বাক হয়ে সত্তর বছর যাবৎ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে– সময় অতিক্রমের কোনো অনুভূতিই তাদের থাকবে না। তারপর তারা জান্নাতে বসবাস করতে থাকবে। এরপর একটা সময় আসবে যে, জান্নাতিরা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হবে। যখন আল্লাহর দিদার হবে, তখন নূরের এক পশলা বৃষ্টি হবে, যার ফোঁটাগুলো প্রত্যেক জান্নাতির চেহারায় পড়বে। যেভাবে ধুলিঝড় এলে চেহারার ওপর মাটি জমে যায়, সে রকম। তো আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য জান্নাতিরা যখন ফিরে আসবে, তাদের চেহারায় দিদারে খোদার এমন নূর ঝলমল করতে থাকবে, যা দেখে জান্নাতি মাখলুকরা বিমুগ্ধ হয়ে সত্তর বছর পর্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে।

তো চিন্তা করে দেখুন, জান্নাতে আল্লাহর দিদারপ্রাপ্তদের চেহারার নূর দেখে যদি সবাই হয়রান-পেরেশান হয়, তাহলে তাঁর চেহারায় কী পরিমাণ সৌন্দর্য ছিল! এমনটি তো হওয়ারই কথা। আল্লামা মুনাবী (রহ.) তাঁর কিতাব 'জামউল ওসাইল'-এ লিখেছেন–

وَوَجْهُ التَّشْبِيْهِ حُسْنُ الْوَجْهِ وَصَفَا الْبَشْرَةِ وَسُطُوْعُ الْجَمَالِ لِمَا اُفِيْضَ عَلَيْهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ جَمَالِ الذَّاتِ

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতার যত উপমা দেওয়া হয়, তার একমাত্র কারণ হলো, আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাঁর চেহারার ওপর নূরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। আল্লাহু আকবার!

অর্থাৎ– জান্নাতিরা আল্লাহর দিদার লাভের পর যে সৌন্দর্য পাবে, তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াবি সৌন্দর্যের একটি ক্ষুদ্রাংশ পরিমাণও হতে পারবে না। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে এত রূপ দান করেছেন।

ইবনে আসাকিরের বর্ণনা

ইবনে আসাকির (রহ.) একটি বিস্ময়কর কথা লিখেছেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একবার আমার হাত ফসকে সুঁইটা মাটিতে পড়ে যায়। অন্ধকার ছিল। সুঁইটা দেখা যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ আনলেন।

فَتَبَيَّنَتِ الْاِبْرَةُ مِنْ شُعَاعِ نُوْرِ وَجْهِهٖ

'যেই তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তার চেহারার নূরের আলোতে আমি সুঁইটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এরপর আমি তা কুড়িয়ে নিলাম।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর দৃষ্টিতে : ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর রচিত 'দালাইলুন নুবুওয়্যাহ' নামক কিতাবে একটি বর্ণনা এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ مِنَ الضَّوْءِ

(আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ করার পর) নবীজির দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি রাতের আঁধারে সেই পরিমাণ দেখতে পেতেন যে-পরিমাণ দিনের আলোতে দেখতেন।

আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : মুসলিম শরীফে একটি বর্ণনা আছে। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) বলেন–

وَكَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَجَلَّ فِيْ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُطِيْقُ اَنْ اَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهٗ

পৃথিবীর বুকে আর এমন কেউ নেই, যে আমার নিকট নবীজির থেকে বেশি প্রিয় ছিল। আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানী কোনো ব্যক্তি ছিল

না। আমি যখনই তাঁর দরবারে যেতাম, তাঁর চেহারায় তখন এত বেশি নূর ঝলমল করত যে, নয়নভরে তাঁকে দেখার সাহসটুকুও আমার হতো না।

হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) বলেন–

لَمَّا نَظَرْتُ اِلٰى اَنْوَارِهٖ وَضَعْتُ كَفِّيْ عَلٰى عَيْنَيَّ خَوْفًا مِنْ ذِهَابِ بَصَرِيْ

'যখন আমি নবীজির চেহারার দিকে তাকাতাম, তাতে এর নূর থাকত যে, তার প্রভা সহ্য করতে না পেরে আমি আমার দুচোখ হাত দিয়ে ঢেকে নিতাম পাছে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়।

এমন প্রভাময় আলো, যার দিকে তাকানো যায় না; দুনিয়ার সূর্যের আলোকে তার উদাহরণ হিসেবে পাওয়া যায়। আমাদের নবীজির চেহারাও এমন দ্যোতিময় ছিল।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন–

اِنَّ جَمَالَ نَبِيِّنَا كَانَ فِيْ غَايَةِ الْكَمَالِ لٰكِنَّ اللّٰهَ سَتَرَ عَنْ اَصْحَابِهٖ كَثِيْرًا مِنْ ذٰلِكَ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ وَالْكَمَالِ الْبَاهِرِ اِذْلَوْ بَرَزَ اِلَيْهِمْ لَصَعُبَ النَّظْرُ اِلَيْهِ عَلَيْهِمْ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা যে-নূর দান করেছেন, তা সাহাবায়ে কেরাম থেকে গোপন রেখেছেন। যদি তারা সেই প্রকৃত নূর দেখত, তাহলে তাঁর ওপর দৃষ্টি ফেলাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যেত।

হযরত থানুবি (রহ.) 'নাশরুততীব' নামক কিতাবে একটি আজিব কথা লিখেছেন। তা হলো–

وَاَمَّا عَدَمُ تَعَشُّقِ الْعَوَامِ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلٰى يُوْسُفَ عَلَيْهِ السلام فَلِغَيْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى لَمْ يَظْهَرْ جَمَالُهٗ كَمَا هُوَ عَلٰى غَيْرِهٖ كَمَا اَنَّهٗ لَوْ يَظْهَرْ جَمَالُ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السلام كَمَا هُوَ اِلَّا عَلٰى يَعْقُوْبَ اَوْزُلَيْخَا

'ইউসুফ (আ.)কে যারা দেখেছেন, তারা তো তাঁর আশেক হয়ে গেছেন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে। পক্ষান্তরে আমাদের নবীজির রূপ ও সৌন্দর্য আল্লাহ দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন। এই গোপনীয়তার মূল কারণ হলো, আল্লাহর মর্যাদাবোধ। তা এভাবে যে, আমার প্রিয় বন্ধুর রূপ দেখে ভালোবাসা তো দূরের কথা, তার চেহারার দিকে তাকানোর দুঃসাহসই আমি

পছন্দ করি না। তাকে তো না দেখেই ভালোবাসতে হবে। এতে বোঝা গেল, নবীজির রূপের সবটুকু দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়নি। এই কাজটি আল্লাহ তাঁর নিজ কুদরতি হাতেই সম্পন্ন করেছেন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : হযরত আলী (রাযি.) বলেন–

مَنْ رَاٰهُ بَدَاهَةً هَابَهٗ وَمَنْ خَالَطَهٗ مَعْرِفَةً اَحَبَّهٗ يَقُوْلُ نَاعِتُهٗ لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'যেব্যক্তি নবীজিকে হঠাৎ দেখত, সে-ই প্রভাবিত হয়ে যেত। যে তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখত, সে ভালোবাসতে শুরু করত। তাঁর প্রশংসাকারী এভাবে বলত যে, আমি এমন সুন্দর লোক তার পূর্বেও কখনও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی
آنکھوں کے آگے بس رہے صورت حضور کی
سو بار صدقے ہو کے بھی یہ چاہتا ہے دل
سو بار اور آپ کے قربان جایئے

'ইচ্ছা পূরণ করেছি। জান্নাতি হুরদের আকাঙ্ক্ষা নেই।
চোখের সামনে ভাসছে নবীজির নূরানি চেহারা।
শতবার উৎসর্গ হয়েও অন্তরে আকুতি বিরাজমান।
যদি আরো শতবার উৎসর্গ হতে পারতাম তার নামে!'

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে : আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, যুলায়খা ও মিশরের রাজপরিবারের নারীরা ইউসুফ (আ.)কে দেখতে-দেখতে তাদের আঙুল কেটে ফেলেছিল। তারা যদি আমাদের নবীজির চেহারার নূর দেখত, তাহলে, কলিজা টুকরা-টুকরা করে ফেলত।

নবীজির দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ

এ তো ছিল নবীজির রূপ-সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। এবার একটু বিস্তারিত আলোচনায় যাই। এক ধারাবাহিকতায় শুনুন। তাহলে কল্পনায় বিন্যস্ত করতে সহজ হবে।

নবীজির দেহ মোবারক : দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নবীজির অবয়ব খুব লম্বা ছিল না। তবে মজলিসে বসলে অন্যদের তুলনায় দেহ কিছুটা উঁচা মনে হতো। আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাঁর প্রতি এভাবে দয়া দেখালেন যে, তাঁর দেহকে খুব লম্বা করে সৃষ্টি করেননি। কেন? কারণ হলো, সেটাও এক ধরনের ত্রুটি। অতি লম্বা হওয়া দৈহিক সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ন করে। নবীজির দেহ মোবারক মধ্যম ধরনের। তবে দৈর্ঘ্যের দিকে একটু অগ্রসর ছিল। কোনো মজলিস বা সমাবেশে থাকলে সবার চেয়ে উঁচুই মনে হতো। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত যে, হে মানবকূল! আমার হাবীব শুধু দৈহিকভাবেই উঁচু নয়; মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়েও উঁচু।

মধ্যম গঠনের দেহ : শরীর খুব মোটা ছিল না; মেদ-ভূড়িও ছিল না। খুব স্লিম ও সুদর্শন ছিলেন তিনি। যেমন– হযরত হিন্দ ইবনে আবী হালাহ বলেন, 'নবীজির শারীরিক গঠন মধ্যম ছিল। দেহ খুব মোটাও না, ঢিলোঢালাও না। বরং মজবুত, শক্তিশালী ও ফিটফাট ছিল।

قربان جاؤں آپ کی اس چال ڈھال کے
رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے

'আমার প্রিয় নবীর চলনভঙ্গির ওপর আমি উৎসর্গ হই।
মন চায়, কদমে-কদমে তাঁকে কলিজা কেটে স্বাগত জানাই।'

গায়ের রং মোবারক : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের রং ফর্সা উজ্জ্বল ছিল। এক তো হলো, শ্বেত রোগীর মতো ধবধবে সাদা; সেটা দেখতে ভালো লাগে না। আরেক হলো গোলাপি রং মাখা সাদা রং; সেটা দেখতে খুব ভালো লাগে। আল্লাহর হাবীবের রং সেই গোলাপিমুখী সাদা ছিল। 'দালাইলুন নুবুওয়্যাহ' নামক গ্রন্থে হযরত আলী (রাযি.)-এর একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের রং লালমাখা সাদা ফর্সা ছিল।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) বলেন, নবীজি শরীর মোবারকের যে-অংশ রোদ ও বাতাসের মধ্যে উন্মুক্ত থাকত, সেটুকু লালচে সাদা বলে মনে হতো। আর যে-অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকত, সেটুকু উজ্জ্বল সাদা মনে মতো। আমাদের পাঞ্জাবে কোনো বাচ্চার রং যদি এমন হতো তাহলে আপেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাহলে ধরে নিন নবীজির গায়ের রং আপেলের রঙের মতো আকর্ষণীয় ছিল।

নবীজির মাথা মোবারক : নবীজির মাথা মোবারক কেমন ছিল? হযরত হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রহ.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক মধ্যম ধরনের বড় ছিল। অর্থাৎ– এত বড়ও ছিল না যে, অসুন্দর দেখাবে এবং ছোটও নয় যে, বিশ্রী দেখাবে।

নবীজির চুল মোবারক : নবীজির মাথার চুল সম্পর্কে আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, নবীজির চুল খুব আকর্ষণীয় ও কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। খুব সোজা খাঁড়াও ছিল না, আবার বেশি পেঁচানোও ছিল না। তাতে যখন চিরুনি চালানো হতো, তখন হালকা ঢেউয়ের মতো হয়ে যেত। বালির টিলা কিংবা পুকুরের পানিতে বাতাস চললে যেমন ঢেউ-ঢেউ দাগ পড়ে যায় তেমন। অর্থাৎ– মাথার চুল এত বেশি কোঁকড়ানো ছিল না, যেমনটা আফ্রিকার কালো মানুষের হয়। আবার সজারুর মতো খাঁড়াও ছিল না। এমনিভাবে চুল কখনো তিনি কান পর্যন্ত লম্বা রাখতেন, কখনো অর্ধ ঘাড় পর্যন্ত আবার কখনোবা কাঁধ পর্যন্ত।

নূরানি চেহারা মোবারক : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা মোবারক একটু লম্বামতো গোলাকার ছিল। একেবারে গোল নয়; গোল ও লম্বামুখী ছিল। এ-কারণে হযরত আলী (রাযি.) বলেন–

كَانَ فِيْ وَجْهِهِ تَدْوِيْرٌ

'নবীজির চেহারা গোলাকার ছিল।'

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) বলেন–

'নবীজির চেহারা মুচকি হাসির সময় পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনে হতো, সেই উজ্জ্বলতা দেখে আমরা তাঁর আনন্দের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতাম।

নবীজির আপন চাচা হযরত আবূ তালিব নবীজির রূপ-সৌন্দর্যের ওপর কবিতা বলেছেন– খুব বিস্ময়কর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন–

'সে হলো এমন ফর্সা সুন্দর চাঁদমুখী, যার চেহারার ঔজ্বল্য দিয়ে রহমতের বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হতো। চেহারায় এক ধরনের মায়াবী ভাব ছিল। হঠাৎ কারো দিকে তাকালে সে প্রভাবিত হয়ে যেত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার অন্তরে নবীজির জন্য ভালোবাসা জেগে উঠত।

নূরানি ললাট : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি ললাটের কথা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর মুখেই শুনুন। তিনি বলেন–

'নবীজির নূরানি ললাট সীমাহীন দ্যোতিময় ছিল। রাতের আঁধারে তাঁর কালো চুলের মাঝখানে তাঁর উজ্জ্বল ললাট প্রদীপের মতো ঝলমল করত।

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবীজির কপাল এত উজ্জ্বল ছিল যে, মনে হতো তা থেকে সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ছে।

চমৎকার ভ্রূযুগল : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্রূযুগল সম্পর্কে হিন্দ ইবনে আবী হালাহ বলেন, নবীজির ভ্রূযুগল ধনুকের মতো বাঁকা, চিকন ও ঘন ছিল। কিন্তু উভয় ভ্রূ পৃথক-পৃথক ছিল। উভয় ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ভেসে ছিল, যা ক্রোধের সময় ফুলে-ফুলে উঠত। অর্থাৎ– উভয় ভ্রূ একটি অপরটি থেকে পৃথক ছিল। মধ্যখানে চুল ছিল না। একেবারে ধনুকের মতো ছিল, যেন সরু চাঁদ।

মায়াবী চোখ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়াবী চোখ সম্পর্কে হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবীজির চোখযুগল সুরমামুখী ছিল। অর্থাৎ– সুরমা লাগানো ব্যাতীতই মনে হতো, যেন তিনি সুরমা লাগিয়েছেন। চোখদুটি উজ্জ্বল, কালো পুতুলিবিশিষ্ট ডাগর-ডাগর ছিল। তাতে সুরমা না লাগালেও মনে হতো তাতে সর্বদা সুরমা লেগেই আছে।

হযরত উম্মে মা'বাদ (রাযি.) বলেন–

'নবীজির চোখ খুব কালো ও প্রশস্ত ছিল।'

সেই চোখগুলোতে লজ্জা এত বেশি ছিল যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) বলেন, 'আমি নবীজির চোখে সেই লজ্জা দেখেছি, যা মদীনার কুমারী মেয়েদের চোখেও নজরে পড়েনি।

নবীজির চোখের পুতুলি ছিল খুব কালো এবং সাদা অংশ ছিল খুব সাদা; তবে সাদার মাঝে লাল-লাল ডোরাকাটা দাগ ছিল। এ যেন দাগ নয়, বরং মায়াবী জাল! আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাঁর চোখে এত সৌন্দর্য দান করেছেন।

মনোহারী পলকসমূহ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পলকসমূহের ব্যাপারে হযরত আলী (রাযি.) বলেন, 'নবীজি লম্বা পলক বিশিষ্ট ছিলেন।'

সুদর্শন চেহারা : নবীজির মুখমণ্ডল কেমন ছিল? আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) বলেন, নবীজির মুখমণ্ডল মধ্য গঠনের ও সমতল ছিল। অর্থাৎ– মুখে খুব বেশি গোশত ছিল না যে, একেবারে ঝুলে আছে, আবার এতটা কমও ছিল না যে, কঙ্কালসার মনে হবে। বরং মধ্যম ধরনের মাংসল চেহারা ছিল।

উন্নত নাসিকা : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত নাসিকা সম্পর্কে হযরত হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.) বলেন, নবীজির নাক মোবারক উন্নত এবং কিছুটা সামনে ঝোঁকা ছিল। তাতে ছিল অপরূপ নূরের ঝলমলানি। এ-কারণে সাধারণ দৃষ্টিতে খুব উন্নত মনে হতো।

আকর্ষণীয় মুখাকৃতি : এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারকের ব্যাপারে হযরত হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.) বলেন, 'নবীজির মুখ মধ্যম ধরনের প্রশস্ত ছিল।

কিছু-কিছু মানুষের মুখ খুব ছোট হয়; আবার কারো হয় খুব চওড়া। কিন্তু আমাদের নবীজির মুখাকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের প্রশস্ত। এ সেই মুখ, যা থেকে আল্লাহর কালাম কুরআন বের হয়েছে, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

'তিনি নিজের খাহেশাত থেকে কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু হয় না।'[১]

দাঁতসমূহ : নবীজির দাঁত কেমন ছিল? এ-ব্যাপারে হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন– 'নবীজি যখন হাঁসতেন, তখন দাঁত থেকে আলো ঝলমল করে উঠত। মনে হতো, সেই আলোতে দেওয়াল আলোকিত হয়ে পড়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَجَ الشَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

'নবীজির সামনের দিকের দাঁতগুলো একটু ফাঁক-ফাঁক ছিল। তিনি যখন মুচকি হাসতেন, তখন তার দাঁত থেকে আলো ঠিকরে পড়ত। বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক তাঁর দাঁতকে উজ্জ্বল মুক্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সুন্দর কান : নবীজির কান মোবারকও খুব সুন্দর ছিল। হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান মোবারক খুব সুন্দর ও মধ্যম গঠনের ছিল। আয়েশা (রাযি.) বলেন–

تَخْرُجُ الْاُذُنَانِ بِبَيَاضِهِمَا مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْغَوَائِرِ كَاَنَّهَا تُؤَ قَدُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ بَيْنَ ذٰلِكَ السَّوْدَاءِ

'নবীজির চুলের আড়াল থেকে যখন কান অবমুক্ত হয়ে যেত, তখন মনে হতো গাঢ় অন্ধকারে যেন কোনো উজ্জ্বল তারকা আত্মপ্রকাশ করেছে।'

---

১. সূরা নাজম : আয়াত ৩, ৪

গোঁফগুচ্ছ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোঁফ কেমন ছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন- 'নবীজি তাঁর ঠোঁট থেকে অতিরিক্ত চুলগুলো কেটে ফেলতেন এবং তিনি বলতেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর ঠোঁটের উপরের চুলগুলো কেটে ফেলতেন।

দাড়ি মোবারক : নবীজির দাড়ি সম্পর্কে হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি ঘন ছিল। কারো-কারো দাড়ি খুব পাতলা হয়; কিছু দাড়ি এদিক; কিছু সেদিক এমন নয়। নবীজির দাড়িগুলো ছিল ঘন ও ভরপুর। প্রায় এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা ছিল। এর চেয়ে লম্বা হয়ে গেলে তিনি কেটে ফেলতেন।

ঘাড় মোবারক : নবীজির ঘাড় তথা গর্দানের ব্যাপারে হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নবীজির গর্দান লম্বা, পাতলা ও উজ্জ্বল ছিল। দেখলেই চাঁদের ঔজ্জল্য নজরে পড়ত।

কাঁধ মোবারক : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধ কেমন ছিল? হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নবীজির কাঁধ প্রশস্ত ছিল। মাঝখানে ভরপুর গোশত ছিল। অর্থাৎ- তিনি মজবুত ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী ছিলেন।

নূরানি ও সুবাসিত বগলদ্বয় : নবীজির বগল কেমন ছিল? হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবীজি দু'আ করার সময় তাঁর উভয় হাত এত পরিমাণ উঁচু করতেন যে, উভয় বগল উন্মুক্ত হয়ে যেত এবং তার ঔজ্জল্য নজরে পড়ত।

প্রশস্ত সিনা মোবারক : নবীজির সিনা মোবারক প্রশস্ত ছিল। সায়্যিদা আয়েশা (রাযি.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক প্রশস্ত, মজবুত ও সাদা ছিল।

পবিত্র পেট : নবীজির পেট সম্পর্কে হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.) বলেন, 'নবীজির পেট মোবারক ও সিনা মোবারক সমতল ছিল।' অর্থাৎ- পেট সামনের দিকে বেরিয়ে ছিল না; বরং পেট ও বুক সমান ছিল। এটা উত্তম ফিটনেস ও সুস্থতার নিদর্শন। তাঁর সিনা মোবারক হতে নাভি পর্যন্ত এক গুচ্ছ চুলের রেখামতো ছিল। অবশিষ্ট শরীরে খুব ঘন পশম ছিল না। বরং যেখানে পশম হওয়া উচিত সেখানে ছিল, বাকি শরীর ধবধবে সাদা ছিল।

পবিত্র বাহুযুগল : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুযুগল মোটা এবং কবজিগুলো মধ্যম ছিল। সাধারণত শক্তিশালী বাহু ও কবজি যেমন হয় নবীজিরও এমন ছিল।

কোমল হাতের তালু : নবীজির মোবারক হাতের তালুদ্বয় খুব নরম ও সুন্দর ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.)-এর বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেন, নবীজির হাতের তালু গোশতে ভরা ও প্রশস্ত ছিল। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন,

وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ

আমি রেশমও ছুঁয়ে দেখেছি; কিন্তু রেশমও এত কোমল নয় যতটা কোমল আমার প্রভু (মুহাম্মদ সা.)-এর হাতের তালু। এ ছিল সেই বরকতময় হাতসমূহ, যাকে আল্লাহ কুরআনে নিজের হাতের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন–

يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

'আল্লাহর হাত সেই সব সাহাবাদের হাতের ওপর, যাদের হাতে আমার প্রিয় রাসূলের হাত মিলেছে।'

অপরূপ আঙুলসমূহ : নবীজির মোবারক আঙুলসমূহ অত্যন্ত চমৎকার ছিল। বোখারি শরীফের বর্ণনায় এসেছে, হিন্দ ইবনে আবী হালাহ (রাযি.) বলেন, 'নবীজির হাতের আঙুলগুলো মধ্যম মানের লম্বা ছিল। এ ছিল সেই আঙুল, যার ইশারায় আল্লাহ চাঁদকে দু-টুকরো করে দিয়েছিলেন।

সুডৌল কোমর : নবীজির কোমর মোবারক পাতলা ধরনের ছিল। হযরত মা'রাশ কা'বি (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'ররানা নামক স্থানে ওমরার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধলেন। যখন তিনি উপরের চাদর গায়ে জড়ালেন, তখন আমি তাঁর কোমর দেখার সৌভাগ্য পেলাম। দেখে মনে হলো, তাঁর কোমর রুপার মতো চকমক করছে।

পায়ের মজবুত গোছা : নবীজির পায়ের গোছা অত্যন্ত মজবুত ছিল। যেমনটা ব্যায়ামকারীদের পায়ের গোছা মজবুত হয়। তবে খুব মোটাও ছিল না। হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, নবীজির পায়ের গোছা খুব গোশত ভরা ভারি ছিল না।

পা মোবারক : আল্লাহর হাবীবের পা মোবারক কেমন ছিল? হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় পা নরম ও গোশতে ভরা ছিল।

পাতলা গোড়ালি : নবীজির পায়ের গোড়ালি দেখে মনে হতো খোদাইকরা গোড়ালি। জাবের (রাযি.) বলেন, নবীজির পায়ের গোড়ালিতে গোশত কম ছিল।

সাদা কোঁকড়ানো চুল : নবীজির মাথার অধিকাংশ চুল তো কালোই ছিল। তবে কিছু চুল ছিল সাদা। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় মাথার চুল ও দাড়ির মধ্যে বিশটির বেশি সাদা চুল ছিল না। অর্থাৎ– সর্বোচ্চ বিশটি চুল সাদা হয়েছিল। চিন্তা করুন! তাঁরা আল্লাহর হাবীবকে কত ভালোবাসার সঙ্গে দেখতেন যে, তাঁর পাকা-কাঁচা চুলগুলো পর্যন্ত গণনায় নিয়ে নিয়েছিলেন।। আল্লাহু আকবার কাবীরা! মনে হচ্ছে, তারা অপলকনেত্রে নবীজিকে দেখত।

গাম্ভীর্যপূর্ণ চলন : হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন এবং খুব মজবুতভাবে কদম ফেলতেন ও উঠাতেন। মনে হতো, যেন ওপর থেকে নিচের দিকে নামছেন।

মহরে নবুওত : নবীজির মহরে নবুওত কেমন ছিল? আল্লাহ রব্বুল ইযযত স্বীয় হাবীবকে নবুওতের প্রমাণস্বরূপ 'মহরে নবুওত' দান করেছিলেন। সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রহ.) বলেন, নবীজির উভয় কাঁধের মাঝে মহরে নবুওত ছিল। হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রাযি.) ইন্তেকালের পর যখন দেখলেন, তখন মহরে নবুওত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ইবনে হিব্বান বলেন, মহরে নবুওতের ওপর 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল। আল্লামা কুরতুবি বলেন, মহরে নবুওত ছোট-বড় হতো এবং রং বদলাত। এ-কারণে সাহাবি জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযি.) বলেন, 'মহরে নবুওত কবুতরের ডিমের মতো গোল লালচে ছিল।

সাহাবারা এই মহরে নবুওত দেখার জন্য ছটফট করতেন। যেমন–

(১) হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি ঈমান আনার পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহরে নবুওত দেখতে চেয়েছিলেন। অবশিষ্ট নিদর্শনগুলো দেখা হয়ে গিয়েছিল। নবীজি তাকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি কাছে আসতেই নবীজি পিঠের কাপড় সরিয়ে বললেন, আচ্ছা, এসো, তুমি তো মহরে নবুওত দেখতে চেয়েছিলে। হযরত সালমান ফারসি (রাযি.) মহরে নবুওত দেখলেন এবং কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(২) একটা মজার গল্প শুনুন। এক সাহাবি ছিলেন। নাম উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাযি.)। তিনি একটু রসিক টাইপের মানুষ ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে কথা দিয়ে হাসাতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে একটি রসিক কথা বললেন। এতে সবাই হেসে উঠল। নবীজি আঙুল দিয়ে তার পেটে গুতা মারলেন এবং বললেন, এবার থামো। নবীজি এভাবে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। একদিন নবীজি নসীহত পেশ করছিলেন। শেষের দিকে বললেন, হে লোকসকল! আমি যদি কারো হক নষ্ট করে থাকি, তা হলে এই আমি উপস্থিত হলাম, তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে পার। একথা শুনে সেই উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাযি.) দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর আমার হক আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হক? তিনি বললেন, একবার আপনি আমার পেটে আঙুল দিয়ে গুতা মেরেছিলেন এবং আমি তাতে ব্যথা পেয়েছিলাম। একথা শুনে নবীজি বললেন, ঠিক আছে; তুমিও এখন আমাকে আঙুল দিয়ে গুতা মেরে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন গুতা মেরেছিলেন, তখন আমার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না; অথচ এই মুহূর্তে আপনার গায়ে কাপড় আছে। আপনি তো আমার উদাম গায়ে গুতা মেরেছিলেন। নবীজি বললেন, ঠিক আছে, এসো, আমি গায়ের জামা খুলে দিচ্ছি। নবীজি জামা খুললেন। উসাইদও প্রতিশোধ নিতে সামনে এগিয়ে গেল। আবুবকর ও উমর (রাযি.)-এর মতো বড়-বড় সাহাবিরা নির্বাক– এ কী করছে আশেকে রাসূল! নিজের জীবন থেকে বেশি প্রিয় নবী থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে! আবুবকর ও উমর (রাযি.)-এর ইচ্ছা হচ্ছিল, তারা উসাইদকে এই প্রতিশোধ তাদের শরীরে নিতে বলবেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁদের বাধা দিচ্ছিল। তারা হতবাক হয়ে এই অবিশ্বাস দৃশ্য দেখছিলেন। হাদীছে এসেছে,

فَاحْتَضَنَهُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ هَذَا

যখন নবীজি দেহ থেকে কাপড় সরালেন, সঙ্গে-সঙ্গে হযরত উসাইদ (রাযি.) পেছন দিক থেকে নবীজিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মহরে নবুওতের ওপর একটি চুমু এঁকে দিলেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আমি তো আসলে এতে (মহরে নবুওয়াতের) চুমু খাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলাম।

আল্লাহু আকবার কাবীরা!

ঘাম মোবারক : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম কেমন ছিল? হাদীছে এসেছে, উম্মে সুলাইম (রাযি.) ছোট-ছোট বাচ্চাদের পাঠাতেন যেন তারা নবীজির ঘাম মোবারক শিশিতে জমা করে। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, উম্মে সুলাইম! এ দিয়ে তুমি কী কর? উত্তরে তিনি বললেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِيْ طِيْبِنَا وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبُ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মোবারক ঘাম আমরা আমাদের সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করি। এতে আমাদের সুগন্ধির সুবাস বেড়ে যায়।'

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। এক সাহাবি তাঁর কন্যা বিবাহ দেবেন। প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত করা হয়েছে; শুধু সুগন্ধি বাকি ছিল। নবীজি তাঁকে বললেন, তুমি আমার ঘামের কিছু ফোঁটা নিয়ে যাও। তিনি নবীজির গা থেকে কয়েক ফোঁটা ঘাম নিয়ে নববধূর গায়ে মেখে দিলেন। এরপর সেই ঘর থেকে সর্বদা এত সুন্দর সুবাস ভেসে আসত যে, সাহাবায়ে কেরাম সেই ঘরকে 'সুবাসিত ঘর' নামে বলাবলি করতেন।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযি.) বলেন, আমি তখনও ছোট ছিলাম। নবীজি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার গালে হাত রাখলেন। এতে আমার গালে খুব শীতলতা অনুভব করি এবং আমার মনে হচ্ছিল, আতরের দোকান থেকে এখনই কোনো বান্দা বের হয়ে এসেছে।

مشک و عنبر کیا کروں اے دوست! خوشبو کے لئے

مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے

'হে বন্ধু! মেশক আম্বর দিয়ে কি করব সুগন্ধির জন্য
আমার জন্য মুহাম্মদের গন্ডদ্বয়ের ঘাম দাও।'

নবীজির ঘামে এত সুবাস ছিল যে, একজন তো এভাবে বলল-

پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلِّ علیٰ

جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا

ফুলেরা ফুটছে 'দুরূদ' পড়ে পড়ে
ভোরের হাওয়াও নেচে-নেচে গেয়ে চলেছে।

ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں؟

جو نبی کے پسینے میں موجود ہے

'এমন সুবাস কাননে পুষ্পকলিতে কোথায় পাব
যা কিনা নবীজির ঘামের মাঝে মিশে আছে?'

এবার নবীজির মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো দেহ কল্পনা করুন, দেখবেন, আপনার অজান্তেই মন বলে উঠবে

سرے پاتک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے
باوضو ہوکے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے

'তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোলাপ গাছের মতোই মনে হয়।
উজু নিয়েও তাকে স্পর্শ করতে ভয় লাগে।'

কবিদের মাঝে ইশকে রাসূলের মর্যাদা

এক কবি নবীজির প্রশংসায় প্রায় চল্লিশ হাজার কবিতা রচনা করেছেন। চল্লিশ হাজার কবিতা লেখার পর তিনি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লিখেছেন, যার উর্দূ অর্থ হচ্ছে–

تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے
قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے
تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے
ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے

'কল্পনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; অথচ প্রশংসা ও গুণগান বাকি।
কলমের পা হেঁটে পরিশ্রান্ত অথচ প্রশংসা এখনো বাকি।
জীবনভর লিখলাম, তারপরও প্রশংসা বাকি।
লেখার পাতা ফুরিয়ে গেল, এখনো প্রশংসা বাকি।'

চল্লিশ হাজার কবিতা রচনাকারী বান্দাও বলছে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ও গুণের হক আদায় করতে পারিনি। এখন মনের আকাঙ্ক্ষা একটা-ই। কবি বলেন–

کوئی طلب مجھے زیست میں تو اتنی ہے
نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے

'কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি করি, তবে এতটুকু করব যে,
নবীজির ভালোবাসা চাই, সীমাহীন চাই।'

যে অন্তরে নবীজির কল্পনা ভেসে বেড়ায়, তা বড়ই মোবারক অন্তর।

اے جنت! تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں
میں نے مانا ضرور رہتے ہیں
میرے دل کا طواف کر جنت
میرے دل میں حضور رہتے ہیں

'ওহে জান্নাত! তোমাতে হুর-গেলমান, আলিশান অট্টালিকা আছে।
আমি মানছি, সত্যিই এসব আছে। তবে তোমায় বলছি.
হে জান্নাত! আমার অন্তরের তাওয়াফ করো
আমার অন্তরে হুযুর (রাসূলে আকরাম) থাকেন।'

এক কবি তো খুব সুন্দর বলেছেন–

آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا
آپ سے عشق میری جاں کی عبادت آقا
آپ کے ادنی غلاموں کے غلاموں کا غلام
ہے شرف میرے لیے اتنی ہی نسبت آقا

'আপনাকে ভালোবাসা আমার অন্তরের শরীয়ত হে প্রভু।
আপনাকে ভালোবাসা আমার জানের ইবাদত হে প্রভু।
আপনার আদনা গোলামদের গোলামদেরও গোলাম হওয়া এতটুকুন নেসবতও আমার জন্য অনেক মর্যাদার হে প্রভু।'

কবিদেরও আজব আজব কল্পনা আসে। একজন লিখেছেন–

محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو؟
مدینے کے خس وخاشاک لوں گا
ملی جاگیر جنت میں جو کوئی
تو دہلیز شہ لولاک لوں گا

'আমি মহল-মিনার কিছুই চাই না।
মদীনার অলিগলির খড়কুটাই আমার পছন্দ।

জান্নাতে যদি কোনো জমিদারি আমাকে দেওয়া হয়,
তাহলে নবীজির চৌকাঠের মালিকানাই আমি চাইব।'

অন্য এক কবি বলেন–

تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے
پڑے ہوئے سر راہ گزار ہم بھی ہیں
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

'তোমার এক পলক মায়াবী চাউনিতে সবকিছুই আছে
পথের ধারে পড়ে থাকা দর্শনার্থী আমিও একজন।
যদি নবীজির জুতা মোবারক মাথার ওপর রাখার সৌভাগ্য হয়
তবে আমিও দাবি করব, মুকুটধারী বাদশাহ দেখো আমিও একজন।'

এশকে বেলালীর মূল্যায়ন আল্লামা ইকবালের কবিতায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের কী পরিমাণ ভালোবাসা ছিল, তার কিছুটা ঝলক দেখে নিন নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুলোতে। কবিতার এই চরণগুলো এই অধমকে বিমোহিত করেছে। এমন কবিতার রচয়িতাকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি বাস্তবেই নবীপ্রেমিক ছিলেন। আল্লামা ইকবাল হযরত বেলাল (রাযি.)-এর শানে এমন কবিতা রচনা করেছেন, যা এই বিষয়ের হক আদায় করে দিয়েছে। যখনই এই চরণগুলো পড়ি, রচয়িতার জন্য অন্তর থেকে দু'আ এসে যায়। তিনি লিখেছেন–

چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا
حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا

'তোমার ভাগ্যতারকা যখন জ্বলজ্বল করে উঠল,
তখন হাবশা থেকে তুলে তোমায় হেজাযে নিয়ে এল।'

ہوئی اسی سے تیرے غمکدے کی آبادی
تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی

(হযরত বেলাল (রাযি.) নবীজির খাদেম ছিলেন। সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন, তাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে), 'তুমি তো হাবশার অধিবাসী ছিলে। তোমার ভাগ্যের তারকা জ্বলে উঠেছে যে, তোমাকে হাবশা থেকে উঠিয়ে হেজাযে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

নবীজির দ্বারা তোমার হৃদয় আবাদ হয়েছে (আশার আলো ফুটেছে) হে বেলাল! তোমার গোলামির নামে হাজারবার আজাদিকে কুরবান করলেও কম হবে।

وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے
کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے

'ভালোবাসার বন্ধন মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি। কাউকে ভালোবাসতে গিয়ে বেদনার স্বাদও তুমি আস্বাদন করেছ।'

ভালোবাসতে গিয়ে যদি কেউ বেদনা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন সেই কষ্টের মাঝেও বড় তৃপ্তি পাওয়া যায়। হে বেলাল! নবীজির সঙ্গে ভালোবাসার কারণে কাফের-মুশরিককর্তৃক নির্যাতিত হয়ে তুমি বেদনার স্বাদও গ্রহণ করেছ।

جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں
ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں

'প্রেমের মাঝে যে কষ্ট আছে, সে তো প্রকৃত কষ্ট নয়।
আর কষ্ট যদি না হয়, তবে এমন প্রেমে স্বাদও নেই।'

نظر تھی صورت سلمان ادا شناس تیری
شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری

'হযরত সালমান (রাযি.)-এর মতো মানুষ চেনার দূরদর্শিতা তোমারও ছিল। দর্শনের মদিরা পান করে সেই পিপাসা আরও বৃদ্ধি পেত।'

একবার দেখেছেন তো বারবার দেখার বাসনা জেগে গেছে। হযরত বেলাল (রাযি.)-এর অবস্থা এমনই ছিল।

مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا
تیرے لیے تو یہ صحرا بھی طور تھا گویا

'তোমার দৃষ্টির আলো যেন মদীনা-ই ছিল।
এই মরুভূমি যেন তোমার জন্য কোহেতুর ছিল।'

হে বেলাল! হযরত মুসা (আ.) তো পর্বতের পাদদেশে খোদার তাজাল্লি পেয়েছিলেন; কিন্তু তুমি সেই নূরের তাজাল্লি মদীনার মরুভূমিতে পেয়ে গেছ।

تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید
خنک دلے کہ شپید وودے نیا سائید

'হে বেলাল! তুমি নবীজিকে যতই দেখতে, দেখার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরে আরও তীব্র হয়ে উঠত। শীতল অন্তরটা যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠত, তখন তা এক মুহূর্তের জন্যও প্রশান্ত হত না।'

تپش زشعلہ گرفتند وبر دل تو زدند
چہ برق جلوہ بخاشاک حاصل توزدند

'সেই উত্তপ্ত অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা নবীজির দিদার দ্বারা-ই প্রশান্ত করেছেন। এরপর যত দিন দিদার নসিব হয়নি, সেই অন্তর জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল।'

আহ! কী চমৎকার কথা বললেন! স্ফূলিঙ্গ থেকে তিনি তাপ গ্রহণ করলেন আর সেই তাপ আপনার অন্তরে ঢেলে দিলেন! 'স্ফূলিঙ্গ' উদ্দেশ্য 'আল্লাহর তাজাল্লি'। অর্থাৎ– নবীজি আল্লাহর নূর থেকে মহব্বতের এই উত্তাপ অর্জন করেছেন। তারপর সেই উত্তাপ তিনি তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। আবার আপনিও কম নন। স্বীয় খড়কুটার ওপর আল্লাহর তাজাল্লির আলো টেনে নিলেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

'নবীজিকে দেখা তোমার বড়ই বিনয়ের সাথে ছিল,
তাঁকে দেখা যেন তোমার নামায হয়ে গিয়েছিল।'

হে বেলাল! যখন আপনি নবীজিকে দেখতেন তখন বড়ই বিনয় ও আবেগের সাথে দেখতেন। প্রকৃত আশেকের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। প্রিয়তমকে দেখতে থাকাই তার নামায হয়ে যেত।

اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی
نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بنی

'যুগ যুগ ধরে আযান ছিল তোমার প্রেমের কবিতা
আর নামায ছিল প্রেম প্রকাশের এক বাহানা।'

হে বেলাল! তোমার আযান আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ছিল তোমার প্রেমের কবিতা আর নামাযের মাধ্যমে সেই প্রেমকে তুমি প্রকাশ করতে। আল্লাহু আকবার কাবীরা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও তার প্রিয় হাবীবের প্রকৃত ভালোবাসা দান করুন। আসুন, আমরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুন্নতের অলংকার দিয়ে নিজেদের অলঙ্কৃত করে নিই। সুন্দরীরা অলংকার পরিধান করে ভাবে, তাদের রূপের মধ্যে সমৃদ্ধি হয়েছে। ঠিক তেমনি যখন উম্মত তার নবীর সুন্নতের অলংকার দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করে, তখন আল্লাহর দৃষ্টিতেও তার সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে নবীজির সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মারেফাতের মুক্তা

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কারণে সাহাবায়ে কেরাম চারটি নেয়ামত লাভ করেছেন।

এ বিশ্বাস যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

এ বিশ্বাস যে, আখেরাত চিরস্থায়ী।

এ বিশ্বাস যে, আমরা মূল্যহীন ও দুর্বল।

এ বিশ্বাস যে, একমাত্র আল্লাহই সব কাজ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম এ চারটি বিষয় ভালোভাবে অর্জন করেছিলেন।'

মারেফাতের মুক্তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

আজকের মাহফিলে আমি আমার আকাবিরের কিছু অমূল্য বাণী আপনাদের শোনাব। এতে আপনারা অনেক কিছু শিখেও নিতে পারবেন।

আহ্‌লে ইল্‌মের উপাধি

পবিত্র কুরআনে আলেমদের জন্য 'উলুল ইল্‌ম', 'রাসিখূনা ফিল ইল্‌ম', 'আল্লাযীনা উতুল ইল্‌ম' ও 'আল-উলামা' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো আরেফ তাদের 'উলুল ইল্‌ম' বলেছেন, কেউ 'রাসিখূনা ফিল ইল্‌ম' বলেছেন, কেউ 'আল্লাযীনা উতুল ইল্‌ম' বলেছেন আর কেউ বলেছেন 'আল-উলামা'। এরা ওইসব লোক ছিলেন না, যারা বাহ্যিক উপকরণ অর্থাৎ– ভাষার চাতুর্য আর কথাশিল্পের সূক্ষ্মতা দিয়ে কুরআন বুঝবেন। ভাষা সাহিত্য দিয়ে কুরআন বোঝার চেষ্টাকারীরা 'রাসিখূনা ফিল ইল্‌ম'-এর দলভুক্ত হতে পারে না।

ভাষাজ্ঞান ও কুরআন অনুধাবণ

একব্যক্তি আরবি ভাষা শিখল। এত ভালো আরবি শিখল যে, পুরা কুরআনকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে ফেলল। যতক্ষণ সে অনুবাদ করছিল, ততক্ষণ সে ছিল কাফের। একথা ভিন্ন যে, কুরআনের নূর পরপর্তী কালে তার অন্তরকে ইসলামের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছে এবং সে ঈমান গ্রহণ করে নিল। আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই ব্যক্তির

অনুবাদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও চমৎকার অনুবাদ। এতে বোঝা গেল, ভাষা জানা তেমন কৃতিত্বের বিষয় নয়। ভাষাজ্ঞান দ্বারা তো একজন কাফেরও কুরআন বুঝতে পারেন। অগণিত পাদ্রী আছেন এমন, যারা আরবি ভাষা জানেনও, বলেনও। আপনি যদি তাদের সঙ্গে কথা বলেন, মনে হবে কোনও আরবি ভাষাভাষী কথা বলছে। অনেক লোক এমনও আছেন, আপনি যদি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, তাহলে সে আপনাকে অর্থ বলে দেবে। তো ভাষাজ্ঞানের জোরে কুরআন বুঝে নেওয়ার দ্বারা কেউ 'রাসিখ ফিল ইল্‌ম' হয়ে যায় না। 'আল্লাযীনা উতুল ইল্‌ম'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় না।

হেদায়াতপ্রাপ্ত স্বভাবের অধিকারী

ইল্‌ম এক জিনিস, মালুমাত তথা সাধারণ জ্ঞান এক জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন। যে-বান্দার নিকট রতিবরাবরও ঈমান নেই, তার কাছে ইল্‌ম আসতে পারে না। তার কাছে শুধু মালুমাত তথা সাধারণ জ্ঞান থাকতে পারে। সুতরাং কাফের ও ফাসেক লোকদের নিকট শুধু সাধারণ জ্ঞানই আছে– ইল্‌ম নেই। ইল্‌ম তো এমন এক নূর, যা মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে তোলে। যার কাছে অনেক সাধারণ জ্ঞান আছে, তার নাম আলেম নয়। আলেম তো সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে ইল্‌মের নূর আছে। এ-কারণেই 'রাসিখূনা ফিল ইল্‌ম' শব্দটি কোনো কাফেরের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে না। এ তো কেবল সেই পবিত্র আত্মার অধিকারী মানুষ, যাদের জীবন শরীয়ত ও সুন্নতের ছায়ায় কেটেছে। তাদের নিকট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক ধরনের নূর থাকে, যার দ্বারা তারা দীন ও ইসলামের প্রকৃত ধরন বুঝতে সক্ষম হয়।

এই নূরই ফুকাহায়ে কেরামদের অর্জিত হয়ে থাকে, যার দ্বারা তারা শরীয়তের মেজাজ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তারা যদি কোনো মাসআলা সরাসরি কুরআন বা হাদীছে না পান, তাহলে সেই মাসআলার মতোই ভিন্ন যে-মাসআলা মানসূস আছে, তাকে সামনে রেখে উভয়টির মধ্যে সাদৃশ্য পরিমাপ করে ইজতিহাদ করেন। শরীয়তের মেজাজ সঠিকভাবে অনুধাবনের ফলে তাঁদের ইজতিহাদ শতভাগ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হয়ে থাকে। অন্তরের সেই সুপ্ত নূরের কারণে তারা বিভ্রান্ত হন না, ভুল চিন্তাগুলো তাদের মস্তিষ্কে আসে না, পাপ ও অপবিত্রতা তাদের চিত্তকে স্পর্শও করতে পারে না। কারণ, তারা নবুওতের নূর থেকে জ্যোতিপ্রাপ্ত লোক। তাদের মন-মনন সম্পূর্ণ শরীয়ত অনুযায়ী গঠিত হয়ে গেছে।

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) একবার বলেছেন–

'শরীয়তের অপছন্দগুলো এখন আমার চিত্তের অপছন্দে পরিণত হয়েছে।'

অর্থাৎ– যেসব বিষয়কে শরীয়ত অপছন্দনীয় বলে হুকুম লাগিয়েছে, বাস্তবিকভাবে আমার চিত্তও সেগুলোকে অপছন্দ করে। এরা হলেন সেই লোক, যারা শরীয়তের মেজাজ বোঝেন। সুতরাং শুধু ভাষাজ্ঞানকে পুঁজি করে কুরআন বোঝার দাবি করে وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কখনো সম্ভব নয়। কারণ, তারা ভাষার বাহ্যিক দিকটা বুঝতে পারলেও ভেতরের রহস্য ও মেজাজ তাদের জন্য পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। যেমন– কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

'বরং এগুলো এমন কিছু নিদর্শন, যা ওইসব লোকের বুকে সংরক্ষিত আছে, যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে।'

এবার সেই بَيِّنٰت কী? এটা হলো সেই নেয়ামত, যা তাদের وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ এর উদ্দেশ্যে পরিণত করে দিয়েছে।

যে-বান্দার ভাগ্যে 'নূরে নেসবত', 'নূরে ঈমান' ও 'নূরে একীন' অর্জিত হয়ে যাবে, তার ভাগ্যে 'ফুরকান' জুটে যাবে। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

'যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জন্য 'ফুরকান' বানিয়ে দেন।'[১]

অর্থাৎ– তাকে 'ফুরকান' দান করেন। এই ফুরকান এমন এক নূর, যা লাভ করার পর বান্দা হক-বাতিলের পার্থক্য খুব সহজেই করে ফেলতে পারে। মনে করুন, একটি রুমে পর্যাপ্ত আলো আছে। সেই আলোতে শত্রু-মিত্র পার্থক্য করা আপনার জন্য খুব সহজ হবে। উপকারী বস্তু ও ক্ষতিকর বস্তুর মাঝে পার্থক্য করা খুব সহজ হবে। রশি ভিন্ন দেখতে পারে; সাপও ভিন্ন দেখতে পারে। কিন্তু যদি রুমে আলোর স্বল্পতা হয়, তখন সাপ আর রশিতে পার্থক্য করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, অন্ধকারে আপনি শত্রুকে মিত্র ভেবে মুসাফাহ করতে শুরু করবেন।

---

১. সূরা তালাক : আয়াত ২

ঠিক এভাবেই যাদের অন্তরে 'নূরে নেসবত' থাকে না, শুধু ভাষা জানার ওপর ভিত্তি করে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বোঝার চেষ্টা করে, তারাও অন্ধকারে আছে। তারা সাপ আর রশির পার্থক্য বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সেই নূরে নেসবত থাকে, তা তাদের সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই নূর একটি অদৃশ্য জিনিস– দেখা যায় না; বোঝা যায়।

বোঝা গেল, বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা কুরআনকে বোঝা যায় না। বরং এর জন্য অন্তরের নূরের প্রয়োজন। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়, অভ্যন্তরীণ ইল্‌মওয়ালার জন্য কুরআন বোঝা ঠিক এমনই সহজ যেমন দিনের বেলা পথ চলা সহজ। আর বাহ্যিক ইল্‌মওয়ালার জন্য কুরআন বোঝা ঠিক এমন কঠিন যেমন রাতের আঁধারে পথ চলা কঠিন। হেদায়াতপ্রাপ্ত স্বভাব কিতাবুল্লাহর অর্থ ও মর্মকে বিকৃত হতে দেয় না। সেই নূরপ্রাপ্ত লোকেরা হেদায়াতবিশিষ্ট স্বভাব পেয়েই যান। তারা কথা ঠিক সেভাবেই বুঝে ফেলেন, যেমনটি শরীয়তের মেজাজ ও রুচি।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর মারেফাত

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় প্রবন্ধ ও রচনাবলিতে বিভিন্ন স্থানে খুব মূল্যবান ও হেকমতপূর্ণ নসীহত লিখেছেন। সেই মুক্তার ভান্ডার হতে দু-চারটি মুক্তা আপনাদের কোলে তুলে দিলে মন্দ হবে না। হতে পারে, এর কোনো একটি আপনাদের কারো হৃদয়ের জগত বদলে দেবে।

দুনিয়া ত্যাগের অর্থ কী?

তিনি বলেন, দুনিয়াত্যাগের অর্থ হলো, স্বীয় চিত্তকে কোনো বিশেষ জিনিসের দিকে ঝুঁকতে না দেওয়া।

অর্থাৎ– কোনো বিষয়কে অভ্যাসে পরিণত হতে না দেওয়া। না খাওয়ার মধ্যে এমন কিছু থাকবে, যা তাকে দুর্বল করে দেবে আর না এমন কোনো কাজ, যা তাকে শক্তিহীন করে দেবে। আল্লাহর নেয়ামত পেলাম তো ব্যবহার করলাম; পেলাম না তো পরোয়া নেই। কেউ-কেউ তো এমনও আছে, যারা আইসক্রিম খেতে না পেলে নাক উঁচিয়ে শুঁকতে থাকে; অন্তত ঘ্রাণেই তৃপ্তি পেতে চায়। হযরত মাদানি (রহ.)কে কেউ প্রশ্ন করল, হযরত! আপনার ঠান্ডা খাওয়ার অভ্যাস, নাকি গরম খাওয়ার অভ্যাস? তিনি উত্তর দিলেন, সত্য কথাটা বলি শোনো, আমার তো খাওয়ারই অভ্যাস নেই। তবে প্রয়োজন যখন পড়ে, তখন অবশ্যই খেতে হয়।

সুতরাং দুনিয়াত্যাগের অর্থ হলো 'দুনিয়ার বিলাসিতা পরিত্যাগ করা'। আর 'দুনিয়ার বিলাসিতা পরিত্যাগের অর্থ হলো, শরীয়তের সীমানা ডিঙিয়ে যেসব বিলাসিতা রয়েছে, তা পরিত্যাগ করা। আর যে-নেয়ামত শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে আছে, তা অর্জন করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা-ই প্রকৃত ইবাদত। এটি দুনিয়াত্যাগের মধ্যে পড়বে না।

ভালো পোশাক পরিধান করো এবং শোকর আদায় করো; ছাওয়াব পাবে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনকে দেখে যদি মুচকি হাসে, মন আনন্দিত হয়, তাহলে এটিও আল্লাহর দরবারে ইবাদত হিসেবেই পরিগণিত হয়। যেমন– বর্ণনায় আছে, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে দেখে মুচকি হাসে এবং স্ত্রীও স্বামীকে দেখে মুচকি হাসে, তখন আল্লাহও তাদের দুজনকে দেখে মুচকি হাসেন। আরে ভাই! আল্লাহ তো আল্লাহ-ই; বাবা তো নন! তো আল্লাহ তা'আলাও এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আমার বান্দা ও বান্দী আমার হুকুমের অধীনে থেকে পরস্পরে মহব্বত ও ভালোবাসার জীবন যাপন করছে!

ফরজ আদায়ের স্বাদ

তিনি বলেন– 'যে স্বাদ মানুষ ফরজ ইবাদত আদায় করার সময় পায়, সেই স্বাদে নফসের কোনো প্রভাব থাকে না।'

এটা সম্ভবই নয় যে, কোনো ফরজ আদায়ের সময় নফস আনন্দিত হয়েছে। নফস কখনোই আল্লাহর আনুগত্য পছন্দ করে না। নফসে আম্মারা আল্লাহর ইবাদতে খুশি হতে পারে না। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

'নিশ্চয়ই নফস মন্দের দিকেই আদেশ করতে থাকে।'[১]

সুতরাং শরীয়তের সীমারেখায় থেকে যে-স্বাদই অর্জন করা হবে, তা অবশ্যই ইবাদতের মর্যাদা লাভ করবে। আর সেই ইবাদতে তাওফীক পাওয়ার কারণে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

ঠান্ডা পানি পান করব আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

গরম রুটি খেতে পেলেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

পোলাও-বিরিয়ানি ভাগ্যে জুটলেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

গরম চা-কপি পান করার সুযোগ হলেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৩

এসব হলো আল্লাহর নেয়ামত। এই নেয়ামতসমূহের কারণে সাধনার পথ বন্ধ হয় না যে, অমুকের চা পানের অভ্যাস আছে; অতএব সে সাধনার পথ পাড়ি দিতে পারবে না।

আল্লাহর বান্দাগণ! এসব হলো জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং তা শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে। যখন শরীয়ত নিজেই এগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে, তাহলে তা কীভাবে বাধা হতে পারে? হ্যাঁ, এমন অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়, যেগুলোর কারণে ফরজ আদায়ে অলসতা ও ত্রুটি আসে। নামাযের সময় হয়েছে তো সব কিছু বাদ দিয়ে, আগে নামায; পরে অন্য কাজ। কারো-কারো তো বিশেষ ধরনের কোমল পানীয় পান করার অভ্যাস হয়ে যায়। এক যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বলল, বিগত আট বছর যাবত আমি পানির স্বাদ কেমন বলতে পারব না। আমি বললাম, তাহলে তুমি কী পান করছ? সে বলল, কোক । বলল, কোক পান করবেন? নিয়ে আসব? আমি বললাম, না; ওটা পান করলে আমার গলা চুলকায়।

দুনিয়ার হাকিকত

আমাদের যিকির ও সুলুকের ময়দানে দুনিয়াত্যাগের স্বরূপ হলো সবজি ও গোশতের মতো। আর অবশিষ্ট অজিফাসমূহ লবণ-মরিচ ও ঘিয়ের মতো। যদি লবণ-মরিচ আর তেল না হয়, তাহলে সবজি সেদ্ধ করেও খাওয়া যায়, সেদ্ধ গোশতও কোনোভাবে খাওয়া যায়। কিন্তু সবজি বা গোশতই যদি না থাকে, তাহলে লবণ-মরিচ-তেল দিয়ে কিছুই হবে না, ক্ষুধা নিবারণের কোনো উপায় হবে না।

এজন্য যে-বান্দা যিকির-আযকার খুব করে; কিন্তু দুনিয়ার নাজায়েয স্বাদ যদি ত্যাগ না করে, তাহলে সে সুলুকের পথ অতিক্রম করতে পারবে না। আবার এর অর্থ এ-ও নয় যে, যেহেতু দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে, তাই ছেঁড়াফাটা পোশাক পরিধান করো। বরং তার অর্থ কী তা-ও বুঝে নিন।

আল্লাহ তা'আলা শরীয়তকে এমন সৌন্দর্য দান করেছেন যে, প্রত্যেক বান্দা-ই তার সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের ওপর আমল করবে। যেমন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি সুন্নত রয়েছে। একটি সুন্নত হলো, নবীজি তালি লাগিয়ে পোশাক পরিধান করেছেন। আবার একটি সুন্নত এ-ও আছে যে, তিনি ইয়ামানের উন্নত জুব্বা পরিধান করেছেন, চাদর গায়ে জড়িয়েছেন, যার মূল্য হাজার-হাজার দিনার ছিল। তো তিনি উন্নত পোশাকও

পরিধান করেছেন; আবার তালিযুক্ত পোশাকও পরিধান করেছেন। এখন উভয়টি সুন্নত হয়ে গেছে।

দেখুন, জীবনে একজন মানুষ ধনীও হতে পারে আবার দরিদ্রও। এখন যদি শুধু উন্নত পোশাক পরিধান করা-ই সুন্নত হতো, তাহলে গরিবরা এই সুন্নত হতে বঞ্চিত হয়ে যেত। আর যদি শুধু ফাটা, তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করা-ই সুন্নত হতো, তাহলে ধনীরা বলত, এ সুন্নতটি তো আমাদের জন্য পালন করা সম্ভব নয়। এভাবে দীনকে আমলযোগ্য নয় বলে অভিযোগ উঠত। তো এটি শরীয়তেরই সৌন্দর্য যে, তা সবার জন্য পালন করা সহজ।

অতএব যাকে আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রতা দিয়েছেন, সে তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করে সুন্নত আদায় করবে আর যার ওপর আল্লাহ অগণিত নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, সে নতুন পোশাক পরিধান করে মাসনূন দু'আ পড়বে এবং নবীজির সুন্নতের ওপর আমল করবে। এখন যদি গরিবকে বলা হয়, তুমি মূল্যবান পোশাক পরিধান করে সুন্নতের ওপর আমল করো, তাহলে এটা তার জন্য বোঝা হয়ে যাবে, যা সে বহন করতে পারবে না। আর যদি ধনীকে বলা হয়, তুমি তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করো, তাহলে এটা তার জন্য মসিবত হয়ে যাবে। তো শরীয়তের সৌন্দর্য দেখুন যে, সেখানে ধনী-গরিব উভয়ের জন্যই আমলের সুযোগ আছে।

ভালো খান্দানের কোনো-কোনো মেয়ে; যেমন– যার স্বামী ডাক্তার। এই ডাক্তার স্বামী তার স্ত্রীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি দেখতে পছন্দ করে। এখন তার স্ত্রী যদি বলে, আমি তো সাদাসিধে জীবন যাপন করব। ফলে সে সপ্তাহে একবার গোসল করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। শরীর থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসে। তাহলে বলুন তো, এই মেয়ের সংসার কি থাকবে, না ভেঙে যাবে? এক তো স্বামী ডাক্তার। তার মেজাজও নাজুক। ওপরন্ত শরীর থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ। তো এমন সংসারে অশান্তি আসা, ঝগড়া-বিবাদ হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এমন পরিস্থিতিতে স্বামী তো বলবেই, আমি আরেকটি বিয়ে করছি। এবার অবস্থার পরিবর্তন না করে সে ছুটবে তাবিজ-কবচের পেছনে, হযরতজি! দয়া করে একটি তাবিজ দিন; আমার স্বামী আরেকটা বিবাহ করতে চায়! আরে ভাই! আপনি যদি আপনার স্বামীকে ঘরে ভালোবাসা না দেন, তাহলে সে দ্বিতীয় বিবাহ করবে না তো কী করবে? তোমার তো শোকর করা উচিত যে, দ্বিতীয়টির কথা বলছে; তৃতীয়টির কথা বলেনি।

শরীয়ত মানুষের জীবনে খুব সহজ বিধান রেখেছে। যে-মেয়ের ঘরে উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা আছে, স্বামীও নাজুক মেজাজের, ঘর-বাড়িও সুন্দর

ঝকঝকে, তাহলে এমন মেয়ের জন্য একথা বলা কি উচিত হবে যে, আমি ফাটা-ছেঁড়া পোশাক পরিধান করব; পোশাক যতক্ষণ ফেটে না যায়, নতুন পোশাক পরিধান করব না? মোটেও উচিত নয়। এটা কোনো সুন্নতও নয়।

এতে হেকমত কী? এতে হেকমত হলো, ধনীর জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা সুন্নত; একথা শরীয়ত এজন্য বলেছে, যেন ধনী নতুন-নতুন পোশাক পরিধান করে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং পুরাতন পোশাক গরিব-দুঃখীর মাঝে সদকার নিয়তে বণ্টন করে দেয়। এতে তার পক্ষে নতুন পোশাক পরিধানের সুন্নত আদায় করাও সম্ভব হবে। অপর দিকে আল্লাহ গরিবদের পোশাকেরও একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) একজন ফকীহ্ ছিলেন। তার সাংসারিক খরচাদির যাবতীয় দায়দায়িত্ব এক আল্লাহর বান্দা নিজের ওপর নিয়ে রেখেছিল। লোকটি বড়ই বুদ্ধিমান ছিল। সে বলল, হযরত! আপনি দীনের কাজ করতে থাকুন; আমি আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচাদির দায়িত্ব নিলাম। সে বছরে তিনশো পয়ষট্টি জোড়া জামা বানিয়ে হযরতকে দিত আর হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) প্রতিদিন নতুন পোশাক পরিধান করে পরের দিন তা দান করে দিতেন। এভাবে বছরে তিনশো পয়ষট্টিজন গরিব মিসকিনের পোশাকের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

আমি তো নিজেও বলি, এসব মিল-ফ্যাক্টরীর মালিকরা কেন এক জোড়া জামা দ্বিতীয়বার পরিধান করে। একবার পরিধান করবে; এরপর তা গরিবদের মধ্যে দান করে দেবে। এই এক পোশাকে বেচারা গরিবের সারা বছরের প্রয়োজন পুরণ হয়ে যাবে। তো যার পক্ষে সম্ভব সে এই সুন্নতের ওপর আমল করুন। কথাটা বুঝতে পেরেছেন?

কোনো-কোনো নারী একথা ভাবেন যে, অমুক নারী সুলুকের লাইনে আগে বাড়তে পারবে না। কারণ, সে খুব পরিষ্কার-পরিপাটি পোশাক পরিধান করে। আরে ভাই! পরিষ্কার-পরিপাটি পোশাক পরিধান করা সুলূকের পথে কখনো বাধা নয়। তবে হ্যাঁ; সে যদি ঘরে সব সময় গান্দা-অপরিষ্কার থাকে আর মজলিসে আসে পরিপাটি পোশাক পরিধান করে, তাহলে এটা রিয়া, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যদি তাকে সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা পরিষ্কার-পরিপাটি হয়ে চলতে দেখেন, তাহলে বুঝবেন এটা আল্লাহর নেয়ামত। এর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

একবার এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করল, হযরত! অমুক মহিলা সর্বদা উত্তম পোশাক পরে এবং সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে থাকে; সে সুলূকের পথে

উন্নতি কীভাবে করবে? আমি তাকে বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে বললাম, আপনার তো এই ভেবে শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে, যাক আমার স্বামী আমাকে পরিষ্কার-পরিপাটি রাখে; ভালো পোশাক পরিধান করায়। আপনি কি চান, আপনার স্বামী আপনাকে বছরে মাত্র এক জোড়া পোশাক দেন! এবার সে বলতে লাগল, না-না; তা হবে কেন? আমিও তো পোশাক বানাই।

যাহোক, যখন কথা তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল, তখন বিষয়টি বুঝে গেল। তো লোকেরা যেহেতু শরীয়তের মেজাজ বুঝতে পারে না, তাই এই বিষয়টিকে সুলূকের পথে বাধা মনে করে বসে আছে; অথচ এটা কোনো বিষয়ই নয়। মনে রাখবেন, শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে যা-ই করবেন, কখনোই তা সুলুকের পথে বাধা হতে পারে না।

সাধকের বঞ্চনার কারণ

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, মারেফাতের প্রকাশ কখনো সাধকের জন্য বঞ্চনা ডেকে আনে। মানুষের উচিত, নিজের অবস্থাকে অন্যদের থেকে লুকিয়ে রাখা। বলতে হলে শুধু নিজের শাইখের কাছে বলবে; অন্য কারো কাছে নয়। মনে করুন, কারো কলব জারি হয়ে গেছে। এখন যদি সে লোকদের নিকট বলে বেড়াতে থাকে, ভাই! আমার কলব জারি হয়ে গেছে, তাহলে খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তাকে এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত করে দেবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ জেনে ফেলে, সেটা ভিন্ন বিষয়। নিজেই অন্যদের কাছে বলা ঠিক নয়।

এতে হেকমত কী? হেকমাত হলো, এ-রকম অবস্থাগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের কাছে আমানত থাকে। এগুলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার গোপন রহস্য। সেই রহস্য বান্দা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিক এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

এখন কিছু অবুঝ লোক আছেন, যারা প্রশ্ন করেন, হযরত আপনার কী কাশফ হয়? যিকরে কালবি আপনার হয় কি? এক্ষেত্রে প্রশ্নকারী যেমন ভুল করে, রসহ্য উন্মোচনকারী আরো বড় ভুল করে। এসব হলো গোপন বিষয় আর গোপন বিষয়গুলো গোপন থাকতে দেওয়াই আল্লাহর পছন্দ। কখনো-কখনো আল্লাহওয়ালাদের গলবায়ে হালের কারণে এমনসব কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, যা তার কিছু গোপন বিষয়কে প্রকাশিত করে দেয়। কিন্তু পরবর্তী কালে তার প্রচণ্ড আফসোস হয়। কামেল আল্লাহওয়ালারা কিছুতেই নিজের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করতে চান না। কামেল বান্দার পরিচয়

হলো, ভেতরে-ভেতরে যদিও সে মারেফাতের সুউচ্চ মাকাম অর্জন করে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে একজন সাধারণ মানুষের মতো থাকে। কেউ বুঝতেই পারে না, ইনিও একজন আল্লাহর খাঁটি ছাহেবে নেসবত বান্দা।

আবুল হাসান নূরী নামক এক বুযুর্গ ছিলেন। একবার তিনি এক জেলেকে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। জেলে ছোট-ছোট মাছ শিকার করছিল। তিনি তাকে বললেন, এই জেলে! তুমি বড় মাছগুলো ধরছ না কেন? সে বলল, আপনি ধরে দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে; এই নাও; আমি তোমাকে আড়াই মন ওজনের মাছ শিকার করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি জাল মারলেন। কিছুক্ষণ পর জালে সত্যি-সত্যি আড়াই মন ওজনের মাছ ধরা খেল।

এ-সংবাদ যখন হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর নিকট পৌঁছল, তিনি বললেন, হায় আফসোস! যদি আবুল হাসান নূরীর জালে কোনো সাপ ধরা খেত আর সে তাকে দংশন করত, তবে তা অনেক উত্তম হতো। কারণ, এখন আর তার কাছে এই কাইফিয়্যাত মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে কি-না, এ-বিষয়ে আর কোনো নিশ্চয়তা বাকি থাকল না। কারণ, সে তার কাইফিয়্যাত প্রকাশ করে দিয়েছে।

বন্ধুরা! চিন্তা করে দেখুন, আমাদের বড়রা নিজেদের কাইফিয়্যাতকে কী পরিমাণ লোক চক্ষুর আড়ালে রাখতেন।

আমাদের হযরত পীর যাওয়ার হুসাইন (রহ.)-এর একবার হস্তলিপি শেখার শখ হলো। তাঁর নিকটেই একজন কাতেব ছিল। নাম মুহাম্মদ আ'লা। তিনি তার কাছে হস্তলিপি শিখতে গেলেন। তিন-চার বছর যাবত যাচ্ছেন আর আসছেন। শিখতেন আর চলে আসতেন। হাজী আ'লা সাহেব তাঁকে একজন সাধারণ মানুষই ভাবতেন। চার বছর যাবত প্রতিদিন তার কাছে যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে কাউকে কিছুই জানতে দেননি।

হাজী আ'লা সাহেব বলেন, একবার হযরত মাওলানা বদরে আলম মাদানী (রহ.) আমাদের অঞ্চলে তাশরীফ এনেছিলেন, যিনি 'তরজুমানুস সুন্নাহ' নামক কিতাবের রচয়িতা। আমি তাকে আমার বাড়িতে দাওয়াত দিলাম। আমি মনে-মনে ভাবলাম, হযরত যখন তাশরীফ আনছেনই তো আল্লাহর এই বান্দা (হযরত সাইয়্যেদ যাওয়ার হুসাইন শাহ)কেও দাওয়াত দিই; ভালো মানুষ, কথা কম বলেন। আমি শাহ সাহেবকেও দাওয়াত

দিলাম। উত্তরে তিনি আসবেন বলে জানিয়ে দিলেন। অবশেষে সবাই তাশরীফ আনলেন এবং খাওয়াদাওয়ার পর্বও শেষ হলো। ততক্ষণে ঈশার নামাযের সময় হয়ে গেল।

হযরত যাওয়ার হুসাইন শাহ (রহ.)-এর চেহারা এমনিতেই ধবধবে সাদা সুন্দর ও অকর্ষণীয় ছিল। তার ওপর নূরে নেসবত! হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব শাহ সাহেবকে দেখে বললেন, জনাব! আপনাকে দেখে তো মাওলানা সাহেব মনে হচ্ছে; নামাযটা আপনিই পড়িয়ে দিন। এরপর শাহ সাহেব নামায পড়ালেন। নামায শেষে মাওলানা বদরে আলম সাহেবকে দেখা গেল, তিনি ঘামে ভিজে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! আপনি সুস্থ আছেন তো? কোনও সমস্যা? হাজী সাহেব আমাকে বললেন, মাহফিলে যদি কোনো ছাহেবে নিসবত লোক থাকেন, তাহলে আগেই বলে দেওয়া উচিত, যেন অজান্তে কেউ তার সাথে বেয়াদবি করে না বসে। আপনি তো আমাকে কিছুই বলেননি। আল্লাহু আকবার!

নামাযে তিনি অন্তরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, ইমাম যিনি হয়েছেন, তিনি একজন ছাহেবে নেসবত বুযুর্গ। আমি বললাম, হযরত! আমি কিছুই জানি না। এই লোকটি আজ চার বছর যাবৎ আমার কাছে আসা-যাওয়া করছে। তিনি আমাকে বললেন, দেখো, খোঁজ নাও। লোকটিকে আমার ছাহেবে নেসবত মনে হচ্ছে। যখন মাওলানা বদরে আলম সাহেব চলে গেলেন, তখন আমি ভালোভাবে তার খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। অবশেষে জানা গেল, তিনি আজ থেকে বহু বছর আগেই নেসবত অর্জন করেছেন। শাইখ তাঁকে খেলাফত ও ইজাযত দিয়ে রেখেছেন; কিন্তু তিনি কাউকে তা বুঝতেই দেননি। তিনি বলেন, পরের দিন যখন শাহ সাহেব হাতের লেখা শিখতে এলেন, আমি তাকে আদবের সাথে বললাম, হযরত! এতদিন তো আমি আপনার শিক্ষক সেজে ছিলাম; আপনি ছিলেন ছাত্র। আজ আমি আপনার ছাত্র হচ্ছি; আপনি শিক্ষক হয়ে আমাকে আপনার মতো গোপনভাবে জীবন যাপন করা শিখিয়ে দিন। এরপর তিনি হযরত শাহ সাহেবের মুরীদ হয়ে গেলেন এবং মাশাআল্লাহ খুব নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দায় পরিণত হলেন।

যারা কামেল লোক, তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখেন। এ-কারণেই কামেল লোকদের মাঝেমাঝে চেনাই মুশকিল হয়ে যায়। নবীগণের মধ্যেও এই গুণটি ছিল। কাফেররা তাদের দেখে তারা ভাবত, এরা খুব সাধারণ লোক। এদের জীবনও খুব সাদাসিধে। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলত–

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ

ইনি কেমন রসূল যে, খানাও খান আবার বাজারেও যান![১]

সাধকদের মধ্যেও সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যাকে সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে হবে। অথচ তার মধ্যে বেলায়েতের উঁচু-উঁচু কাইফিয়্যাত থাকবে!

আত্মিক আপ্যায়ন

হাদীছে এসেছে–

مَنْ زَارَ حَيًّا وَلَمْ .... مِنْهُ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا زَارَ مَيِّتًا

'যেব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল আর সেই জীবিত ব্যক্তি তাকে আপ্যায়ন করল না, তো সে যেন একজন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল।'

এজন্যই শরীয়ত পছন্দ করে, কেউ যখন সাক্ষাৎ করতে আসে, তাকে অবশ্যই কিছু-না-কিছু পানাহার করতে দাও; তার আপ্যায়ন ও মেহমানদারি করো। কারণ, সে তোমার অতিথি। আর কিছু না হোক, অন্তত এক গ্লাস পানি হলেও উপস্থাপন করো। এতে সর্বনিম্ন মেহমানদারির দায়িত্ব আদায় হবে।

এই হাদীছটি তো বাহ্যিকভাবে মেহমানদারি সংক্রান্ত। কিন্তু আহলুল্লাহ বুযুর্গগণ বলেন, এটি মাশায়েখগণের ওপর বর্তায়। তাদের কাছে যদি কোনো বান্দা আসে, তাহলে তারা যেন তার রূহানি নাশতাটুকুন অবশ্যই করিয়ে দেন। এ-কারণেই যারা মাশায়েখগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তারা তাদের ওপর অবশ্যই তাওয়াজজুহ দেন। জাহেরী নাশতার পাশাপাশি বাতেনি নাশতাও করিয়ে দেন। অর্থাৎ– আহলুল্লাহগণ প্রত্যেক আগন্তুককে রূহানি আপ্যায়ন করেন।

প্রকাশ্য নসীহতের মন্দ প্রভাব

তিনি বলেন, প্রকাশ্যে নসীহত করা মূলত বকাঝকা করার নামন্তর। প্রকাশ্য ভুলের প্রকাশ্য নসীহত হতে পারে। এমনিভাবে গোপন ভুলের গোপন নসীহত হতে পারে। কারণ, কেউ অপমানিত হোক এটা তো কাম্য নয়।

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৭

হুজুরির কাইফিয়্যাত

তিনি বলেন, হুজুরি সর্বদা ভাগ্যে জোটা খুবই মুশকিল। আপনারা হযরত হানযালা (রাযি.)-এর হাদীছটি শুনেছেন অবশ্যই। তিনি বলেছিলেন–

نَافَقَ حَنْظَلَةُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ

'হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে – হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।'

তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বীকার করেছিলেন এমন কাইফিয়্যাত কখনো-কখনো হয়। তবে এই কাইফিয়্যাতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যদি তা কখনো-কখনোই হয়, তারপরও যদি কিছুক্ষণ থাকে, তার পরবর্তী সময়টুকু খুব প্রশান্তিতে কাটে। যদি এমন অবস্থা মাসে একবারও হয়, তাহলে সারা মাসের প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট।

ছাহেবে নেসবত শান্তির কারণ হয়

তিনি বলেন, একজন ছাহেবে নেসবতের কারণে গোটা জামাতই শান্তিতে থাকেন। আপনারা তো প্রত্যক্ষই করেছেন যে, যদি কোনো মজলিসে একজন ছাহেবে নেসবত বুযুর্গ থাকেন, তখন তার নিকট অবস্থানকারী সকলের মধ্যে পরম প্রশান্তি দেখা যায়। ব্যাপারটা ঠিক এমন যে, যেমন– কেউ সুগন্ধি ব্যবহার করল, এতে নিকটে অবস্থানকারী সকলেই সুগন্ধির সুবাস পায়।

নফসের সঙ্গে ঝগড়া করার ফজিলত

তিনি বলেন, নফসের সঙ্গে এক মুহূর্তের বাকবিতণ্ডা সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। নফসের সঙ্গে ঝগড়া করার অর্থ কী? অর্থ হলো, নফসের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করা, তার যুক্তির খণ্ডন করে বলা যে, আমি তোমার এই ইচ্ছা পূরণ হতে দেব না। নফস বলবে, নাহ! আমার এই ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। তাকে পাল্টা জবাব দিতে হবে, অসম্ভব! আমি তা হতে দেব না। নফসের সঙ্গে নাজায়েয কাজ ও কথা থেকে বাঁচার জন্য এভাবে ঝগড়া করা সত্তর বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

হযরত আয়েশা (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ কখন খারাপ হয়? নবীজি উত্তর দিলেন, যখন সে নিজেকে অন্যদের থেকে বেশি উত্তম ভাবতে থাকে। সেই সময়টা-ই তার জন্য বিপজ্জনক সময়। তখনই তার অধঃপতন ঘটে।

বিপ্লবের মাধ্যম

তিনি বলেন, বিপ্লব সৃষ্টিতে মুখের ভাষার চেয়ে ভাবের ভাষা বেশি কার্যকর।

এক হলো মুখের ভাষা। আরেক হলো অবস্থা ও কাজের ভাষা। এ দুইয়ের মধ্যেও পার্থক্য আছে। মুখের ভাষার অর্থ হলো, মুখ থেকে যা বের হয়। আর অবস্থার ভাষার অর্থ হলো, বক্তার কথা ও কাজের মিল থাকবে।

আপনারা বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। আপনি বসে আছেন। আপনার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাকে বলল, এসো দোস্ত! নামায পড়ি। তখন আপনার মন সঙ্গে-সঙ্গে নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আপনি মসজিদের দিকে পা বাড়াবেন। আর যদি আপনার কাছে একটি টেপরেকর্ডার আছে, সেখান থেকে শব্দ ভেসে আসছে- এসো, নামায পড়ি' এসো নামায পড়ি, এসো নামায পড়ি। বলুন তো, শুধু টেপের শব্দ শুনেই কি আপনি নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন? না, প্রস্তুত হবেন না। কেন? কারণ, টেপ একটি প্রাণহীন বস্তু আর মানুষ হলো প্রাণী। তো প্রাণহীন বস্তুর শব্দে যেমন কোনো প্রভাব থাকে না; অথচ প্রাণবান ও অনুভূতিশীল কেউ কিছু বললে তাতে প্রভাব থাকে; ঠিক এমনিভাবে যখন কোনো বান্দার মাঝে আমল থাকে না; শুধু মুখে-মুখেই ইল্‌ম, তখন তার কথায়ও কোনো প্রভাব থাকে না। আর যে-বান্দার কথার সঙ্গে-সঙ্গে আমলের অভ্যাস হবে, তার কথায় অবশ্যই প্রভাব থাকবে। তার কথা শুনে অন্যদের অন্তরজগত বদলে যাবে।

এ-কারণেই আমাদের মাশাইখগণ প্রথমে নিজে আমল করেন। পরে অন্যদের আমলের জন্য বলেন। আপনি একজনকে একটি কথা বলে দেখুন, সে মানবে না। কিন্তু তাকেই যখন ওই কাজের জন্য কোনো শাইখ বলবেন, দেখবেন সে তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারণ, আহলুল্লাহদের মুখের কথায় এমন প্রভাব থাকে যে, তাদের মুখনিঃসৃত কথায় শ্রবণকারীরা আমল করার তাওফীক পেয়ে যায়।

ওজর ব্যতীত অজিফা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি

তিনি বলেন, যখন কোনো সাধক অপ্রয়োজনে গাফলতের কারণে অজিফা ছেড়ে দেয়, তখন হয় তার ওপর কোনো বিপদ বা পরীক্ষা নেমে আসে অথবা কমপক্ষে হারাম শাহওয়াতের দিকে তার আগ্রহ বেড়ে যায়। যে-বন্ধুরা বলেন, জনাব! দৃষ্টির হেফাযত করতে পারছি না, এরা মূলত, পাবন্দির সাথে

অজিফা আদায়ই করে না। যদি অজিফাগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করা হয় এবং মানুষ আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে হারাম শাহওয়াত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

দুটি মূল্যবান অজিফা

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মাখলুকের সাথে নফসানি, শয়তানি ও শাহওয়ানি বন্ধুত্ব রাখে এবং এই মহব্বত শত চেষ্টা করেও অন্তর থেকে বের করা না যায়, তাহলে আমাদের মাশাইখগণ তার জন্য দুটি আমল বলে দিয়ে গেছেন। এক. সে প্রতিদিন নিম্নের বাক্যটি একশতবার পড়বে–

لَا مَرْغُوْبِيْ اِلَّا اللهُ، لَا مَطْلُوْبِيْ اِلَّا اللهُ، لَا مَحْبُوْبِيْ اِلَّا اللهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

এই চারটি বাক্য দৈনিক একশতবার করে পাঠ করে কলবের ওপর জরব মারলে ইনশাআল্লাহ সে সেসব নিষিদ্ধ মহব্বত থেকে মুক্ত থাকবে।

দুই. দ্বিতীয় আমল হলো, প্রতিদিন আসরের পর যদি পাঁচবার সূরা নাবা (৩০পারার প্রথম সূরা) পাঠ করে, তাহলে এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন ক্রিয়া রেখেছেন যে, এর বরকতে নফসানি মহব্বতগুলো অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে।

'আল্লাহর দিদার'-এর ধরন কেমন হবে?

তিনি বলেন, দুনিয়ায় মানুষের নামাযের যে-কাইফিয়্যাত ও অবস্থা হয়, আখেরাতে সেই অবস্থা নিয়ে আল্লাহর দিদার নসিব হবে। একথার অর্থ হলো, যদি দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তি এমনভাবে নামায আদায় করে যে, নামাযে কোনো ধরনের ওয়াছওয়াসা না আসে, তো কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিও আল্লাহর দিদার এমনভাবে লাভ করবে যে, তার সামনে কোনো পর্দা থাকবে না। যে-পরিমাণ ভিন্ন চিন্তা নামাযে আসবে, আখেরাতে যদিও আল্লাহর দিদার সে লাভ করবে; কিন্তু সেই নামাযে আসা চিন্তাগুলো নূরানি পর্দা হয়ে আল্লাহর নূরানি চেহারার সামনে নড়াচড়া করতে থাকবে। এতে দিদারে এলাহী কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়ে যাবে। আরে ভাই! নববধূর চেহারা ঘোমটাসহ দেখার মজা এক রকম আর ঘোমটা খুলে দেখার মজা আরেক রকম। এজন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন নামায পড়ার তাওফীক দিন, যাতে একটি মুহূর্তের জন্যও দুনিয়াবি চিন্তা অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে।

অতএব সর্বদা এই চেষ্টা থাকা উচিত যে, আমার রুকু-সেজদা যেন লম্বা হয়। দেখুন, কোনো ব্যস্ততা থাকলে নামায সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। তখন ছাওয়াব পরিপূর্ণই পাওয়া যাবে। তবে যদি অবসর বা সময় থাকে এবং ধীরস্থিরভাবে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে রুকু-সেজদা লম্বা করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে যেমন রিযিক বণ্টন করেন, তদ্রূপ বান্দাদের মাঝে তিনি তাঁর প্রশংসা ও ইবাদতের তাওফীকও বণ্টন করে থাকেন। তাই আমরা যেভাবে নিজেদের জন্য রিযিকের প্রার্থনা করি, ঠিক তেমনি আল্লাহর নিকট তাঁর ইবাদত ও প্রশংসার তাওফীকও প্রার্থনা করব। দেখবেন, তারপর কেয়াম করতেই ভালো লাগছে, রুকুতে যেতে ইচ্ছে করবে না, রুকু করবেন; রুকু থেকে উঠতেই মন চাইবে না; এত স্বাদ তখন পাবেন আপনি। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের মাশাইখগণ বলাবলি করতেন–

আজ তো রুকুর রজনি।

আজ তো কেয়ামের রজনি

আজ তো সেজদার রজনি।

তাঁরা সারাটা রাত কেয়াম, রুকু ও সেজদায় পার করে দিতেন।

দৃশ্যত বিপদ; বাস্তবে সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম

যেব্যক্তি সুলুকের পথে চলে, তার ওপর বিপদাপদ আসবেই। একব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মহান আল্লাহকে ও আপনাকে খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবীজি বললেন, ভালোই যদি বাস, তবে বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদের প্রতি বালা-মসিবত কেন প্রেরণ করেন? হাদীছেও আছে–

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ

'যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদে ফেলে দেন।'

মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে অথবা অর্থনৈতিকভাবে অর্থাৎ– কোনো-না-কোনোভাবে তার ওপর মুসিবত চাঁপিয়ে দেন। তখন সালেকের অন্তরে প্রশ্ন জাগে, এমন কেন হয়? পৃথিবীতে তো নিয়ম হলো, যাকে ভালোবাসে তাকে

সুখ-শান্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু এখানে হিসাব অন্যরকম; বন্ধুদের দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে স্বাগতম জানানো হয়।

মাশাইখগণ বলেন, সুখ ও বিলাসিতা আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ তাদের আদেশ করেন, যাও আমার অমুক-অমুক নাফরমান বান্দার কাছে যাও। এরপর বিপদ ও বালা-মুসিবত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্ন করে, হে আল্লাহ! আমরা কোথায় যাব? আল্লাহ তাদের বলেন, যাও! তোমরা আমার বন্ধুদের কাছে চলে যাও। এমন কেন? এর দুটি কারণ আছে। একটু মনোযোগসহ শুনে বোঝার চেষ্টা করুন।

প্রথম কারণ : আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায় ছোটখাটো বিপদাপদ দান করেন আর একে বাহানা বানিয়ে বান্দাকে এমন নৈকট্য দান করেন, যা সে আমল করে অর্জন করতে পারত না। এতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নৈকট্যও লাভ হয়।

দ্বিতীয় কারণ : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর মুসিবত এজন্য পাঠান, যেন বান্দা বিপদে পড়ে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে যায়। যখন বান্দা সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার রঙিন মেলামেশা তার কাছে ভালো লাগে না। যেমন– আত্মীয়রা গীবত করে কুৎসা রটাল। কেউ হিংসা করে ক্ষতি করল, কেউ অন্যভাবে ক্ষতি করতে চাইল। তখন বান্দা সবার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! দুনিয়াতে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

আরে ভাই! এই আল্লাহমুখী হওয়ার জন্যই তো এই বিপদের আয়োজন। আপনার মুখে- 'আল্লাহ ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' বাক্যগুলো উচ্চারিত করার জন্যই তো আল্লাহ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাকে অন্তর দিয়ে এ বিষয়টি অনুধাবন করতে বলছেন যে, 'বান্দা! আল্লাহ ছাড়া আসলেই তোমার আপন আর কেউ নেই।' যদি এই পরিস্থিতি তৈরি না হতো, তাহলে তুমি দুনিয়ার কাউকে আপন ভেবে তার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার রশি বেঁধে রাখতে। পূর্ণ দুনিয়াবিমখুতা অর্জন হতো না।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যে-কষ্ট দেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই যে, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাক এবং বান্দা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যাক। এজন্য বালা-মুসিবত একধরনের রহমত। এটি দৃশ্যত বিপদ; কিন্তু বাস্তবে বড়ই মজাদার জিনিস। এ যেন লবণের মোড়কে পেঁচানো রসমলাই।

প্রকৃত ঈমান কখন অর্জিত হয়?

তিনি বলেন, সুলুকের স্তর পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত ঈমান অর্জন করা। আর এই প্রকৃত ঈমান কেবল 'ফানা ও বাকা'র পরই অর্জিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ফানা ও বাকার স্তরসমূহ অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায় না। 'ফানায়ে কালবি'র অর্থ হলো, মানুষের মধ্যে আল্লাহর চিন্তা ও কল্পনা এত বেশি অর্জিত হওয়া যে, এছাড়া অন্য কিছু তার কল্পনাকে এদিক-সেদিক নিতে পারবে না। আল্লাহর চিন্তা ও ফিকিরের মধ্যে বান্দা এতটা আত্মবিভোর হয়ে যাবে।

খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) ও ইহয়ায়ে সুন্নত

খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) আমাদের সেলসেলার বড়-বড় মাশাইখগণের মধ্যে একজন ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দীনেরও সুলতান বানিয়েছিলেন; দুনিয়ারও সুলতান বানিয়েছিলেন। তাঁর ঘোড়া বাঁধার খুঁটি ছিল রূপার তৈরী। আর রূপার তৈরী খুঁটাগুলো মাটিতে গেড়ে তাতেই ঘোড়ার লাগাম বাঁধা হতো এবং ঘোড়ার পিঠে মূল্যবান কার্পেটের গদি ছিল। সেকালের আলেম হযরত মাওলানা জামী (রহ.) ভাবলেন, আমি গিয়ে হযরতের হাতে বাইআত হই। গিয়ে দেখলেন, হযরত খুব মূল্যবান গদিতে সমাসীন আর আশেপাশের পরিবেশটা একেবারে শাহী পরিবেশ। তিনি এই দৃশ্য দেখে বললেন–

نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد

'সে কামেল পুরুষ নয়, যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকে।'

মাওলানা জামী (রহ.) একথা বলে ফিরে এলেন এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করলেন, এই ব্যক্তির হাতে না বাইআত হব, না তার মজলিসে বসব। কারণ, সে দুনিয়াদার। ফেরার পথে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে এক মসজিদে প্রবেশ করে কিছুক্ষণের জন্য আরাম করছিলেন। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই ঘুমেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। মাওলানা জামী ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে হকের দাবিদাররা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তারা মাওলানা থেকে হকের দাবি করছে। কেউ বলছে, আপনি দুনিয়াতে আমার গীবত করেছিলেন; আমাকে এর ক্ষতিপূরণ দিন। অন্যজন অন্য কারণে হক দাবি করে নেকি চাচ্ছে। দাবিদারদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গেল যে, যদি সারা জীবনের নেকিগুলোও দিয়ে দেয়, তারপরও তা পরিশোধ হবে না।

তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে দেখলেন, বিপরীত দিক থেকে ঘোড়ায় আরোহণ করে একব্যক্তি আসছে। তার পেছনে হাজারো লোক-লশকর আছে। কাছে আসার পর দেখলেন, তিনি উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)। তিনি মাওলানা জামীকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো মাওলানা! খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে! তিনি বললেন- হাঁ হযরত! হকের দাবিদাররা আমার কাছে নেকি চাচ্ছে। এত নেকি তো আমার কাছে নেই। তিনি আদেশ করলেন, হাঁ ভাই! আমার পক্ষ থেকে মাওলানার হকগুলো পরিশোধ করে দাও। আমার একাউন্ট থেকে তার দেনা পরিশোধ করে দাও। একথা বলে হযরত চলে গেলেন এবং মাওলানা জামির চোখ খুলে গেল।

জেগেই মাওলানা জামী বুঝে ফেললেন, আমি যা ভেবেছি, বাস্তবে তা নয়। এখানে অন্য কোনো রহস্য আছে। আমি উঠি; গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই বলে তিনি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে কাশফের মাধ্যমে ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিলেন। তিনি মুসাফাহা করার সময় মাওলানা জামীকে প্রশ্ন করলেন, মাওলানা! প্রথমবার যখন এসেছিলেন, তখন কী মন্তব্য করেছিলেন বলবেন কি? হযরতের উপর্যুপরি পীড়াপীড়ির কারণে তিনি বললেন, হযরত! আমি প্রথমে ভুল বুঝেছিলাম। বলেছিলাম–

نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد

'সে কামেল পুরুষ নয়, যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকে।'

তো হযরত জামী সেই কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌তিটি বলে ছন্দ পুরা করে দিলেন। বললেন–

اگر دارد برائے دوست دارد

'যদি রাখেও, তবে বন্ধুর জন্য রাখে।'

অর্থাৎ– দুনিয়া যদি গ্রহণও করি, তবে তা আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। নিজের জন্য না হওয়া চাই। এরপর তিনি বললেন–

মাওলানা! স্বর্ণ-রুপার খুঁটি মাটিতে গাড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, মানুষের অন্তরে গাড়ার জন্য নয়।

এরপর মাওলানা জামী (রহ.) হযরতের নিকট বাইআত হয়ে গেলেন।

তিনি বলতেন, আমি যদি পীর-মুরীদী করে ফিরতাম, তাহলে মুরীদ করার জন্য লোকই পেতাম না। কিন্তু আমাকে তো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে

পাঠানো হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করল, হযরত! সেই উদ্দেশ্যটা কী? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহ সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। এ-কারণেই তিনি সুন্নতের প্রতি খুব যত্নবান একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর একটি মূল্যবান উক্তি হযরত মুজাদ্দিদে আফফেছানী তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন। তিনি বলেন–

(১) যদি আমাকে সকল আহওয়াল ও ওয়াজদের কাইফিয়্যাতসমূহ দিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু এসবের হাকিকতকে যদি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকাইদ দ্বারা সুসজ্জিত করতে না পারি, তবে আমি এসবের মধ্যে পদস্থলন ও অকল্যাণ দেখতে পাচ্ছি।

(২) তিনি আরো বলতেন, যদি সারা পৃথিবীর সকল কাইফিয়্যাত আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার বাহ্যিকটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকাইদ দ্বারা সুসজ্জিত করে দেয়, তবে আমি এতে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখি না।

সালেকদের উপকার কীভাবে হয়?

তিনি বলেন, যিকিরের উদ্দেশ্য হলো গাফলত দূর করা। কারো তো ইসমে যাতের (আল্লাহ আল্লাহ) যিকিরের দ্বারা উপকার হয়; কারো আবার 'নফী-ইছবাতের' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) যিকিরের দ্বারা উপকার হয়। এটা তবিয়তের পার্থক্যের কারণে হয়। তবে উভয় কাইফিয়্যাতই প্রাথমিক স্তরের লোকদের জন্য। অর্থাৎ– আমার ও আপনার জন্য। যারা মধ্যম স্তরে আছেন, অর্থাৎ– সুলুকের সাধনায় মধ্যম স্তরে আছে, তাদের মধ্যে উন্নতি আসে বেশি-বেশি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আর যারা এর চেয়েও উঁচু স্তরে এবং সুলুকের শেষ স্তরে আছেন, তাদের উন্নতির নোসখা হলো লম্বা-লম্বা নামায। তাহলে প্রাথমিক উন্নতি হয় যিকিরের দ্বারা। মধ্যম স্তরে উন্নতি হয় তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা এবং শেষ স্তরে উন্নতি হয় লম্বা-লম্বা নামাযের দ্বারা।

কলবি যিকিরের উপকার

তিনি বলেন, কলবি যিকির তথা অন্তরের যিকির মানুষকে শরীয়তের বিধিবিধান পালনে সাহায্য করে এবং নফসে আম্মারার অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) ও সুন্নতের গুরুত্ব

ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আফফেছানী (রহ.)-এর অনন্য বৈশিষ্টাবলীর মধ্যে একটি হলো, তিনি সুন্নতের এমন ইহতিমাম শিখিয়েছেন যে, মানুষ তো দেখে হতবাক হয়ে যায়। যেমন–

১. 'দুপুরে খাওয়ার পর কাইলুলার সুন্নত আদায়ের নিয়তে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা এত বড় আমল যে, এর বিনিময় এত ছাওয়াব অর্জিত হয়, যা হাজার বিনিদ্র রজনির ইবাদতের দ্বারাও নসিব হয় না।

চিন্তা করুন! তাঁর একথার দ্বারা মানুষের অন্তরে সুন্নতের প্রতি কী পরিমাণ শ্রদ্ধা তৈরি হবে!

অন্য একস্থানে তিনি বলেন, (সম্ভব হলে আমি এটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতাম) 'আমাদের মাশাইখগণ শরীয়তের মহামূল্যবান মুক্তাগুলো বাচ্চাদের মতো ওয়াজদ ও হালের আখরোট-মনাক্কার বিনিময়ে প্রদান করেন না, নছ থেকে ফাছ-এর দিকে ধাবিত হন না, ফুতুহাতে মাদানিয়্যা থেকে ফুতুহাতে মাক্কিয়্যার দিকে মনোনিবেশ করেন না, যেকোনো নাচিয়ের দিকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাদের কাণ্ডকারখানা অনেক বিশাল। (কথাগুলোর মর্মার্থ সামনে আসছে)।

দেখুন, তিনি শরীয়তের বিধিবিধানগুলোকে মুক্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এতে শরীয়তের কী পরিমাণ মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে! প্রথম বাক্যে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে যে-ওয়াজদের কাইফিয়্যাত, হালের কাইফিয়্যাত, যিকিরের কাইফিয়্যাত এসব আখরোট ও মনাক্কার মতো আর শরীয়তের বিধিবিধানগুলো কী? তা হলো, স্বচ্ছ মুক্তার মতো।

বলুন তো! কোনো লোক কি আখরোট আর মনাক্কার বিনিময়ে স্বচ্ছ মুক্তা গ্রহণ করবে? কখনোই সে এমন সস্তা সওদা করবে না। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক অর্থে যে সালেক হবে, সে শরীয়তের আহকাম পরিত্যাগ করে ওয়াজদ ও হালের পেছনে কখনো ছুটবে না।

সামনে আরো বলেন– 'নছ থেকে ফাছ-এর দিকে ধাবিত হয় না।'

নছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদীছ আর ফাছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরবি ভাষায় রচিত একটি কিতাব 'ফুছুছুল হিকাম'। তো যেখানেই তাসাওউফের কথা কুরআন-হাদীছের সঙ্গে সংঘর্ষিক হয়, সেখানে তাসাওউফের কথা ছেড়ে দিয়ে কুরআন-হাদীছের ওপর আমল করে।

সামনে তিনি আরো বলেন–

'ফুতুহাতে মাদানিয়্যা থেকে ফুতুহাতে মাক্কিয়্যা-এর দিকে ধাবিত হয় না।' অর্থাৎ– ফুতুহাতে মাদানিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের বাণীসমূহ আর ফুতুহাতে মাক্কিয়্যা এটি ইবনে আরবি (রহ.)-এর রচিত একটি কিতাব, যা তাসাওউফের বিষয়ের ওপর রচিত হয়েছে। সামনে তিনি আরো বলেন– 'সকল নাচিয়ের দিকে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না।'

কিছু লোক এমন আছেন, যারা ওয়াজদের হালে এসে নাচানাচি শুরু করে দেন। সেগুলোকে তিনি 'নাচ' অবিহিত করে বলেন, এরা নাচিয়ে। এতেই অনুভব করুন, তিনি সুন্নতের অনুসরণের প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্বের তালীম দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরো একটি কথা লিখেছেন, যা পড়ে হৃদয় জুড়িয়ে যায়। তিনি বলেন– হাদীছে আছে–

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا

'তোমার হিসাব নেয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব নিয়ে নাও।'

আমার (মুজাদ্দিদে আলফেছানী) মতে ঘুমানোর পূর্বে একশত তাসবীহ পাঠ করা (৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪বার আল্লাহু আকবার, যাকে তাসবীহ ফাতেমী বলে) মুহাসাবার অন্তর্ভুক্ত। যেব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে একশতবার তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করবে, অটোমেটিকভাবে তার উক্ত হাদীছের ওপর আমল হয়ে যাবে। কী আজব কথা বললেন তিনি!

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অমূল্যবান মাধ্যম

তিনি বলেন, কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ..)-এর যিকির থেকে বেশি উপকারী অন্য কিছু নেই। কালেমা অসন্তুষ্টির কারণসমূহকে ধ্বংস করে মহান রবের নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়।

আপনি কি জানেন, অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ কী? এখানে অসন্তুষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়ার ভালোবাসা। আল্লাহ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এক মুহূর্তের জন্যও দুনিয়ার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকাননি। দুনিয়া এতটাই অভিশপ্ত। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন–

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ

'দুনিয়া হলো অভিশপ্ত।'

কালেমার দ্বারা অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণসমূহ ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, এই কালেমা অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত মিটিয়ে দেয় এবং বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়।

সালেহ লোকদের সোহবতের ফজিলত

এক ঘণ্টা সোহবতে থাকা মুজাহিদদের কয়েখ চিল্লা হতেও উত্তম। আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ, আপনি হাজার দিন হতে একদিনও সোহবতের জন্য বের করেন না।

নফসের খাহেশাত বিদ্যমান থাকার প্রমাণ

আরো একটি বিস্ময়কর আলোচনা শুনুন। তিনি বলেন– 'যখন কোনো ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম পালনের ক্ষেত্রে কষ্ট অনুভব করে, এতে প্রমাণিত হয়ে যে, তার মধ্যে নফসের খাহেশাত বিদ্যমান আছে। যখন ভেতর থেকে নফসের খাহেশাত শেষ হয়ে যাবে, তখন শরীয়তের আহকামের ওপর আমল করতে বাধা অনুভব হবে না।'

ভাই! যদি কেউ উঠতে-বসতে এবং দৌড়াতে সমস্যা অনুভব করে, তাহলে এটা তার শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। কেউ যদি বলে, আমি চলাফেরা করতে পারি না, ক্লান্ত হয়ে যাই, তাহলে ডাক্তার বলবেন, তুমি অসুস্থ। কেউ যদি বলে, আমি ভারী জিনিস উঠাতে পারি না, তাহলে ডাক্তার তাকে বলবেন, তুমি অসুস্থ। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যখন শরীয়তের বিধিবিধান পালন করতে সমস্যা অনুভব করবে, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, তার মধ্যে নফসের খাহেশাত অবশ্যই বিদ্যমান। আহকামে শরইয়্যাহ পালনে সমস্যা অনুভবই এর প্রমাণ।

'ফানা'-এর পূর্বে 'বাকা'-এর পর নফসের হাকিকত

তিনি বলেন– 'ফানা-এর পূর্বে নফস শয়তান থেকেও বেশি দুষ্টু থাকে। আর বাকা-এর পর নফস মুতমাইন্না হয়ে ফেরেশতাদের থেকেও উত্তম হয়ে যায়।' একথাটি ভালোভাবে মনে রাখবেন; খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।

শরীয়তের অনুসরণ সকল কামালাতের বুনিয়াদ

যে কেউ কামালাত, বেলায়াত ও কামালাতে নবুওত অর্জন করার পরও শরীয়তের বিধিবিধানের অনুসরণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। সকল

কামালাত অর্জনের বুনিয়াদই হচ্ছে শরীয়ত। যেভাবে ফাউন্ডেশন ব্যতীত বিল্ডিং ওপরে ওঠে না, এমনিভাবে শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া কামালাত অর্জন করাও অসম্ভব।

হৃদয়ের আকুতি

আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) একবার শেয়ালকোটে এক বন্ধুর বাসায় মেহমান হলেন। সে হযরতের খুব ভক্ত ও আশেক ছিল। সে হযরতকে সকালে উত্তম নাস্তাও করাত। দুপুরের খানা এবং রাতের বেলাও খুব উত্তম খাবার পরিবেশন করত। সীমাহীন খেদমত করত। সে কয়েকদিন হযরতকে খাওয়াল, খুব আরামে রাখল। একদিন হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, হাজী সাহেব! যখন গরু-মহিষকে মানুষ ভালো খাবার খাওয়ায়, তখন তার থেকে কাজও তো বেশি করে আদায় করা উদ্দেশ্য থাকে। কোনো ইসলাহী প্রোগ্রাম রাখছ না কেন? এ কেমন কথা যে, খুব খাওয়াদাওয়া হলো আর তারপর বিদায়?

আরে ভাই! কাজ তো আপনাদের থেকে আদায় করে নিতে হবে। কারণ, সব সময় তো আপনাদের হাতের লাগালে পাওয়া যায় না। বছরে এই দু-দিনই তো আমরা পাই। প্রথম তিন দিন যেহেতু সাধারণের ইজতিমা হয়, এ-কারণে সবাই নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত থাকি।

যাহোক! হৃদয়ের আকুতি হলো, আপনাদের নিকট বিশুদ্ধ তাসাওউফ পৌঁছে যাক। যে-নেয়ামত আমরা বড়দের কাছ থেকে পেয়েছি, তা আপনাদের নিকট রেখে যাই যেন এই নেয়ামতের হক আদায়কারীদের মধ্যে আমরাও শামিল হয়ে যেতে পারি।

এ-কথাগুলো হয়ত সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়েও আপনি আবিষ্কার করতে পারতেন না। আপনি হয়ত একথাও জানেন না যে, কী পরিমাণ অধ্যয়নের পর বিভিন্ন কিতাব ও পাণ্ডুলিপি হতে হিরা-মুক্তা বের করে আপনাদের সম্মুখে টু দ্য পয়েন্ট আলোচনা করা হচ্ছে।

দুরূদ শরীফ ও কলবি যিকিরের ছাওয়াব

নিজে বানানো যিকিরের চেয়ে দুরূদ শরীফ পড়া বেশি উত্তম। আবার কলবি যিকিরের ছাওয়াব দরূদ শরীফের ছাওয়াব থেকে কয়েকগুণ বেশি। আর উভয়টির ছাওয়াবই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে যায়।

নিজে বানানো যিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেটা নিজের পক্ষ থেকে নির্বাচন করে নেয়। চাই তা সুবহানাল্লাহ হোক, কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক কিংবা অন্য কিছু। পীর বা মুর্শিদের দ্বারা নির্বাচিত যিকির নয়। নিজে বানানো এমন যিকিরের চেয়ে দরূদ শরীফের আমল অনেক উত্তম। তিনি আরো বলেন–

যেহেতু কালবি যিকিরের ছাওয়াব দুরূদ শরীফের ছাওয়াব থেকে কয়েকগুণ বেশি, তাই কেউ যেন না ভাবে, যদি দুরূদ পড়ি, তাহলে নবীজির রওজায় ছাওয়াব পৌঁছাবে আর যদি কালবি যিকির করি, তাহলে পৌঁছাবে না। তাই কালবি যিকির কম করি আর দুরূদ শরীফ বেশি-বেশি পড়ি এমন নয়। কালবি যিকির অবশ্যই করবেন। এর বরকত অপরিসীম। এর দ্বারা আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর আত্মিক উৎকর্ষের কারণে মানুষ কুরআন-হাদীছের তাফসীর বোঝার ক্ষেত্রে দারুণ সাহায্য পায়।

বিপদ ও নেয়ামত কীভাবে?

তিনি বলেন– 'দুনিয়ার বিপদগুলো বন্ধুদের জন্য পুরস্কারের মতো। একব্যক্তির একটাই ছেলে। ঘর ছেড়ে ছেলেটি চলে গেল। বেচারা পিতা সারা দিন শহরের অলিগলি ঘুরেফিরে দেখল, কোথাও ছেলের সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত হয়ে গেল। এখনো খুঁজছে। রাত যখন ২টা বাজছে তখন খুঁজতে খুঁজতে একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পুলিশ তাকে সন্দেহ করে ধরে ফেলল। চোর বা খারাপ লোক মনে করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? এত রাত এখানে কী করছ? সে উত্তর দিল, না, কিছু না, আমি এমনিই ঘুরছিলাম। পুলিশের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। তাকে দু-চারটা ডাণ্ডা মেরে বলল, বস এখানে। এখনই তোর সব রহস্য উদ্ঘাটন করা হবে। লোকটি সুযোগ বুঝে ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাগানের দিকে দৌড়ে পালাল। আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকার বাগানে যখন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল, দেখল তার ছেলেটিও সেখানে লুকিয়ে আছে।

এখন বলুন, ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর পুলিশের ডাণ্ডা মারাকে লোকটি কি পুরস্কার মনে করবে, না শাস্তি? পুরস্কার মনে করবে। সে বলবে, আল্লাহর শেকর যে, পুলিশ আমাকে দু-চারটা ডাণ্ডা মেরে বাগানে পালাতে বাধ্য করেছে। যদি ডান্ডা না মারত, তবে হয়ত আমি এই বাগানে প্রবেশই করতাম না আর আমার ছেলেকেও পেতাম না। আমার তো জানাই ছিল না যে, আমার ছেলে এখানে লুকিয়ে আছে। কী কপাল আমার! তো এই পিতা

ছেলের সন্ধান পাওয়ার ওপর পুলিশের ডাণ্ডাকে যেভাবে পুরস্কার মনে করল, ঠিক তদ্রূপ সালেক আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা বিপদাপদকে নিজের জন্য পুরস্কারই মনে করে থাকে।

সুন্নতের অনুসরণ ও শাইখকে ভালোবাসার ফজিলত

তিনি বলেন– 'দুটি বিষয়ে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এক হলো, সুন্নতের অনুসরণ, দ্বিতীয় হলো, শাইখকে ভালোবাসা। যদি সুন্নতের অনুসরণে কোনো কমতি দেখা না দেয় কিংবা শাইখকে ভালোবাসার মধ্যেও কোনো ত্রুটি দেখা না দেয়, তাহলে কাইফিয়্যাত যেমনই হোক সালেকের জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

কী পাকা কথা বললেন তিনি! সুবহানাল্লাহ! যদি এ দুটি বিষয়ের কোনোটিতে ত্রুটি দেখে, তাহলে বুঝতে হবে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এর অর্থ হচ্ছে, কোথাও-না-কোথাও সমস্যা অবশ্যই আছে।

কুফরের অন্ধকার কীভাবে দূর হয়?

তিনি বলেন– 'কুফরের অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় হয়ে থাকে। শুধু তাওয়াজ্জুহ দিয়ে দূর হয় না। দুটি জিনিস দিয়ে তা দূর হয়। এক. খাঁটি তাওবা দ্বারা অথবা জাহান্নামের আগুন দ্বারা।'

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর একজন খাদেম ছিল। তার ভাই অসুস্থ হয়ে গেল। আল্লাহর ইচ্ছায় সে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হযরতের খাদেম দৌড়ে এসে আরজ করল, হযরত! আমার ভাই তার অন্তিম মুহূর্তে উপনীত। আপনি দয়া করে তার ওপর একটু তাওয়াজ্জুহ দিন, যেন তার শেষ মুহূর্তটা ভালো যায়। খাদেমদের এমন আব্দার মেনে নিতে হয়। হযরত তার সঙ্গে তার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, আমি বহুক্ষণ তার ভাইয়ের অন্তরের ওপর তাওয়াজ্জুহ দিলাম; কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। মুজাদ্দিদে আলফেছানী এত বড় ব্যক্তিত্ব! তিনি বলছেন, 'যখন আমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলাম এবং তারপরও তার অন্তরের কোনো প্রভাব দেখলাম না, সঙ্গে-সঙ্গে আমি আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হলাম– হে আমার মাওলা! ঘটনাটা কী! এরপর আমার জন্য রহস্য উন্মোচিত হলো, তার বন্ধুত্ব ছিল কাফেরদের সঙ্গে। সেই বন্ধুত্বের কারণে তার অন্তর এত অন্ধকাচ্ছন্ন ছিল যে, তা তাওয়াজ্জুহ দিয়েও বিদূরিত

করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন অন্ধকার হয় তাওবা দ্বারা না হয় জাহান্নামের আগুন দ্বারা পরিষ্কার হতে পারে।

প্রত্যাখ্যানযোগ্য কথামালা

তিনি বলেন– 'কাশফ ও ইলহামের ওইসব কথামালা, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি মনে হয়, যেসব বিষয়ে সকল হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম একমত, সেসব কাশফ ও ইল্‌ম গ্রহণযোগ্য নয়; বরং সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে দিতে হবে।'

এটিও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত

তিনি বলেন– 'আহকামে শরইয়্যাহ অনুযায়ী চলাফেরা, উঠা-বসা এসবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এ-ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), যা বলেছেন, তা-ই গ্রহণযোগ্য। আবুবকর শিবলি (রহ.) ও আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর কথা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।'

প্রিয়তমের দেওয়া কষ্টের স্বাদ

তিনি বলেন– 'প্রিয়তমের দেওয়া কষ্ট প্রিয়তমের কৃতজ্ঞতা থেকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক। অর্থাৎ– আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন নেয়ামতরাজি আসতে থাকে, তখন তো একটা ভালো অবস্থা হয়। কিন্তু নেয়ামতের পরিবর্তে যখন আল্লাহর পক্ষ হতে বিপদ ও কষ্ট আসে, তখন সালেকের মধ্যে সার্বিক উন্নতির মান সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়।

বিদ'আতের হাকিকত

তিনি বলেন– 'বিদ'আতের কারণে দীনের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।'

তাসাওউফ অস্থিরতার অপর নাম কীভাবে?

তিনি বলেন– 'তাসাওউফ অস্থিরতার অপর নাম। যে পাক্কা সূফী হবে, সে অবশ্যই অস্থির হবে। সব সময় তার চিন্তা আল্লাহর দিকে ধাবিত থাকে। আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা মাকসাদে হায়াত হয়ে যায়, যেন তার অন্তরে এক ধরনের আগুন লেগে থাকে। সেই আগুনের অপর নামই হলো তাসাউওফ। যখন ভেতরের এই আগুন নিভে যায়, তখন তাসাওউফও বিদায় নিয়ে চলে যায়।'

তো সুফীদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার স্ফূলিঙ্গ থাকে। যখন এই স্ফূলিঙ্গ নিভে যায় এবং ছাই হয়ে যায়, তখন তাসাওউফের কোনো কিছুই তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। যদি অস্থিরতা থাকে, তাহলে রাতে জেগে উঠবে, আল্লাহকে রাজি করবে এবং এজন্য সর্বদা গভীর চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন।

সফলতার একমাত্র পথ

তিনি বলেন– 'সাইয়্যিদুত্তায়িফাহ জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) বলেছেন, সফলতার সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু সেই দরজাটি খোলা আছে, যা দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলেছেন।'

নবীজির উসিলার গুরুত্ব

তিনি বলেন– 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা অবলম্বন ব্যতীত সকল চিন্তাভাবনা, যিকির-আযকার অনর্থক। অর্থাৎ– কেউ যেন একথা মনে না করে যে, যিকির করার দ্বারা আমি সরাসরি আল্লাহর ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে যাব। বরং একজন উম্মতি যা কিছুই পায়, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা মুবারক হয়েই পায়।

প্রকৃত কৃতিত্ব কেমন মানুষের?

তিনি বলেন– 'শাইখ আবূ সাঈদ আবুল খায়ের বলেন, বাতাসে উড়তে পারা তেমন কৃতিত্বের কিছুই নয়। কারণ, মাছিও বাতাসে উড়তে পারে। পানিতে চলতে পারাও তেমন কৃতিত্বের কিছু নয়। কারণ, খড়কুটাও পানির ওপর দিয়ে চলে। অল্প সময়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করাও তেমন কৃতিত্বের কিছু নয়। কারণ, শয়তানও চোখের পলকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বরং প্রকৃত কৃতিত্বের অধিকারী পুরুষ হলো সে, যে সর্বদা সৃষ্টির মাঝে উঠাবসা, চলাফেরা করে ঠিক; কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভোলে না।

প্রকৃত সালেকের গুণ

তিনি বলেন– 'সালেকের মধ্যে কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন– বিপদাপদে বিচলিত না হওয়া, অন্যের দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া,

নিজেকে অন্য মুসলমান থেকে উত্তম মনে না করা, গরিব-মিসকিনের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে নিজেদের আকাবির ও আসলাফের জীবনী সামনে রাখা, গীবত থেকে আত্মরক্ষা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি।'

প্রকৃত মুমিন কে?

তিনি বলেন– 'যেব্যক্তি নেক কাজের আগ্রহ রাখে এবং মন্দ কাজে আল্লাহর ভয় রাখে, হাদীছের পরিভাষায় সে-ই প্রকৃত মুমিন।'

ইবাদতের স্বাদ একটি পুরস্কার

তিনি বলেন– 'ইবাদতের স্বাদ একটি মূল্যবান পুরস্কার। আল্লাহর ইবাদতে খুব চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে তাকিয়ে নাজাতের আশা রাখবে।'

সত্যের অনুসারী হওয়া যাকির হওয়ার দলিল

তিনি বলেন– 'যে-সালেক কোনো বিষয়ে আল্লাহর হুকের অনুসারী হয়, তাহলে এই অনুসরণ আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যে-সালেক কোনো কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে, তাহলে সেই কাজের মধ্যে তাকে যিকিরকারী হিসেবেই গণ্য করা হয়। অর্থাৎ– যতক্ষণ সে শরীয়তের বিধিবিধানের অনুগত, ততক্ষণ তার নাম যিকিরকারীদের তালিকায় লেখা থাকে।'

স্বপ্নের গ্রহণযোগ্যতা

তিনি বলেন– 'স্বপ্নের ওপর নির্ভর করবেন না। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, সে বাদশাহ হয়ে গেছে, তো সে ঘুম থেকে উঠে বাস্তবে বাদশাহ তো আর হয়ে যায় না। আমাদের কোনো-কোনো বন্ধুর মধ্যে স্বপ্ন দেখার খুব শখ দেখা যায়। কেউ তো স্বপ্নের শাহজাদা; প্রতিদিনই নতুন-নতুন স্বপ্ন দেখে।'

'আনফাসে রহীমিয়্যাহ'- হতে কিছু মারেফত

হযরত শাহ আব্দুর রহীম দেহলবি (রহ.) যিনি শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)-এর সম্মানিত পিতা ছিলেন, তাঁর কিছু মূল্যবান বাণী 'আনফাসে রহীমিয়্যাহ' নামক গ্রন্থ থেকে পেশ করছি। সেগুলোও শুনে নিন। এই বাণীগুলোতে তাসাওউফের পরিবর্তে ইল্‌মি বিষয় বেশি থাকবে।

জনসাধারণের মধ্যে মুখের হেফাযত

তিনি বলেন– 'সাধারণ মজলিসে অস্বীকৃত কোনো কথা মুখে এনো না। যদিও তা বাস্তবে বিশুদ্ধ। কারণ, এটা আমজনতার মজলিস; ওলামায়ে কেরামের নয়। জনসাধারণের সম্মুখে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থি।'

কখনো যদি লৌকিকতা করতে হয়, তখন...

তিনি বলেন– 'চলাফেরা, উঠাবসার মধ্যে শক্তিশালী লোকদের ভঙ্গি অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ– শরীর বা মনে যদি দুর্বলতাও থাকে, তথাপি প্রকাশ হতে না দেওয়া উচিত। বরং হিম্মতের সাথে লৌকিকতা করে হলেও সুস্থ ও সাহসী লোকের মতো চলা উচিত।'

যদি সত্যের সন্ধানী পরের মাঝে চলে যায়, তখন...

তিনি বলেন– 'সত্যের সন্ধানী যদি বেগানাদের মাঝে গিয়ে বসে, তাহলে সেখান থেকে তার দ্রুত সরে যাওয়া উচিত। সত্যের সন্ধানী যদি না জেনে এমন-এমন আত্মীয়দের মাঝে উপস্থিত হলো, যেখানে গাফলতের চর্চা হচ্ছিল, গীবত ও পরনিন্দা হচ্ছিল অথবা শরীয়তপরিপন্থি গপশপ হচ্ছিল, তাহলে সে সেখান থেকে দ্রুত উঠে অন্যত্র চলে যাবে। বেগানা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা ভিন্ন রুচির মানুষ।'

একটি কথা ভালোভাবে মনে রাখবেন

তিনি বলেন– 'বছরের-পর-বছর যদি কব্জ-এর কাইফিয়্যাত থাকে, তারপরও নিরাশ হয়ো না। কারণ, হতে পারে এই ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তার বরকতে মুহূর্তের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বিশাল নেয়ামত হস্তগত হবে। কথাটা বুঝে নিন।'

সালেক নিজেকে প্রাথমিক স্তরের মনে করবে

তিনি বলেন– 'সালেক সর্বদা নিজেকে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রই মনে করবে এবং এমনভাবে আমল করবে, যেন এই এখনই সবক পেয়েছে।'

স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিন

তিনি বলেন– 'সালেক যে-কাজ আগামীকাল পরিত্যাগ করবে, তা আজই ছেড়ে দিক। এটাই উত্তম।'

আত্মসমর্পণ

তিনি বলেন– 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে।'

'নুকূশে তরীকত' থেকে কিছু মারেফাত

হযরত আব্দুল আযীয (রহ.)-এর একটি কিতাব আছে 'নুকূশে তরীকত'। সেখান থেকেও কিছু মালফুযাত শুনে যান।

গালবায়ে হালের সময় অযাচিত কথা বলা

তিনি বলেন– 'গালবায়ে হাল তথা বেশামাল অবস্থা তৈরি হয়ে গেলে মুখ দিয়ে অযাচিত কথামালা বের হয়ে যাওয়া মানবিক ওজরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– বৃদ্ধ ও হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা।

বনী ইসরাঈলে এক বৃদ্ধ ছিল, যে আনমনে বলছিল, হে আল্লাহ! আমি জানতে পেরেছি, আপনার স্ত্রী নেই, ছেলে সন্তান কেউ নেই। আপনি আমার কাছে চলে আসুন। আমি নিজহাতে আপনার সেবা-যত্ন করব। নিজহাতে গোসল করিয়ে দেব; চুল আঁচড়ে দেব, ভাত খাইয়ে দেব ইত্যাদি। সে মূলত, আল্লাহর মহব্বতে আত্মহারা হয়ে কথাগুলো বলছিল। এমন কথাগুলো যে তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল, তার কোনো খবরই ছিল না। তো গালবায়ে মহব্বতের কারণে কখনো-কখনো এমন হয়।

'আল্লাহ' শব্দই ইসমে আজম

তিনি শাইখ আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.) থেকে একটি বাণী নকল করেন যে, আল্লাহ শব্দটিই ইসমে আজম। তবে শর্ত হচ্ছে, এটি উচ্চারণ বা কল্পনার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্তরে অন্য কিছু থাকতে পারবে না। কী মধুর কথা বললেন তিনি! ইমাম আজম আবুহানিফা (রহ.)-এর মাযহাব এটিই ছিল। তিনিও বলতেন, ইসমে আযম 'আল্লাহ' (শব্দটি) আমাদের অন্তর যেহেতু গাইরুল্লাহ দিয়ে ভরপুর, এ-কারণে মুখে যদি 'আল্লাহ' শব্দটি বেরও হয়; কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না। আল্লাহ বলেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'আল্লাহর যিকিরের দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।'[১]

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

এ-কারণে আল্লাহ তা'আলার যতগুলো সিফাতি নাম রয়েছে, সেগুলো দিয়ে আপনি লক্ষবার যিকির করুন; সেই প্রশান্তি অন্তরে আসবে না, যে প্রশান্তি 'আল্লাহ' নামের যিকিরের মাধ্যমে লাভ করবেন। তো তিনি বলছেন, অন্যান্য নামসমূহ হতে 'আল্লাহ' শব্দের নামের যিকিরে অন্তরে বেশি প্রশান্তি লাভ হয়।

মৃত্যুর সময় অভ্যাসের আমল জারি হয়ে যায়

একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সময় আঙুল নাড়াচাড়া করছিলেন। সাধারণ যারা ছিল, তারা বুঝতে পারছিল না, এ কী করছেন তিনি। ডাক্তারগণ তার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী উত্তর দিলেন, এই রহস্যের বিষয়টি আমি বুঝতে পারছি। সেটা হলো, হাতের আঙুলে গণনা করে তাঁর তাসবীহ পাঠ করার অভ্যাস ছিল। সারা জীবন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তিনি একাজে অভ্যস্থ ছিলেন। আর মানুষ যে-কাজের অভ্যাস করে থাকে, অচেতন অবস্থায় তা নিজে-নিজেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে প্রকাশ পেতে থাকে।

এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে এল যে, আজ যেব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে কালেমার যিকির করবে, বেশি-বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে; একদিনে হাজার-হাজারবার পড়বে, তাহলে এটি অভ্যাসে পরিণত হওয়ার কারণে মৃত্যুর সময় অনিচ্ছায়ই তার মুখ দিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত জারি হয়ে যাবে।

একব্যক্তি একটা তোতা পাখি পালত। তাকে সে 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলা শিখিয়েছিল। এখন পাখিটা 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে আর লোকেরা তা খুব উপভোগ করে। এমনকি দূরদূরান্ত থেকে লোকজন তাকে এক নজর দেখার জন্য এসে ভিড় করত।

আল্লাহর কী ইচ্ছা! একদিন সে তোতাটা খাঁচায় তো রাখল; কিন্তু খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেল। জনাব বিড়াল সুযোগ বুঝে তার ওপর হামলা করল এবং তোতার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে নিয়ে ছুট দিল। পাখির মালিকের খবর হলো তখন, যখন তোতা পাখিটা টি-টি শব্দ করতে লাগল। শুনেই সে দৌড়ে এসে দেখল, তোতাকে নিয়ে বিড়াল দৌড়ে পালিয়েছে। তোতার মৃত্যুর কারণে সে অত্যন্ত ব্যথিত হলো। এই বেদনায় সে কয়েকদিন চিন্তাগ্রস্ত ছিল।

একদিন সে এক আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং পুরা ঘটনা খুলে বলল। বুযুর্গ তাকে বোঝালেন, আরে ভাই! যা হওয়ার ছিল তা তো হয়েই গেছে। এ নিয়ে দুঃখ করে কী লাভ। সে বলল, হযরত! বুঝলাম, মৃত্যু আসার ছিল, এল, বিড়াল তাকে নিয়ে গেল; কিন্তু একটি বিষয় বড়ই আশ্চর্য লাগল। সেটা হলো, আমি এই তোতাটাকে জীবনভর 'আল্লাহ-আল্লাহ' শব্দটি শিখিয়েছি। এমনকি সারা জীবন সে 'আল্লাহ-আল্লাহ'ই বলত! কিন্তু বিড়াল যখন তার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার মুখ দিয়ে 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'টি-টি' শব্দ করছিল। সারা জীবনের অভ্যাস সে ভুলে গেল। এ বিষয়টি আমাকে খুব বিস্মিত করল।

এবার বুযুর্গ তাকে বোঝালেন, দেখো, তোতা পাখিটার মুখে তো 'আল্লাহ আল্লাহ' ছিল; কিন্তু তার অন্তরে ছিল 'টি-টি' আর মৃত্যুর সময় যেকোনো প্রাণীর মুখ দিয়ে তা-ই বের হয়; যা তার অন্তরে থাকে।

ভাই! আজ যদি আমরাও আল্লাহকে অন্তরে বসাতে পারি, তাহলে মৃত্যুর সময় আমাদের মুখ দিয়ে অনিচ্ছায় কালেমায়ে শাহাদাত বের হয়ে আসবে।

এজাযত ও খেলাফতের উৎস

তিনি বলেন– 'এক হাদীছে আছে, একবার অনেক মহিলা জমা হয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবসর ছিল না। তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন যে, যাও! বাইআত করে নাও। এজাযত ও খেলাফতের পক্ষে এটাই মূল হাদীছ ।'

নবীজি হযরত ওমর (রাযি.)কে পাঠালেন যে, আমি ব্যস্ততার জন্য যেতে পারছি না; আপনি যান এবং আমার প্রতিনিধি হিসেবে বাইআত করে নিন। এমনিভাবে আজকাল যে এজাযত ও খেলাফত দেওয়া হয়, তা-ও এ জন্য দেওয়া হয় যে, এখন কাজ বেড়ে গেছে এবং আমি সবখানে যেতে পারি না, সময় দিতে পারি না, সুতরাং আপনারা যান এবং তাদেরকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে বাইআত করে নিন।

কুমন্ত্রণা ও তার প্রতিকার

একটি কথা খুবই দামি। এক হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। আরেক হলো নফসের কুমন্ত্রণা। যদি এ দুই কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য করতে চান যে, এটা কোনটা থেকে এসেছে, তাহলে এর মাপকাঠি হলো, মানুষ প্রথম সেই কুমন্ত্রণাকে প্রত্যাখ্যান করবে। যদি সেটা বারবার ফিরে আসে, তাহলে

বুঝতে হবে, এটা নফসের কুমন্ত্রণা। আর যদি এর পরিবর্তে আরেকটা আসে, তাহলে বুঝতে হবে, এটা শয়তানি কুমন্ত্রণা। কারণ, শয়তানের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে যে, বান্দা কোনো-না-কোনো পাপে সর্বদা লিপ্ত থাকুক; বড় পাপ করছে না, ঠিক আছে, ছোট পাপই করুক, যদি ছোট পাপও করে না, তাহলে তার চেয়ে আরো ছোটটাই করুক। অর্থাৎ– তার চেষ্টা থাকে, যেভাবেই হোক বান্দাকে পাপে লিপ্ত করতে হবে। যেকোনো উপায়ে হোক কিংবা যেকোনো পাপ হোক।

সুতরাং যখনই কোনো কুমন্ত্রণা আসবে, আপনি তাকে ঝেড়ে ফেলুন। নফস যেহেতু খুব জেদী, তাই সে বলে, আমি তো এই পাপ করাবই, তাই বারবার কুমন্ত্রণা দেয়। তাই বুঝতে হবে, এটা নফসের পক্ষ থেকে আসছে। আর যদি পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন সূরতে আসে, তাহলে বুঝতে হবে, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসছে।

শয়তানি ও নফসানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার কী?

প্রথমত শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার হলো যিকির। পবিত্র কুরআন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا

'যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১]

সুতরাং শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার হলো আল্লাহর যিকির।

নফসানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার হলো, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতকে খানখান করা এবং আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করা।

'মাকতুবাতে রশীদিয়্যাহ' থেকে কিছু মারেফাত

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর একটি কিতাব 'মাকতুবাতে রশীদিয়্যাহ' হতেও কিছু মালফুযাত শুনে নিন।

শোওয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদ পড়া

তিনি বলেন– 'যদি তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে দিনের কাযকর্মে ক্ষতি হয়, তাহলে পড়ে শোওয়াই উত্তম।'

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০১

একথাটি কে বলছেন? যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)। তিনি বলেন, যদি তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে দিনের কাযকর্মে ক্ষতি হয়।' এখানে সম্ভাবনার কথা নয়, সরাসরি ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে। 'তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য শোওয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদ পড়ে নেওয়া উত্তম।'

এখানে হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান আনওয়ারি প্রশ্ন করেছিলেন, হযরত! দিনের কাজে (দুনিয়াদারির); নাকি দীনের কাজে (আখেরাতের আমল)? তখন হযরত উত্তর দিলেন, দিনের কাজেই (অর্থাৎ– দুনিয়াদারির কাজে) এরপর তিনি আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, দিনের বেলায় বান্দা দীনের কাজই তো করে। হালাল রিযিকের সন্ধানে ছোটাছুটি করা কি ইবাদত নয়? যদি কোনো কাজে বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে তো খেয়ানত হয়ে গেল। আর যদি দীনের কাজে বের হয়, তাহলে তা তো দীনেরই কাজ হবে।

যখন যাতের স্মরণের কল্পনা স্থির হয়ে যায়

তিনি বলেন– 'যখন আল্লাহর সত্তার স্মরণ দিয়ে কল্পনা সাজানো হয়, তখন আর মুখের যিকিরের প্রয়োজন নেই।' অর্থাৎ– সর্বদা তাকেই কল্পনা করা হবে। তখন মুখে নাম নেওয়ার আর প্রয়োজন বাকি থাকে না। অন্তরের স্মরণ মুখের স্মরণ থেকে অনেক শক্তিশালী।

নবীর সাহচর্যের ফায়দা

তিনি বলেন– 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কারণে সাহাবায়ে কেরাম চারটি নেয়ামত লাভ করেছেন।

এ বিশ্বাস যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

এ বিশ্বাস যে, আখেরাত চিরস্থায়ী।

এ বিশ্বাস যে, আমরা মূল্যহীন ও দুর্বল।

এ বিশ্বাস যে, একমাত্র আল্লাহই সব কাজ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম এ চারটি বিষয় ভালোভাবে অর্জন করেছিলেন।

তাসাওউফে লেগে থাকা উচিত

তিনি বলেন, বান্দার তাসাওউফে লেগে থাকা উচিত। তাতে হয়ত নেসবত অর্জন হয়ে যাবে; অন্যথায় নেককারদের দলভুক্ত তো অবশ্যই হবে।

যিকিরের জন্য অবসর কেন খুঁজব

যিকিরের জন্য অবসর হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। শয়তান আপনাকে কখনো অবসর হতে দেবে না। বরং সে কোনো-না-কোনো কাজে আপনাকে ফাঁসিয়ে রাখবেই রাখবে। এজন্য যিকিরের স্মরণ আসতেই শুরু করুন; অবসর হওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না।

'সালেকদের রাহনুমায়ী' থেকে মারেফাত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবি (রহ.)-এর একটি কিতাবে 'সালেকীন কী রাহনুমায়ী' হতে কিছু মালুফুযাত শুনে নিন।

ফলাফলের অপেক্ষা

তিনি বলেন–

'যিকিরের সময় সালেকের জন্য ফলাফলের অপেক্ষা করা উচিত নয়; শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির অপেক্ষা থাকতে পারে।'

আত্মতুষ্টি হতে কীভাবে বাঁচবেন?

তিনি বলেন–

'আত্মতুষ্টি হতে বাঁচার জন্য আপনি এভাবে চিন্তা করুন যে, যে নেয়ামত আমি লাভ করেছি, তা তো আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই লাভ করেছি; নিজের যোগ্যতা বলে তা লাভ করতে পারিনি।

গীবতের চিকিৎসা

তিনি বলেন– 'গীবতের সময় এই কল্পনা করো যে, এতে তো অপর ব্যক্তি আমার নেক আমলের মালিক হয়ে যাবে। এটি গীবতের অপূর্ব চিকিৎসা। যখন সে চিন্তা করবে, হায়! আমার কষ্টার্জিত নেক আমলগুলো গীবতের কারণে অন্যের আমলনামায় চলে যাবে, তখন সে গীবত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

নেক আমল করার কারণ

বলুন তো, মানুষের ক্ষমা কি তার আমলের ভিত্তিতে হবে, নাকি আল্লাহর রহমতের ভিত্তিতে? (উপস্থিত সকল শ্রোতা সমস্বরে বলে উঠলেন) আল্লাহর রহমতের ভিত্তিতে হবে।

(এরপর হযরত আকদাস দামাত বারাকাতুহুম বললেন) তাহলে যিকির আর মুজাহাদার প্রয়োজন কী? এর উত্তরে মাশাইখগণ বলেছেন, নেক আমল শুধু মাগফেরাত তথা ক্ষমার জন্যই করা হয় না; বরং গোলামের ওপর মালিকের হক আছে; সেই হিসেবেও করা হয়।

কুধারণার চিকিৎসা

তিনি বলেন– 'যদি কারো প্রতি কুধারণা হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো; তোমার কুধারণার রোগ ভালো হয়ে যাবে।

নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির উত্তম উপায়

তিনি বলেন– 'নামাযে একাগ্রতার জন্য প্রত্যেক রোকন ও আমল অর্থ চিন্তা করে-করে অত্যন্ত ধীরস্থির হয়ে আদায় করবেন; তাহলে আল্লাহ নামাযে একাগ্রতা দান করবেন।'

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষকরণ

প্রথমত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষকরণ নসিব হতে হবে। অন্যথায় কাজে ত্রুটির প্রত্যক্ষকরণ তো হতেই হবে। লক্ষ্য কী? লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহ। যদি আল্লাহর প্রত্যক্ষকরণ নসিব না হয়, তাহলে এ-বিষয়টির প্রত্যক্ষকরণ অবশ্যই হওয়া উচিত যে, আমার নামায সঠিক নয়।

প্রতিশোধপ্রবণতার চিকিৎসা

তিনি বলেন– 'প্রতিশোধপ্রবণতা দমনের উপায় হলো, কয়েকদিন ধৈর্য ধারণ করবে। ব্যস! আশা করি এই প্রবণতা দূর হয়ে যাবে।'

গাইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কখন অপছন্দনীয়

তিনি বলেন– 'মাখলুক তথা গাইরুল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখা অপছন্দনীয়, যা আল্লাহর আনুগত্যে ত্রুটির কারণ হবে; অন্যথায় গাইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অপছন্দনীয় নয়।'

হিংসার চিকিৎসা

তিনি বলেন– 'যেব্যক্তির প্রতি হিংসা হবে, ভরমজলিসে তার প্রসংশা করো এবং মাঝেমধ্যে তাকে হাদিয়া দাও। এ দুটি কাজের মাধ্যমে আশা

করি এর চিকিৎসা হয়ে যাবে। আমরা তো তাকে এক টুকরা হাড্ডি দিতেও রাজি হই না।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ফজিলত

তিনি বলেন– 'হাফেয ইবনে উয়াইনাহ (রহ.) বলেছেন, আমি সকাল-সন্ধ্যা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর জীবনে নবীর সাহচর্য ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনি। হযরত ইবনে উয়াইনাহ (রহ.) একজন উঁচু মাপের মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের জীবনকে হাদীছের আলোতে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, তাঁর জীবন আর সাহাবায়ে কেরামের জীবন প্রায় একই ধরনের, যেখানে নববী আদর্শ ও আমল ব্যতীত অন্য কিছু নেই।

তাওয়াজ্জুহর ফয়েজ

আপনারা যতক্ষণ এখানে মাহফিলে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ তো সামনেই থাকেন; তাওয়াজ্জুহ পড়ে। যখন মাহফিল থেকে চলে যান, তখনও তাওয়াজ্জুহ চলতে থাকে। এই অক্ষম আপনাদের থেকে পৃথক হয় না। এক মুহূর্তের জন্যও এই মজমার কল্পনা আমার মন থেকে পৃথক হয় না। এ-কারণে আপনারা যেখানেই থাকুন, যে-অবস্থায়ই থাকুন নিজেদের অন্তরকে সজাগ রাখবেন, আপনি প্রতি মুহূর্তে তাওয়াজ্জুহর ফজিলত লাভ করতে পারবেন।

সুতরাং এ-সময়গুলোকে মূল্যায়ন করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

'অন্তরে এমন বাসনা হোক যে, তুমি ফকিরদের (আল্লাহর অলিদের) খেদমত করো। এমন মূল্যবান রত্ন রাজাদের ধনভান্ডারে পাওয়া যায় না।'

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کے ارادات ہو تو دیکھ انکو
ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

'এই ছেঁড়া পোশাকধারীদের কথা বলো না। ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত চাও তো তাঁদের দিকে তাকাও। তাঁরা অসীম ক্ষমতাধর হাত আঁচলে লুকিয়ে নীরবে বসে আছেন।'

ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو
وہ رونق انجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں

'অদূরদর্শী চোখ যাকে দেখার জন্য ছটফট করছে, সেই আলো তো এই নির্জনবাসীদের মাহফিলেই লুকিয়ে আছে।'

کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو
کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں

'নিজের অন্তরের লাকড়ির স্তূপকে এমন কোনো স্ফূলিঙ্গ দ্বারা ফুঁ দাও, যেন কেয়ামতের দিনের চন্দ্রও তোমার জ্যোতি থেকে আলো গ্রহণ করে।'

محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا
یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں

'ভালোবাসার জন্য কোনো ভগ্ন হৃদয় তালাশ করা হয় না। এতো সেই শরাব, যাকে রাখা হয় বড়ই নাজুক পেয়ালায়।'

سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق
بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں

'যার সৌন্দর্যের আশেক নিজেই আপাদমস্তক সৌন্দর্যে পরিণত হয়, বলো তো হে সুন্দরের মন! কোনো রূপসীর মাঝে এমন গুণ আছে?'

মুনাফিকের পরিণতি

'মানুষের যাহের তথা বাহির যেমন সুন্দর,তার বাতেন তথা ভেতরটাকে এমন সুন্দর করার জন্য মেহনত করতে হয়। মানুষ যখন তার নফসের ইসলাহ করে, তখন কথা ও কাজের বৈষম্য দূর হয়ে যায়। এক কবি বলেন–

نہنگ و ازدھا وشیر نر مارا تو کیا مرا؟
بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

'কুমির, অজগর, বাঘ, ভল্লুক মেরেছ এমন কী-ইবা মরেছে,
নফসে আম্মারাকে মেরেছ তো সবচেয়ে বড় শত্রুকে
মেরেছ।'

خرد نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

'বিবেক যদিও 'লা-ইলাহা' বলে ফেলেছে তো কী হয়েছে,
অন্তর ও দৃষ্টি যদি মুসলমান না হয়, তবে কিছুই হয়নি।'

বিষয় হলো, মানুষ পরিশুদ্ধ ও মার্জিত হয়ে যাওয়া। শরীরকে সাজানো সহজ; কিন্তু অন্তরকে সাজানো ও পরিপাঠি করা অনেক কঠিন।'

মুনাফিকের পরিণতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

বস্তুর আকৃতি ও হাকিকত

প্রত্যেক বস্তুর একটি বাহ্যিক রূপ থাকে। আরেকটি থাকে হাকিকত তথা অভ্যন্তরীণ রূপ। এমন বস্তুও আছে, যেগুলোর মধ্যে দুটি বস্তুর বাহ্যিক রূপ একই রকম; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ–

দুটি শব্দ লিখতে গেলে একই রকম লিখতে হয়। যেমন– شیر (শের) ও شیر (শীর)। বাহ্যিক রূপ উভয়টার একই রকম; কিন্তু বাস্তবে দুয়ের মধ্যে আসমান-যমিনের পার্থক্য লুকিয়ে আছে। شیر (শের) বলা এমন প্রাণীকে, যে মানুষ খেয়ে ফেলে আর شیر (শীর) বলা হয় এমন দুধকে, যা ছোট্ট শিশুও পান করতে পারে।

পাতলা বাঁশ আর ইক্ষু দেখতে উভয়টি একই রকম মনে হয়। বাহ্যিক রূপ প্রায় একই রকম। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উভয়টি ভিন্ন জিনিস। একটার ভেতরটা মিষ্টি রসে ভরা; অপরটাতে কোনো ধরনের মিষ্টি জিনিসই থাকে না।

এমনিভাবে বাহ্যিক আকৃতিতে দুটি মানুষ যদিও একই রকম মনে হয়; কিন্তু অন্তরের অবস্থা উভয়ের এক রকম হয় না– একজন মুমিন আর অপরজন কাফের।

گر بصورت آدمی انسان بودے

احمد و بو جہل ہم یکساں بودے

'যদি শুধু আকৃতি দিয়েই মানুষের মূল্যায়ন করা হতো, তাহলে আহমাদ (নবীজি সা.)ও আবুজাহ্‌ল একই মানের মানুষ হতেন!'

কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়।

বাতেনের ওপর মেহনত করার প্রয়োজন

মানুষের যাহের তথা বাহির যেমন সুন্দর,তার বাতেন তথা ভেতরটাকে এমন সুন্দর করার জন্য মেহনত করতে হয়। মানুষ যখন তার নফসের ইসলাহ করে, তখন কথা ও কাজের বৈষম্য দূর হয়ে যায়।

এক কবি বলেন–

نہنگ وازدھاوشیر نرمارا توکیامرا؟
بڑے موذی کومارا نفس امارہ کو گرمارا

'কুমির, অজগর, বাঘ, ভল্লুক মেরেছ এমন কী-ইবা মরেছে,
নফসে আম্মারাকে মেরেছ তো সবচেয়ে বড় শত্রুকে মেরেছ।'

خرد نے کہہ بھی دیالاالہ تو کیاحاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

'বিবেক যদিও 'লা-ইলাহা' বলে ফেলেছে তো কী হয়েছে,
অন্তর ও দৃষ্টি যদি মুসলমান না হয়, তবে কিছুই হয়নি।'

বিষয় হলো, মানুষ পরিশুদ্ধ ও মার্জিত হয়ে যাওয়া। শরীরকে সাজানো সহজ; কিন্তু অন্তরকে সাজানো ও পরিপাঠি করা অনেক কঠিন।

ڈھوندنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

'তারকারাজির কক্ষপথ অনুসন্ধানকারী
স্বীয় চিন্তার জগতে সফর করতে পারেনি।
সূর্যের প্রভাকে যে বন্দি করতে সক্ষম হয়েছে
জীবনের অন্ধকার রাতে উষা ফোটাতে পারেনি।'

সারা পৃথিবীকে যারা বৈদ্যুতিক লাইট ইত্যাদি দ্বারা আলোকিত করেছে, নিজের অন্তরের রাজ্যের অন্ধকার নিয়েই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আত্মভোলা হওয়া আল্লাহভোলা হওয়ার নামান্তর

এ-ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো মানুষের অলসতা ও প্রতিবন্ধকতা। কারণ, বিপরীতমুখী দুই বস্তু একত্রিত হতে পারে না। এক হলো আল্লাহকে সন্ধান করা, অপরটি হলো, আল্লাহর অনুসন্ধানে অনাগ্রহ হওয়া। একজনের মধ্যে আল্লাহকে পাওয়ার আগ্রহ নেই; তাহলে সে কী করে আল্লাহকে পাবে? এটা অসম্ভব। বরং এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়, সাধনা করতে হয়। অন্যথায় মানুষ আত্মভোলা হয়ে পড়ে। আর বাস্তবে সে আল্লাহভোলা হয়ে পড়ে। যে নিজেকে ভুলে গেল, সে তার মালিককেও ভুলে গেল।

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা

অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ করা আমাদের দায়িত্ব। আপনি লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরকে নিজের ঘর বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি না জমিনে অবস্থান করি, না আসমানে। আমি মুমিন বান্দার অন্তরে অবস্থান করি।

ভাই! অপরিচ্ছন্ন ঘর তো কারো কাছেই ভালো লাগবে না। আজকাল নারীরা তিন-তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়ে ঘরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে। জিজ্ঞাসা করুন, এই পরিশ্রম কেন করছ? তারা উত্তর দেবে, স্বামী ঘর অপরিষ্কার দেখলে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন তাই। সাধারণ একজন স্বামী-স্ত্রী যদি নিজের ঘর পরিষ্কার রাখাকে স্বীয় দায়িত্ব মনে করে, তাহলে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য কি আমরা নিজেদের অন্তরের ঘরকে পরিষ্কার করতে পারি না। এ অন্তর আল্লাহর ঘর! বান্দার অন্তরই আল্লাহর আরশ! এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, অন্তর যেহেতু আল্লাহর ঘর, তাহলে আল্লাহ কেন তা পরিষ্কার করেন না। ঘরের মালিক তো তিনিই। তাই একে তিনিই তো পরিষ্কার করতে পারেন।

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ঘরে যদি ভাড়াটিয়া থাকে, তখন ঘর পরিষ্কার করার দায়িত্ব তার ওপরই থাকে। এমনিভাবে এই অন্তর এই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের কাছে হাওলাতের মাল। সুতরাং এর পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বও আমাদের ওপর বর্তায়।

অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার দুটি উপায়

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই এই ইচ্ছা জাগে যে, আমি পরিশুদ্ধ হয়ে যাই, ভালো হয়ে যাই। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হবে? এর জন্য দুটি সহজ উপায় আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

১. **দৈনন্দিনের সকল কাজে সুন্নতের প্রতি যত্নবান হওয়া :** মানুষ যদি তার দৈনন্দিনের কাজের ওপর দৃষ্টি বোলায়, তাহলে দেখতে পাবে, কিছু কাজ এমন আছে, যা সে জীবনে বারবার করছে। দশ থেকে পনেরোটি কাজ এমন রয়েছে, যা মানুষ জীবনে প্রতিদিন বারবার করে। যেমন–

১. খাওয়া। মানুষ দিনে কয়েকবার খায়।

২. পান করা। দিনে কয়েকবার পানি পান করতে হয়।

৩. পায়খানায় যাওয়া। দিনে পেশাব ও পায়খানার জন্য দৈনিক কয়েকবার তাকে সেখানে যেতে হয়।

৪. উজু করা। নামাযী ব্যক্তিরা দিনে কয়েকবার উজু করে।

৫. নামায পড়া। দিনে একাধিক ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়।

৬. ঘরে আসা ও যাওয়া।

৭. গোসল করা।

৮. পোশাক পরিবর্তন করা।

৯. ঘুমানো ও সজাগ হওয়া।

১০. পরিবারের লোকদের সঙ্গে সময় কাটানো।

এ হলো এমন কাজের তালিকা, যা প্রত্যেক বান্দা দৈনিক কয়েকবার করে। এমন দশ-পনেরোটি কাজকে সে সুন্নত অনুযায়ী করার অভ্যাস গড়ে তুলুক। সাহস করে, চেষ্টা করে, শিখে-শিখে নিজের অভ্যাসগুলোকে ইবাদতে পরিণত করে নিন। ভাই! খানা তো খেতেই হয়; দস্তরখান বিছিয়েই খান। বসে খান। নিচে বসতে সমস্যা হলে শরীয়তে অনুমতি আছে, কোনো উঁচু জায়গায় বসেই খান; কিন্তু দাঁড়িয়ে কিংবা হেঁটে কখনোই খাবেন না। আজকাল বিয়ে-শাদীতে এমন প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, মেহমানরা প্লেট হাতে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানা খায়।

وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

'লোকেরা এমনভাবে খানা খায় যেমনটা চুতস্পদ জন্তুরা খায়।'[১]

পদ্ধতি বর্জন করে সুন্নত তরিকায় খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ডান হাত দিয়ে খাবেন, নিজের সামনে ও কাছে থেকে খাবেন, চিবিয়ে-চিবিয়ে খাবেন। খাওয়ার আদব সম্পর্কে কিতাবে লিখিত আলোচনাগুলো পড়বেন এবং নিজের খাওয়াকে সুন্নত মোতাবেক বানিয়ে নেবেন। এরপর দৈনিক যখন এভাবে খানা খাবেন, তখন সুন্নত মোতাবেক হওয়ার কারণে এই খানা নিজে নিজেই ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে।

পানি পান করবেন; তো সুন্নত অনুযায়ী পান করুন। দাঁড়িয়ে নয়; বসে পান করবেন। এক শ্বাসে নয়; তিন শ্বাসে পান করুন। পান করার পরের দু'আটিও পড়ে নিন। তাহলে এই পানি পান করাও ইবাদতে পরিণত হবে। বাথরুমে যাওয়ার সময়ও দু'আ আছে, বের হওয়ার সময়েরও দু'আ আছে। দু'আগুলো মুখস্থ করে নিন। বাম পা দিয়ে প্রবেশ ও ডান পা দিয়ে বের হোন। সুন্নত অনুযায়ী বাথরুমে গেলে সেই ছাওয়াব পাওয়া যাবে, যা সুন্নতের খেলাফ নফল নামায পড়েও পাওয়া যাবে না।

ভাই! বাথরুমে তো প্রতিদিনই যেতে হয়। দৈনিক বহুবার যেতে হয়। তাহলে কেন তাকে ইবাদত বানিয়ে নেব না? উজু প্রত্যেক লোককেই করতে হয়। এটা ঈমানদারদের অভ্যাস। তো উজু যদি সুন্নত মোতাবেক করা হয়, তাহলে সেটাও ইবাদতে পরিগণিত হবে। নামায তো পড়তেই হয়। একেও সুন্নত তরিকায় পড়ুন। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কীভাবে থাকবে, আঙুলগুলো কীভাবে থাকবে, কেয়ামের সময় কীভাবে দাঁড়াবে, রুকু-সেজদায় কীভাবে থাকবে, আত্তাহিয়্যাতুর সময় কীভাবে বসবে এসব সুন্নত তরিকায় আদায় করে আমল করুন; এতে ছাওয়াব কয়েকগুণ বেশি হয়ে যাবে।

ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ এবং ঘরে ফিরে এলে কী দু'আ পড়তে হয় তা শিখে নেবেন।

কাপড় পরিধান করার দু'আও মুখস্থ করে নেবেন। হাদীছে আছে, যেব্যক্তি কাপড় পরিবর্তনের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়বে, আল্লাহ তার মাঝে ও জিনদের মাঝে একটি পর্দা ফেলে দেন, যার কারণে জিনরা তার শরীর দেখতে পায় না। বিসমিল্লাহর বরকত এমনই।

রাতে শোওয়ার সময় ঘুমানোর দু'আ পড়ে ঘুমান। জাগ্রত হওয়ার পরের দু'আটিও পড়ুন।

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ১২

মোদ্দাকথা, যে-কাজগুলো আমরা দৈনিক বারবার করি, সেগুলোকে সুন্নত অনুযায়ী বানিয়ে ফেলুন। এভাবে আমাদের জীবনের একটি বড় অংশ সুন্নত মোতাবেক হয়ে যাবে। আর বারবার করার কারণে তা সহজও হয়ে যাবে।

২. **বড়দের থেকে জিজ্ঞাসা করে চলার অভ্যাস করুন :** দ্বিতীয় কাজ হলো, নিজের বড়দের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে চলার অভ্যাস করতে হবে। এতে দীন-দুনিয়া উভয়েই কল্যাণ সাধিত হয়। যদি বড়দের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে না করেন, তাহলে শয়তান আমাদেরকে ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করবে। একথা ভুলে যাবেন না যে, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। একথা আল্লাহই বলে দিয়েছেন–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; তোমরাও তাকে শত্রুই ভেবো।'[১]

শয়তান এত ইতর শত্রু যে, না সে ক্লান্ত হয়, না ঘুমায় আর না কোনো বান্দার ব্যাপারে নিরাশ হয়।

আপনারা আশ্চর্য হবেন, একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আজ শয়তান আমার সামনে একটা জন্তুর আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। আমি তখন নামায পড়ছিলাম, সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। কিন্তু সে আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, আল্লাহ তাকে আটকে রেখেছেন। কিন্তু এতটুকু থেকেও সে বিরত থাকেনি যে, লাফালাফি করে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নামায থেকে মনোযোগ তো সরাতে পারবে।

একটি হাদীছ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে নকল করেছেন– 'একদিন নবীজি কোনো জেহরী নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি সূরা 'আন নাজ্‌ম' তেলাওয়াত করেছিলেন। যখন এ-আয়াতে পৌঁছলেন

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۝١٩ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ۝٢٠

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে? তৃতীয় আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'[২]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৬

২. সূরা নাজম : আয়াত ১৯, ২০

এই আয়াত তেলাওয়াতের পর যখন তিনি শ্বাস নিতে একটু থামলেন, সঙ্গে-সঙ্গে শয়তান হুবহু আওয়াজ করে বলে উঠল, তোমরা সেই দেবীগুলোর পূজাও করো; আল্লাহর পূজাও করো। সাহাবায়ে কেরাম এই আওয়াজ শুনে খুব আশ্চর্য হলেন যে, এ কী! এত দিন তো আমাদেরকে তাওহীদ তথা একত্ববাদের শিক্ষা দেওয়া হলো! এখন এ কিসের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? নামায শেষে সবাই নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো নতুন আয়াত নাযিল হয়েছে কি? তিনি বললেন, না তো কই? আমি তো অন্য কিছু তেলাওয়াত করিনি! এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে পাঠিয়ে জানালেন, হে নবী! আপনি যখন তেলাওয়াতের মাঝখানে অল্প কিছুক্ষণের জন্য থেমে ছিলেন, শয়তান আপনার আওয়াজ নকল করে সাহাবিদের এই ভুল কথাটা শুনিয়ে দিয়েছে। আর এটা তার ধোঁকা ও প্রতারণাসমূহের একটা।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) এটি নকল করার পর বলেন, নবীজির মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে, সাহাবায়ে কেরামের মতো দৃঢ় ঈমানদার লোকদেরকে নামাযের মতো খাঁটি ইবাদতের সময়ও শয়তান যদি প্রতারণা থেকে বিরত না থাকে, তাহলে আমাদের সঙ্গে তার আচরণ কেমন? এজন্য শয়তান থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন– শয়তান এমন এক শত্রু, যে ঘুষও খায় না। কোনো-কোনো শত্রু তো এমনও আছে, যাদের ঘুষ দিলে, পথ ছেড়ে দেয়; কিন্তু শয়তান ঘুষও গ্রহণ করে না। হাঁ! যখন সে পুরো ঈমান ধ্বংস করে ফেলে, তখন বলে, যাও! এখন আর তোমাকে নিয়ে আমার আর মাথাব্যথা নেই। এর আগে সে কারো পিছু ছাড়ে না। সুতরাং সারা জীবন তার ক্ষতি হতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

শয়তানের হামলার ধরন

তার হামলার ধরন আকস্মিক ও বহুমুখী। যেব্যক্তি যে গুনাহের নিকটে আছে, তাকে দিয়ে সেই গুনাহই করায়। কথাগুলো বোঝার মতো। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যেমন–

(১) একব্যক্তি দানশীল, আরেক ব্যক্তি একটু হিসাবী। এখন এদের দুজনের জন্য তার কর্মপদ্ধতি ভিন্ন-ভিন্ন। দানশীলকে সে অপচয় শেখাবে। কারণ, তার মধ্যে দানশীলতার জযবা আছে। তাই তার জন্য খরচ করা সহজ। সুতরাং তার জন্য অপচয়সংশ্লিষ্ট গুনাহগুলো করা সহজ। আর

যেব্যক্তি হিসাবী, তাকে সে কৃপণতা শেখাবে। তার দ্বারা সে কৃপণতার গুনাহ্ করাবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি নেককার হয়, তাহলে তার মধ্যে আত্মতুষ্টি সৃষ্টি করবে। সে যেহেতু নেককার, তাই তাকে নেকি থেকে তো পৃথক করা সম্ভব নয়। তবে আত্মতুষ্টি ও ওজর সৃষ্টি করে তার আমলকে বরবাদ করা সম্ভব। সে তা-ই করবে। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যদি পাপাচারী হয়, তার অন্তরে সে হতাশা সৃষ্টি করবে। তার মধ্যে গুনাহের পরিণতির প্রভাব তো আগে থেকেই আছে, সে বলে বেড়ায়, আর বলো না ভাই! আমি তো জাহান্নামেই যাব। আমি কী করে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারি? অর্থাৎ– তাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে আরো বেশি পাপাচারে লিপ্ত করে দেয়।

(৩) শয়তান অধিকাংশ সময় অন্তরসমূহে হিংসা সৃষ্টি করে। হিংসা এমন জঘন্য একটা রোগ, যা আসমানেও প্রথম গুনাহ হিংসার কারণে হয়েছিল আর যমিনেও প্রথম গুনাহ হিংসার কারণে সংঘটিত হয়েছিল। আসমানে সর্বপ্রথম গুনাহ করেছিল শয়তান। সে হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে হিংসা করেছিল–

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ

'সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং অহংকার করল।'[১]

এমনিভাবে হাবিল-কাবিল পৃথিবীতে প্রথম দু-ভাই ছিল। হিংসার কারণে এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করেছে। তো এই হিংসার গুনাহ নেকি সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দিন-দিন বাড়তে থাকে। সুতরাং এমন গুনাহ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

কল্যাণকামিতার খোলসে শত্রুতা

শয়তান মানুষের অনেক বড় শত্রু। যখন আল্লাহ রব্বুল ইযযত হযরত আদম (আ.)কে জান্নাতে থাকার অনুমতি দিলেন, তখন বলেছেন, অমুক গাছের ফল খেয়ো না। এ ছাড়া জান্নাতে অবস্থান করে আনন্দ করো। হযরত আদম (আ.) আসমানে থাকতেন এবং ফেরেশতাদের আল্লাহর ইবাদত - বন্দেগি করতে দেখতেন। একবার তার অন্তরেও আগ্রহ জাগল, যদি আমিও এমন ইবাদত করতে পারতাম! ফেরেশতারা যেমন লম্বা হায়াত পেয়েছে, আমিও তেমন লম্বা হায়াত পেতাম! তারা যেমন আসমানে থাকে, আমিও

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪

জান্নাতে থাকতাম, এরা যেমন সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে, আমিও তেমন ইবাদতে মশগুল থাকতাম!

তো আদম (আ.)-এর এই আকাঙ্ক্ষা তো ছিল খুবই ভালো। কিন্তু শয়তান সেই আকাঙ্ক্ষা দিয়েই তাকে প্রতারিত করার সুযোগ নিল। সে এসে আদম (আ.)কে বলল, শুনুন! আপনি সর্বদা এখানে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে চান তাই না? তাহলে, এর একটা উপায় আপনাকে বলছি, আপনি অমুক গাছের ফল খান, ব্যস! সর্বদা জান্নাতে থাকতে পারবেন। কখনো জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন না। আল্লাহর ইবাদতও সর্বদা করতে পারবেন। ওই সময় আল্লাহ হযরত আদম (আ.)কে গনদম খাওয়া প্রসঙ্গে নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলিয়ে দিলেন। শয়তান তার কথা বিশ্বাস করানোর জন্য মা হাওয়া (আ.)-এর সম্মুখে কসম খেয়ে বলল–

إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দুজনের কল্যাণকামী বন্ধু।'[১]

দেখুন, যেখানে শয়তানের হামলা কার্যকর হতে পারে, সেখানে সে প্রচণ্ড হামলা করতে কোনো ত্রুটি করেনি। আজও প্রত্যেক পথভ্রষ্টকারীরা কল্যাণকামী হয়েই সামনে আসে। অবশেষে হযরত আদম (আ.) আল্লাহর প্রেমে পড়ে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। ব্যস! ফল খেতে দেরী হয়নি, প্রথমত গায়ে জান্নাতি যে পোশাক ছিল, তা খসে পড়ল, আজও একথাটি নিজস্থানে সত্য প্রমাণিত যে, শয়তানের অনুসারীদের একটি পরিচয় হলো, তাদের শরীর থেকে পোশাক খসে পড়ে। এ যুগের মানুষের দিকে তাকান; বোরকা খসে পড়েছে, টুপি মাথা থেকে নেমে গেছে, পাগড়িও পড়ে গেছে। আজও যত নগ্নতা ও অশ্লীলতা আছে, তা এই শয়তানের কারণেই হয়। এরপর জান্নাত থেকে বহিষ্কারের আদেশ হয়ে গেল। জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ আল্লাহ ফিরিয়ে নিলেন। আজও গুনাহ করার ফলাফল এই হয় যে, আল্লাহ পাপী বান্দা থেকে নিজের নেয়ামত ছিনিয়ে নেন।

এক্ষেত্রে যখন আদম (আ.)কে আল্লাহ প্রশ্ন করলেন, নিষিদ্ধ ফল কেন খেয়েছ? তিনি সহজ-সরল উত্তর দিলেন–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২১

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[১]

হযরত আদম (আ.) আল্লাহর সঙ্গে যুক্তি-তর্ক কিংবা লজিক প্রদর্শনে যাননি। না কোনো বাহানা দেখিয়েছেন; না কোনো দুঃসাহস। বরং সহজ-সরল ভাষায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। আর এই অপরাধ স্বীকার করাকে আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ফলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এখানে মুফাসসিরীনে কেরাম একটি বিস্ময়কর তত্ত্ব লিখেছেন। হযরত আদম (আ.) হতে যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে বাঁচার সর্বশেষ কী উপায় ছিল? উপায়টি ছিল, যখন শয়তান তাকে প্ররোচিত করছিল, তখন নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পূর্বে যদি তিনি একটু আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতেন যে, হে আল্লাহ! আমি সর্বদা জান্নাতে থাকতে চাই; শয়তান আমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছে; আমি কী তার পরামর্শ মেনে নেব? অর্থাৎ– বড়দের সঙ্গে যদি পরামর্শ করে নিতেন, তাহলে শয়তানের হামলা কখনো তার ওপর কার্যকর হতো না।

মূল্যবান নসীহত

আমাদের বুযুর্গানে দীন এমন কিছু নসীহত করেছেন, যা বহু বছর তাদের সাহচর্যে থেকে এই অধম অর্জন করেছে। আজ ফকীর সেই নসীহতসমূহ থেকে কিছু বলতে চায়। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

(১) যেব্যক্তি নিজের দোষত্রুটির দিকে তাকায়, সে অন্যের দোষত্রুটির দিকে তাকানোর সময় পায় না।

অন্যের ত্রুটি তখনই চোখে পড়ে, যখন নিজের ওপর থেকে দৃষ্টি সরে যায়

যখন নিজের দোষের ওপর নজর পড়বে, তখন সবাইকে ভালো মনে হবে। এটাই কামেল মুমিনের পরিচয়।

এক বুযুর্গকে কেউ বলল, হযরত! আমি নিজের দোষের যতই সংশোধন করি, নিজের মধ্যে তত বেশি দোষ দেখতে পাই। বুযুর্গ বললেন, এটাই ঈমানের পরিপূর্ণতার পরিচয়। এজন্যই বড়রা বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তার প্রতি কল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

তাকে তার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে দেন। আর যখন কাউকে অপছন্দ করেন, তখন তার চোখে এমন পর্দা ঢেলে দেন যে, সে নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটিই দেখতে পায় না।

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি তাঁর এক মুরিদকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন। মুরিদ কথাগুলো ফারসি কবিতার আকারে ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

مرا پیر دانائے مرشد شہاب

دواندرز فرمود بروئے آب

یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش

دگر آنکہ بر غیر بدبین مباش

'আমার বিচক্ষণ মুরশিদ সোহরাওয়ার্দি নদীর কূলে বসে দুটি শব্দে আমাকে পুরো তাছাওউফ শিখিয়ে দিয়েছেন। একটি হলো, নিজের গুণ দেখার অভ্যাস গড়ো না। অপরটি হলো, পরের দোষ দেখার অভ্যাস গড়ো না।'

(২) যেব্যক্তি 'তাকওয়া'র পোশাক থেকে বঞ্চিত হয়, তার কাছে পর্দা ভালো লাগে না। মহিলাদের পর্দার সাথে চলতে ভালো লাগে না। তারা বলে, আরে! আসল পর্দা তো চোখের! আরে! শরীয়তে তো চেহারায় কোনো পর্দার বিধান নেই! আমি বলি, কেন নেই? আসলে তাকওয়ার পোশাক তারা খুলে ফেলেছে; এজন্য শরঈ পর্দা তাদের নিকট কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

(৩) যেব্যক্তি আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, অন্যের উন্নতিতে সে কখনো ব্যথিত হয় না। এমন ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে কখনো হিংসাও করে না।

(৪) যে অন্যের জন্য কূপ খনন করে, সে অবশ্যই সেই কূপে পতিত হবে।

(৫) যে অন্যের দোষ বর্ণনা করে, তার দোষও একদিন অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

(৬) যে মানুষের মধ্যে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করবে, সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে। মানুষের মধ্যে যে নিজেকে বড় হিসেবে যাহির করতে চায়, তাকে আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন এবং এমন লোকদের তিনি অবশ্যই

অপমানিত করে ছাড়েন। সত্য কথা বলছি, বড় হওয়ার গোপন রহস্য ছোট হওয়ার মধ্যে। যে নিজেকে বড় বানাতে চায়, তার উচিত প্রথমে নিজেকে ছোট করে ফেলুক।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদাবান করেন।'

(৭) মানুষের সম্পদ লুটপাটকারী চিরদিন মুখাপেক্ষী থাকে।

নিজের আশেপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখুন, যে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তার মুখাপেক্ষিতা কখনো শেষ হয় না। যে ধোঁকা দিয়ে অন্যের সম্পদ লুটে নেয়, অত্যাচার করে, সম্পদ আত্মসাৎ করে, সে চির দিন মুখাপেক্ষী থাকে।

৮. নিজের বিবেকের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি অবশ্যই ধাক্কা খাবে।

মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারীরা সর্বদা অন্যের গালি খায়। আর এই দুর্ব্যবহার ও বদ-আখলাকি আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন।

(১০) কাজে অদক্ষ লোক অবশ্যই ধোঁকা খায়।

দক্ষ লোকেরা বারবার হোঁচট খেয়েই দক্ষতা অর্জন করে। এজন্য দক্ষতা অর্জনের পর আর সে ধোঁকা খায় না।

(১১) খারাপ লোকদের সঙ্গী দুনিয়াতে সর্বদা অপদস্থ হয়।

(১২) যে আল্লাহকে ভয় করবে, তার পরিণতি সব সময় মঙ্গলময় হয়। আর যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তার পরিণতি হয় খারাপ।

পরিতাপের প্রকারসমূহ

আমাদের বড়রা একটি কথা বলতেন। তাহলো, পরিতাপ বা আফসোস চার ধরনের হয়। এক হলো, সারা দিনের পরিতাপ। আরেকটি হলো, সারা বছরের পরিতাপ। আরেকটি আজীবনের পরিতাপ এবং সর্বশেষ সর্বদার পরিতাপ।

সারা দিনের পরিতাপ হলো, ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সারা দিন বাইরে-বাইরে থাকা। এটা সারা দিনের পরিতাপ। ফলাফল শূন্য।

সারা বছরের পরিতাপ হলো, যেমন– সময়মতো ফসল বুনল না, সারা বছর দুর্ভিক্ষের শিকার হলো। সময়মতো ফসল বুনলে এই কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো না। আর আজীবনের পরিতাপ হলো, অসমরুচির পরিবারের

সাথে আত্মীয়তা করা। জীবনভর এর খেসারত দিতে হয়। চোখের পানি শুকিয়ে গেলেও কান্না শেষ হবে না। আর সদা-সর্বদার পরিতাপ হলো, মানুষ দুনিয়ার খাহেশাতের জন্য স্বীয় প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে দেয়। এর জন্য তাকে চিরকালের পরিতাপ বয়ে বেড়াতে হবে।

বর্ণচোরা কাকে বলে?

যদি আমরা চাই, আমাদের ভেতর ও বাইরের বৈপরীত্য শেষ হয়ে যাক, কথা ও কাজের অমিল খতম হয়ে যাক, তাহলে এর জন্য নিজেদের ওপর মেহনত করতে হবে। এই নফসে আম্মারাহ যখন নফসে মুতমাইন্নায় পরিণত হয়, তখন মানুষের ভেতর-বাহিরের বৈপরীত্য খতম হয়ে যায়। এই বৈপরীত্যেরই অপর নাম দ্বিমুখিতা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'নিফাক' বলে। নিফাকের এক অর্থ হচ্ছে সুড়ঙ্গ। কারণ, সুড়ঙ্গে দুটি মুখ থাকে। একটি দিয়ে প্রবেশ করে; অপরটি দিয়ে বের হয়। তো সুড়ঙ্গের যেমন দুই মুখ, তেমনি মুনাফিক ব্যক্তিরও দুই মুখ, দুই চেহারা। একটা দুনিয়াবাসী দেখে, অপরটা দেখে না।

নেফাকের প্রকারসমূহ

এই নেফাক দুই ধরনের হয়। একটা হলো 'নেফাকে আকবর' আর অপরটা হলো 'নেফাকে আসগর'।

নেফাকে আকবরের পরিচয়

নেফাকে আকবর বলে বিশ্বাসের নেফাককে। বাহ্যিকভাবে তো ইসলাম কবূল করল; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ইসলাম ধর্মের ওপর সন্তুষ্ট নয়; বরং কাফের ও কুফরি তার কাছে ভালো লাগে। এমন মুনাফিকের প্রতি আল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট হন। যেমন– সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা চারটি আয়াত ঈমানদারদের বিষয়ে নাযিল করেছেন আর মুনাফিকদের বিষয় নাযিল করেছেন তেরোটি আয়াত। সেখানে তিনি মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, অনুমান করে দেখুন, আল্লাহ রব্বুল ইযযত মুনাফিকি চরিত্রকে কী পরিমাণ অপছন্দ করেন। তো এমন বান্দার বাহির তো হয় মুসলমান; কিন্তু অন্তর কাফের থাকে। ফলাফল কী? এমন বান্দা সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকবে। আর জাহান্নামের কোন স্থানে থাকবে?

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে।'[১]

'সর্বনিম্ন স্তর'-এর ব্যাপারে হযরত কা'ব আল আহবার (রাযি.) বলেন–

إِنَّ فِي النَّارِ لَبِئْرًا مَّا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا بَعْدَ مُغْلَقَةٍ مَا جَاءَ عَلٰى جَهَنَّمَ يَوْمٌ مُنْذُ خَلَقَهَا اللهُ تَعَالٰى إِلَّا تَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا فِي تِلْكَ الْبِئْرِ مَخَافَةَ اذا فُتِحَتْ تِلْكَ الْبِئْرُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهَا عَذَابُ اللهِ مَالَا طَاقَةَ لَهَا وَلَا صَبْرَ لَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ الدَّرْكُ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ

জাহান্নামের মধ্যে একটি কূপ আছে, যখন তাকে বন্ধ করা হয়েছে তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তার দরজা কখনো খোলা হয়নি। স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন সেই কূপ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেন? কারণ, যদি সেই কূপের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তাতে এমন ভয়াবহ তাপ আছে যে, স্বয়ং জাহান্নামই তার তাপদাহে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এত তাপ হবে তার আগুনে। সেই ভয়াবহ কূপেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের নিক্ষেপ করবেন।

নেফাকে আসগর-এর পরিচয়

অপরটা হলো নেফাকে আসগর। এর অপর নাম আমলি নেফাক। অর্থাৎ– কথা ও কাজের অমিল। আমরা একে দোমুখী আচরণ বলে থাকি। অর্থাৎ– ওপর দিয়ে খুব নেককার, ভেতরে-ভেতরে ফাসেক ও পাপাচারী। এই আমলি নেফাককে আল্লাহ রব্বুল ইযযত খুবই অপছন্দ করেন। যেমন– হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ

এমন আমলি মুনাফিকির নিদর্শন মোট তিনটি।

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে।

হাফেয হয়ে গেছে, আলেম হয়ে গেছে, ওয়াজ-নসীহতও শুরু করে দিয়েছে; কিন্তু মিথ্যা বলা ছাড়তে পারেনি। এটা মুনাফিকির আলামত।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৫

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

যখন ওয়াদা করে, তখন ওয়াদা ভঙ্গ করে।

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

যখন তার কাছে কেউ আমানত রাখে, তা খেয়ানত করে।

অন্য হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন–

أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا

'যার মধ্যে চারটা স্বভাব পাওয়া যাবে, সে পাক্কা মুনাফিক হবে। আর যার মধ্যে এই চারটার যেকোনো একটা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব পাওয়া যাবে যতক্ষণ-না সে তা পরিত্যাগ করবে।

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

যখন তার কাছে কেউ আমানত রাখে, তাতে সে খেয়ানত করে।

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

যখন কথা বলে, মিথ্যা কথা বলে।

وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

যখন ওয়াদা করে, ওয়াদা ভেঙে ফেলে।

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন গালাগালি করে।

আপনি দেখবেন, কত সূফী সাহেব এমন আছেন, যিনি রাগের মাথায় ছোট্ট শিশুর কিংবা স্ত্রীর সামান্য বিষয় নিয়ে গালাগালি শুরু করে দেয়। একেবারে মা-মাসি তুলে গালাগাল করে। এটাও একটা মুনাফিকি স্বভাব।

মুনাফিকি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এই নেফাক বৃদ্ধি পাওয়ার কিছু কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ 'মিথ্যা' : মিথ্যাকে মানুষ অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। 'আমি তো তার সঙ্গে মশকারা করছিলাম।' এই শয়তান এত বদবখত ও অভিশপ্ত যে, সে মিথ্যার নাম পরিবর্তন করে রেখে

দিয়েছে রসিকতা। উদ্দেশ্য, মিথ্যার কারণে যে ঘৃণা আসত, তা থেকে যেন নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

স্ত্রী বলে, আমি রসিকতা করেছিলাম। স্বামী বলে, আমি রসিকতা করেছিলাম। ছাত্রও বলে, আমি একটু রসিকতা করছিলাম। এই রসিকতা কী জিনিস? প্রকৃত অর্থে এ তো মিথ্যা।

দ্বিতীয় কারণ 'রিয়া' : দ্বিতীয় যে-কারণে নেফাক বৃদ্ধি পায়, তাহলো 'রিয়া' বা লোক দেখানো স্বভাব। পুরুষদের মধ্যে তো এটা আছেই; নারীদের মধ্যে আরো বেশি পাওয়া যায়। দেখা যায়, মহিলারা যদি বড় আলেমাও হয়ে যায়, তারপরও রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। সবসময় এই চিন্তা থাকে যে, লোকে কী বলবে! যেন সমস্ত আমল মানুষকে দেখানোর জন্যই করছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করছে না। এই রিয়া অন্তর থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন।

তৃতীয় কারণ 'দূরদর্শিতার অভাব' : তৃতীয় যে কারণে নেফাক বৃদ্ধি পায়, তাহলো দূরদর্শিতার অভাব। ইল্‌ম তো এসে যায়; কিন্তু দূরদর্শিতা অর্জিত হয় না, অন্তরের চক্ষু বন্ধ থাকে। অন্তর ভালো-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

চতুর্থ কারণ তাকওয়ার অভাব : চতুর্থ যে কারণে নেফাক বৃদ্ধি পায়, তা হলো তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির অভাব। এ-কারণে সাহাবায়ে কেরাম নেফাককে খুব ভয় করতেন এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ

'হে আল্লাহ! আমি নেফাকের আতঙ্ক থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।'

নেফাক থেকে বাঁচার উপায়

এই নেফাক থেকে বাঁচার উপায় কী? অপমৃত্যুর ভয়। বান্দা যখন ভয় পাবে যে, আমার পরিণাম যদি খারাপ হয়; আমি যদি নেফাক নিয়েই মৃত্যু বরণ করি, তাহলে তো জাহান্নামের অতলে গিয়ে নিক্ষেপিত হব। তখন তার জন্য ভেতর-বাহিরের পার্থক্য দূর করা সম্ভব হবে।

হযরত আবূদ্দারদা (রাযি.) কসম খেয়ে বলেন, যার মধ্যে খারাপ মৃত্যুর ভয় না থাকবে, মৃত্যুর সময় তার ঈমান বিদূরিত হয়ে যাবে।

অপমৃত্যুকে ভয় করার সুফল

ওলামায়ে কেরাম খুবই আজব কথা লিখেছেন, মূর্খরা যদি অপমৃত্যুকে ভয় করতে শুরু করে, তখন তারা ইল্‌ম অর্জনের চেষ্টা করবে।

আলেম যদি অপমৃত্যুকে ভয় করে, সে গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে। আর যদি আমলওয়ালা ব্যক্তির মধ্যে অপমৃত্যুর ভয় এসে যায়, তখন সে ইখলাস অর্জনের চেষ্টা করবে।

ইখলাস না থাকার ভয়

সুতরাং শরীর বেঁচে থাকে রূহ-এর কারণে। রূহ যদি শেষ হয়ে যায় শরীরও শেষ হয়ে যাবে, গলে-পচে যাবে। এমনিভাবে ইল্‌ম বেঁচে থাকে আমলের কারণে। আমল বেঁচে থাকে ইখলাসের কারণে। ইখলাস বেঁচে থাকে ইখলাস হারানোর ভয়ের কারণে। তখন বান্দা এই ভয়ে থাকে যে, হায়! আমার ইখলাস প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে না তো!

সুফিয়ান ছাওরি (রহ.)-এর অপমৃত্যুর ভয়

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) কাঁদছিলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, তোমার দ্বারা কি কোনো ভুল হয়ে গেছে; কোনো গুনাহ হয়ে গেছে? তিনি তাঁর সামনে পড়ে থাকা একটা গমের দানা হাতে নিয়ে বললেন, খোদার কসম! আমি আমার প্রভুর সঙ্গে একটা গমের দানাপরিমাণও নাফরমানি করিনি। বন্ধু বলল, তাহলে কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে আল্লাহ ঈমানের যে-নেয়ামত দান করেছেন, মৃত্যুর সময়ও তা বাকি থাকবে কি-না! সেই ভয়েই আমি কাঁদছি।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অপমৃত্যুর ভয়

হযরত আয়েশা (রাযি.) আল্লাহর হাবীবের প্রিয়তমা ছিলেন। নবীজির প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যেও অপমৃত্যুর ভয় এত প্রবল ছিল যে, তাহাজ্জুদের নামাযে একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ

'তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যার কল্পনাও তারা কখনো করেনি।'[১]

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৪৭

সারা রাত তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে কাটিয়ে দিলেন। কে জানে, কেয়ামতের দিন কোনো গোপন বিষয় আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, যার ধারণাও তাদের ছিল না।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর অপমৃত্যুর ভয়

হযরত ওমর (রাযি.) কোথাও সফরে বের হলেন। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলেন। পথে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখলেন, পাশেই একটি ইহুদি ইবাদতখানা। এক ইহুদি হাতে কাগজ-কলম নিয়ে তার কাছে এসে বলল, আপনি আমাকে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিন। মানে আপনি যদি কখনো বাদশাহ হন, তাহলে আমি আপনার নিরাপত্তার আওতায় থাকব। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আমি তো এমন কিছু কখনো কল্পনাও করিনি; বাস্তবতা তো বহু দূরের কথা। ইহুদি বলল, হবেন কি হবেন না সেটা পরের কথা; এখন লিখতে সমস্যা কোথায়? তার পীড়াপীড়ির কারণে তিনি লিখে দিলেন, যদি আমি কখনো বাদশাহ হই, তাহলে এই ইহুদি আমার নিরাপত্তায় থাকবে। প্রসঙ্গ এসেছিল, সেখানেই শেষ হয়ে গেল।

আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত ওমর (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজেতা হলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার পর সেই ইহুদি 'নিরাপত্তাপত্র' নিয়ে ওমর (রাযি.)-এর নিকট এসে উপস্থিত। বলল, আপনি এত বছর পূর্বে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি সেদিন কেন আমার দ্বারা এই নিরাপত্তা পত্রটি লিখিয়েছিলে? ইহুদি বলল, আমি তাওরাতের একজন আলেম। তাওরাতে আখেরী নবী ও তাঁর চার সাহাবির বিস্তারিত আলোচনা আছে। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি আপনার পায়ের চিহ্ন দেখেই চিনে ফেলেছি; এ তো তাওরাতে বর্ণিত শেষ নবীর সাহাবি ওমরের পায়ের চিহ্ন। এ তো সেই ব্যক্তি, যিনি একদিন মুসলিম জাহানের খলীফা হবেন।

যে-ওমরের গুণাগুণ তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, যার জন্য নবীজি দু'আ করেছিল, যার দূরদর্শিতা ও অভিরুচি কুরআনের অভিরুচির মতো ছিল, যার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন, ওমর যে পথে চলে, শয়তান সেই পথ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ

'সত্য ওমরের মুখ দিয়ে কথা বলে।'

সেই ওমরের মধ্যে অপমৃত্যুর ব্যাপারে কী পরিমাণ আতঙ্ক ছিল!

ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে একবার হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাযি.) তাঁর কাছে কোনো কাজে এলেন। হযরত হুযাইফা (রাযি.) হলেন সেই ভাগ্যবান সাহাবি, যার কাছে নবীজি মুনাফিকদের নামের তালিকা পেশ করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন, হুযাইফা! এই তালিকা কারো সামনে পেশ করো না। বর্ণনায় এসেছে, হযরত হুযাইফা (রাযি.)কে দেখেই হযরত ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন–

يَا حُذَيْفَةُ نَشَيِّدُتُّكَ بِاللهِ هَلْ سَمَّانِيْ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ مِنْهُمْ.

'হে হুযাইফা! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, বলো, আল্লাহর রসূল সেই মুনাফিকদের নামের মধ্যে আমার নামও কি নিয়েছেন? আল্লাহু আকবার, আমি তোমাকে বলছি না, মুনাফিকদের নাম বলো। হযরত হুযাইফা (রাযি.) বললেন–

قَالَ لَا وَلَا أُزَكِّيْ بَعْدَكَ اَحَدًا

'না। আপনার নাম নেই। তবে আপনার পর আর কারো ব্যাপারে তথ্য বলব না।'

দেখুন! হযরত ওমরের মতো ব্যক্তির মধ্যে অপমৃত্যুর কত ভয় ছিল!

মুনাফিকির পরিণতি

কেয়ামতের দিন মুনাফিকরা পোলসেরাতের ওপর দিয়ে আসবে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, মানুষ পোলসেরাতের ওপর দিয়ে পাড়ি দেবে। কিন্তু কাফেরদের পোলসেরাতে ওঠার পূর্বেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর মুসলমান ও মুনাফিকরা পোলসেরাতের ওপর দিয়ে হাঁটবে। তাদের এই অতিক্রমের কথা আল্লাহও কুরআনে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

কেয়ামতের দিন ঈমানদারদের সামনের দিকে ও ডান দিকে তাদের ঈমান ও নেক আমল থাকবে। সামনে থাকবে ঈমানের নূর আর ডানে থাকবে আমলের নূর। ঈমানদারদের আগে-আগে নূর থাকবে। তাতেই তারা চলতে থাকবে। এছাড়া চতুর্দিকে থাকবে গাঢ় অন্ধকার। তো মুনাফিকদের কাছে তো কোনো নূর থাকবে না।

যেইমাত্র ঈমানদাররা নূরসহ একটু আগে বাড়বে, তখন–

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ

'মুনাফিক নারী ও পুরুষরা বলবে, একটু আমাদের দিকেও লক্ষ করো, আমরাও তোমাদের নূর থেকে উপকৃত হই।'[১]

যেমন– আঁধার রাতে চলার পথে যদি কারো হাতে লাইট থাকে, তখন বলে, ভাই, লাইটটা একটু এদিকে ধরো; দেখি, আমার পায়ের নিচে কী আছে? তো মুনাফিকরাও এভাবেই বলবে, তোমাদের নূর দ্বারা আমাদেরও উপকৃত করো।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ

'তাদের বলা হবে, পেছনে ফিরে যাও, নূর তো দুনিয়াতে পাওয়া যায়। দুনিয়ায় গিয়ে এই নূর হাসিল করো।'[২]

এ-কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّبَصَرِيْ نُوْرًا

'আয় আল্লাহ! আমার অন্তরকে, আমার চোখকে নূর বানিয়ে দাও।' এমনকি দু'আর শেষে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ نُوْرًا

'হে আল্লাহ! আমাকেই নূর বানিয়ে দাও।'

যাহোক মুনাফিকদের সম্পর্কে এর পর বলা হচ্ছে, তাদের একথার পর তাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে–

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ

'তারপর মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝখানে একটা দেওয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, তাতে একটা দরজা থাকবে।'[৩]

بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۭ

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

তার ভেতরের দিকে তো থাকবে রহমত আর বাইরের দিকে থাকবে আযাব'।[১]

তারপর ঈমানদাররা থাকবে রহমত তথা জান্নাতে আর মুনাফিকরা থাকবে আযাব তথা শাস্তিতে। মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলবে–

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ

'আমরা কি দুনিয়াতে তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? বন্ধু ছিলাম না?'[২]

অর্থাৎ– আমরা কি একসাথে যিকিরের মজলিসে দীনি মাহফিলে যাইনি? আমরা তো একে অপরের সঙ্গী। কিন্তু তাদের কেউ ছিল মুখলিস, খাঁটি মানুষ; আর কেউ ছিল দুমোখো মুনাফিক। যখন মাঝখানে দেওয়ালের আড়াল সৃষ্টি হবে, তখন মুখলিস সঙ্গীরা একদিকে চলে যাবে আর মুনাফিক সঙ্গীরা এক দিকে। তাদের একথার জবাবে বলা হবে–

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾

'তারা বলবে, তা তো (একসাথে) ছিলাম; কিন্তু তোমরা নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং দুনিয়ার নাজায়েয মোহ তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল। অবশেষে আল্লাহর ফয়সালা এসে গেল এবং শয়তান আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের ধোঁকায় ফেলে দিল।'[৩]

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'আজ না তোমাদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হবে, না কাফেরদের থেকে।'[৪]

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাফেররা পৃথক থাকবে এবং মুনাফিকরা পৃথক থাকবে।

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৪
৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৪
৪. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৫

مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٥

'তোমাদের ঠিকানা আগুন। আগুনই তোমাদের সঙ্গী। আর তা কতইনা খারাপ স্থান।'[১]

এর পর এবার আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলছেন,

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ ۝١٦

'ঈমানদারদের কি এখনো সময় আসেনি যে, আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠবে; তাদের কি এখনো বুঝে আসেনি যে, আমাদেরকে গুনাহ্ ছাড়তে হবে, নেকির জীবন গ্রহণ করতে হবে এবং এই ঈমানদাররা যেন তাদের পূর্ববর্তী কিতাবওয়ালাদের মতো না হয়, যাদের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল এবং ফলে তাদের অন্তরও শক্ত হয়ে গিয়েছিল?'[২]

তাদের ওপর লম্বা একটা গাফলতের সময় পার হয়ে গেছে। তো মানুষ যখন লম্বা সময় মামুলাতে থাকে না, লম্বা সময় উদাসীনতায় কাটায়, নামাযে তাহাজ্জুদে, তাসবীহে, মোরাকাবায় অবহেলা করে, তখন ফলাফল কী হয়? ফলাফল হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে শক্ত করে দেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করে একথাও পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে, তোমাদের অন্তর যদি শক্তও হয়ে যায় এবং আজ একথা বুঝে এসে যায় যে, দোমুখো আচরণ ছেড়ে একমুখী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে। সুতরাং শান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলছেন–

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝١٧

'স্মরণ রেখো, মৃত যমিনকে আল্লাহ (বৃষ্টির পানির দ্বারা) জীবিত করেন। এমনিভাবে তোমাদের মৃত অন্তরগুলোকেও তিনি জীবিত করে দেবেন। তোমাদের অন্তরগুলো মরে গেছে। যদি ইখলাসের সাথে আমার নিকট তাওবা কর, তবে আমি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে তোমাদের কঠিন অন্তরগুলো নরম করে দেব।'[৩]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৫
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৬
৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৭

আসুন, এই মাহফিল থেকে যাওয়ার পূর্বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, গুনাহের জীবন পরিহার করে আমরা নেকির জীবন যাপন করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নেক নিয়তগুলো কবুল করুন এবং আমাদেরকে নেকির যিন্দেগি যাপনের তাওফীক দান করুন।

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

'দ্বিমুখিতা ছেড়ে দিয়ে একমুখী হয়ে যাও।
হয় পূর্ণ মোম হয়ে যাও কিংবা একেবারে পাথর।'

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জঙ্গলের ভ্রমণ

'প্রত্যেকটি প্রাণীই জানে তাকে কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে। আর এই জ্ঞানটুকু তার স্বভাবজাত; কারো শেখানো জ্ঞান নয়। যেমন–

একটা ডিম থেকেও বাচ্চা বের হয়, অন্য ডিম থেকেও বাচ্চা বের হয়। উভয় ডিমই মুরগির নিচে ছিল। এবার উভয় বাচ্চাকে পানিতে ফেলুন; দেখবেন একটা বাচ্চা ডুবে যাবে, অপরটা সাঁতার কাটতে শুরু করবে। অথচ উভয় ডিমই একই মুরগির নিচে ছিল এবং উভয়ই বাচ্চা ও সমবয়সি। তারপরও একটা ডুবে গেল, অপরটা সাঁতরাতে লাগল। কারণ কী? কারণ হলো, একটা মুরগির বাচ্চা, অপরটা হাঁসের বাচ্চা। উভয় ডিম মুরগির নিচে থেকেই ফুটেছে; কিন্তু হাঁসের বাচ্চাকে পানিতে সাঁতার কেটেই জীবন কাটাতে হবে বলে আল্লাহ তাকে স্বভাবগতভাবেই সাঁতার কাটার জ্ঞান দান করেছেন জন্মলগ্ন থেকেই। আর মুগরির বাচ্চাকে যেহেতু ডাঙায় বিচরণ করে জীবন যাপন করতে হবে, তাই তাকে সাঁতার কাটার জ্ঞান দান করেননি।'

জঙ্গলের ভ্রমণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

জীবন যাপনের স্বভাবজাত জ্ঞান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সকল বস্তুকে জীবন দান করেছেন। তারপর জীবন যাপনের স্বভাবজাত জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা দান করেছেন।'[১]

প্রত্যেকটি প্রাণীই জানে তাকে কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে। আর এই জ্ঞানটুকু তার স্বভাবজাত; কারো শেখানো জ্ঞান নয়। যেমন–

একটা ডিম থেকেও বাচ্চা বের হয়, অন্য ডিম থেকেও বাচ্চা বের হয়। উভয় ডিমই মুরগির নিচে ছিল। এবার উভয় বাচ্চাকে পানিতে ফেলুন; দেখবেন একটা বাচ্চা ডুবে যাবে, অপরটা সাঁতার কাটতে শুরু করবে। অথচ উভয় ডিমই একই মুরগির নিচে ছিল এবং উভয়ই বাচ্চা ও সমবয়সি। তারপরও একটা ডুবে গেল, অপরটা সাঁতরাতে লাগল। কারণ কী? কারণ হলো, একটা মুরগির বাচ্চা, অপরটা হাঁসের বাচ্চা। উভয় ডিম মুরগির নিচে থেকেই ফুটেছে; কিন্তু হাঁসের বাচ্চাকে পানিতে সাঁতার কেটেই জীবন কাটাতে হবে বলে আল্লাহ তাকে স্বভাবগতভাবেই সাঁতার কাটার জ্ঞান দান করেছেন

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৫০

জন্মলগ্ন থেকেই। আর মুগরির বাচ্চাকে যেহেতু ডাঙায় বিচরণ করে জীবন যাপন করতে হবে, তাই তাকে সাঁতার কাটার জ্ঞান দান করেননি।

ছাগলের বাচ্চা জন্মের পরপর মাটিতে পড়েই উঠে হাঁটা শুরু করে দেয়। আশ্চর্য লাগে, মানুষের বাচ্চা পুরা একটা বছর মা-বাবাকে জ্বালাতন করে তারপর সে হাঁটতে শেখে। ছাগলের বাচ্চা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে মায়ের কাছে আসে এবং মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করতে শুরু করে। তাকে কেউ শেখায়নি যে, তোমার খাবার মায়ের স্তনে এবং তা চুষে-চুষে খেতে হয়। মূলত আল্লাহই তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। সবার বেলায়ই এমনটা হয়।

মাছকে সাঁতার কাটা কেউ শেখায় না। তারপরও সে সাঁতার কাটে।

পাখিদের কেউ উড়তে শেখায় না; কিন্তু তারা ওড়ে। এটা তাদের স্বভাবজাত জ্ঞান। ছোট্ট চড়ুই পাখিকে দেখুন। ক্ষুদ্র একটা জীবন। একটা কুটার বেশি সে উত্তলোন করে না। একটা-একটা করে কুটা সংগ্রহ করে নিজের বাসা বাঁধে। এত মজবুত বাসা বানায় যে, বড় তুফানেও সেই বাসা ভাঙে না, ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে না। সেখানে তার নিয়মতান্ত্রিক কামরা বানানো আছে। যেমন একটা হয় ড্রয়িং রুম, একটা খাওয়ার রুম। এমনিভাবে তারও বসার রুম ভিন্ন, ডিম দেয়ার রুম ভিন্ন, বাচ্চা ফোটানোর রুম ভিন্ন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর কুদরত বড়ই বিস্ময়কর! চড়ুই একটা কুটার সঙ্গে আরেকটা কুটা কেমন বিস্ময়কর শিল্পের সাথে বাঁধে। আমি কয়েকবার সেই বাসা দেখেছি। সুবহানাল্লাহ! সেটা এত মজবুত যে, আপনি যতই নাড়াচাড়া করুন, পড়বে না এবং ছিঁড়বেও না। আমরা যেমন বাড়ি নির্মাণের সময় লম্বা পিলারের ওপর ইটের গাঁথুনি দিই, সে-ও একটা লম্বা মজবুত কুটো এনে তার উপর ছোট-ছোট কুটাগুলোকে গেঁথে বাসা বাঁধে। বলুন, এই জ্ঞান তাকে কে শিখিয়েছে? আল্লাহ শিখিয়েছেন।

সিংহ বাউন্ডারি লাইন কীভাবে তৈরি করে

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে একটা নিজেস্ব জীবন আছে। নিজস্ব পরিবার আছে। তাদের মধ্যে নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন আছে। যেমন– সিংহ যেখানে বসবাস করে, সেটা তার নিজের এলাকা। আমি একবার দেখেছি, এক সিংহ তার বাউন্ডারি লাইন তৈরি করছে। জানেন, সে কীভাবে তা তৈরি করে? সে হেঁটে-হেটে এই কোনায় পেশাবের কয়েকটা ফোঁটা ফেলবে। তারপর সামনে গিয়ে আরেক কোনায় পেশাবের কয়েক ফোঁটা ফেলবে। তারপর সামনে গিয়ে

আরেক কোনায় আরো কয়েক ফোঁটা পেশাব ফেলবে। এরপর আরো সামনে গিয়ে ফেলবে। তার পেশাবের গন্ধ এমন যে, মানুষ তা অনুভব করে না। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা ঠিকই তা অনুভব করে। সুতরাং সেই বাউন্ডারির কাছে যদি অন্য কোনো সিংহ আসে, তাহলে বুঝে ফেলে, এখানে অন্য একটা সিংহের সাম্রাজ্যের সীমানা। যদি আমি এটা ক্রস করি, তবে তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবে সে তার সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করে। সেই সীমানায় অন্য কোনো সিংহ আসতে পারে না। যদি আসে, তা হলে তুমুল যুদ্ধ হয়। যে জিতে সে ওই এলাকার রাজা হয়ে যায় এবং অপরটাকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় অন্যথায় পালিয়ে যেতে হয়।

বনের রাজার রাজকীয় জীবন

মজার ব্যাপার হলো, সিংহের জীবনে বাস্তবেই রাজকীয়তা রয়েছে। এ-কারণে সে বনের রাজা হয়। সিংহের যখন বাচ্চা জন্ম নেয়, তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপ করার উপযুক্ত হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সিংহ তাদের পরীক্ষা নেয়, এদের মধ্যে শক্ষিশালী বাচ্চা কোনটি? স্ত্রী সিংহ সবগুলোর সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করবে, তাদের সঙ্গে মারামারি করবে, নিজে নিচে পড়ে তাদের ওপরে তুলে লড়াই করবে এবং পরীক্ষা করে দেখবে, তার মধ্যে শক্তিমত্তা কেমন আছে। এরপর এদের মধ্যে যে বাচ্চাটি শক্তিশালী হবে, স্ত্রী সিংহ পুরুষ সিংহের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেবে, এটি সবচেয়ে শক্তিশালী বাচ্চা; বাকি সবগুলো রিজেক্ট বাচ্চা।

মা যখন তাদের প্রত্যাখ্যান করে দেবে, এবার বাবা সিংহ এসে শক্তিশালী বাচ্চাকে রেখে বাকিগুলোকে হত্যা করে ফেলবে। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সিংহের মধ্যেই এই স্বভাব দেখা যায় যে, বাবা হয়েও সে নিজহাতে সন্তানকে হত্যা করে। কেন? কারণ, স্বভাবজাত জ্ঞান তাদের শিখিয়েছে, যদি তোমার সন্তান দুর্বল হয়, তাহলে গাধাও তাকে লাথি মারবে। বলুন তো, যে সিংহ গাধার লাথি খাবে, তাকে কি সিংহ বলা যায়? সুতরাং সে যদি শক্তিশালী হয়, তা হলেই তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অন্যথায় মরে যাওয়াই তার জন্য উত্তম।

আমি স্বচক্ষে একটা স্ত্রী সিংহকে দেখেছি, সে ইশারা করার পর পুরুষ সিংহটা তার তিন-চারটা বাচ্চাকে হত্যা করে ফেলেছে আর শক্তিশালী বাচ্চাটাকে কিছুই করেনি।

বাচ্চাদের পৃথক করে দেয়া

যখন শক্তিশালী বাচ্চাটা বড় হয়ে যায়, তখন স্ত্রী সিংহ বাচ্চাকে নিয়ে পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে যায়। এমন কখনো হয়নি যে, কন্যা বড় হয়ে গেছে আর পিতা তার সঙ্গে এক সাথে বসবাস করছে। স্বভাবজাত রুচিবোধ তাদের মধ্যে এই অভিরুচি দিয়ে দিয়েছে। তবে ওই ছোট বাচ্চা বড় হয়ে গেলে অন্য কোনো পুরুষ সিংহের সঙ্গে একত্রিত হয় বটে; কিন্তু নিজের পিতার সঙ্গে নয়। আল্লাহর কুদরত দেখুন! সেই বাচ্চা যখন উপযুক্ত হয়, তখন মা তাকে শিকার করা শিক্ষা দেয়।

স্ত্রী সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বাচ্চাদের দায়িত্বপালন শেষে স্ত্রী সিংহটি পুনরায় পুরুষ সিংহের কাছে ফিরে আসে। তার পদ্ধতি হলো, স্ত্রী সিংহটি বিকট শব্দে চিৎকার করে। সেই চিৎকার চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। পুরুষ সিংহ চার-পাঁচ মাইল দূরত্বের সেই চিৎকার শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে, আমারই স্ত্রী আমাকে স্মরণ করছে। এরপর সে সেই চিৎকারকে লক্ষ করে চলতে থাকে এবং অবশেষে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং পরস্পরে মিলন হয়। এভাবেই তাদের বংশ রক্ষা হয়।

সিংহের দস্তরখান

এটাও একটা বিস্ময়কর বিষয় যে, শিকার সিংহী করে, সিংহ নয়। শিকার সিংহীই মারে, কিন্তু খায় প্রথমে সিংহ। সিংহী শিকার হত্যা করে এক দিকে সরে যায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক বনভ্রমণে গিয়ে দেখলাম, সিংহী শিকার হত্যা করে তার বাচ্চাদের নিয়ে প্রায় পঁচিশ ফিট দূরে বসে অপেক্ষা করছে। সিংহ এসে সেই প্রাণীটা একাই খাচ্ছে। সিংহী তার বাচ্চাদের নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। রাজার খাওয়া হলে আমরা গিয়ে দস্তরখানে বসব। আরো ভিন্ন কয়েকটা প্রাণীকেও সেখানে অপেক্ষমাণ দেখেছি। তারাও অপেক্ষায় ছিল, দস্তরখানে কিছু খাবার অবশিষ্ট থাকলে আমরাও পাব। আরো দেখলাম, আকাশে কয়েকটা চিল-শকুনও ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, যখন এরা সবাই খেয়ে চলে যাবে, তখন আমরা গিয়ে আমাদের অংশ নেব। কিন্তু সিংহের উপস্থিতিতে কেউই সামনে এগোয়নি। সেখানে একটা অভিনব শৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হলো।

যখন সিংহের খাওয়া শেষ হলো, তখন সে একদিকে গিয়ে বসে পড়ল। তার সরে যাওয়ার পর সিংহী কয়েকটা গর্জন করে উঠল। আমাদের গাইড বলল, এবার দেখুন, সিংহের কাছে অনুমতি চাওয়া হচ্ছে, মহারাজ! যদি আপনার পেঠ ভরে থাকে, তাহলে এবার আমাদের অনুমতি দিন। প্রথমবারের গর্জনে সিংহ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। দ্বিতীয়বারের গর্জনে সে প্রতিউত্তরে হালকা আওয়াজ তুলে বলে দিল, হ্যাঁ; এবার খেতে পার। সেই আওয়াজ শোনামাত্রই সিংহী তার বাচ্চাদের নিয়ে শিকারের দিকে ছুটে চলল এবং অবশিষ্ট খাবার ভক্ষণ করল।

আমাদের এক সঙ্গী বলল, এটা তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। শিকার হত্যা করে সিংহী আর ভক্ষণ আগে করে সিংহ! আমি বললাম, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। আমাদের ঘরবাড়িতেও তো এমনই হয় যে, সিংহীরা রান্না করে খাবার তৈরি করে আর সিংহরা এসে আগে আহার করে!

শিকারের পরিকল্পনা

সিংহী কখনো একা শিকার ধরতে পারে না। তখন পরিকল্পনা করতে হয়। একটা জায়গায় সিংহ চুপ মেরে বসে পড়ে আর সিংহী বিপরীত দিক থেকে শিকারকে তাড়িয়ে এদিকে নিয়ে আসে। যেই সিংহের কাছে পৌঁছে, অমনি সে হামলা করে বসে।

শিকারের পদ্ধতি

সিংহ জানে কোন প্রাণীকে কীভাবে কাবু করতে হয়। শিকার যদি ছোট প্রাণী হয়, তাহলে এক থাবায়ই তাকে কাবু করে ফেলে। আর প্রাণী যদি বড় হয়, তখন প্রথমে তার কোমরের ওপর উঠবে। তারপর দু-হাত দিয়ে তার গলায় ঝুলে শিকারের গলা কামড়ে ধরবে এবং শক্ত করে ধরে রাখবে। তার এটাও জানা আছে যে, কতক্ষণ এভাবে শ্বাস রোধ করে রাখলে প্রাণীটা মারা যাবে। সে দুই মিনিট পর্যন্ত এভাবে শ্বাসনালী কামড়ে ধরে রাখবে। এতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণীটা মারা যায়। এরপরই তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। বলুন তো! তাকে শিকার করার অভিনব এই কৌশল কে শেখাল? স্বভাবজাত জ্ঞান।

জিরাফ শিকারের পদ্ধতি

জিরাফ প্রাণীটা কী পরিমাণ উঁচা-লম্বা তা তো আপনারা জানেন। লম্বা-লম্বা পা। তার চেয়ে আরো বেশি উঁচা-লম্বা তার গলা। সিংহ তো লাফ

মেরেও তার গলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কোমরের ওপর উঠলেও গলার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। এবার দেখুন সিংহকে আল্লাহ কেমন বুদ্ধি দিলেন! সে যখন জিরাফকে টার্গেট করে, তখন আস্তে-আস্তে চলতে থাকে। যে-ই দেখে, জিরাফের সামনের পথ উঁচু-নিচু, সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করে। এবার সিংহকে দেখে জিরাফ সামনের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে আর পথ যেহেতু উঁচু-নিচু তাই অল্প পথ যেতে না যেতেই জিরাফ মাটিতে পড়ে যায়। কারণ, তার লম্বা-লম্বা পাগুলো উঁচু-নিচু যমিনে পিছলে যায়। আর তখন সিংহ এসে তার গলাটা চেপে ধরে। বলুন তো! তাকে এই কৌশল কে শেখাল? স্বভাবজাত জ্ঞান।

এক অভিনেত্রী সিংহীর গল্প

আমরা এক জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক ইংরেজ ছিল। সে সিংহের জীবনের ওপর অনেক ফিল্ম তৈরি করেছে। সে একটা ছোট সিংহশাবক এনে বাড়িতে লালনপালন করল। এটা সিংহী ছিল। যখন সিংহী বড় হলো, সে তাকে শিকার করা শেখাল। সঙ্গে শিকার অবস্থায় ক্যামেরার সামনে কীভাবে পোজ দিতে হয় তা-ও শেখাল। অর্থাৎ– তাকে অভিনয় শিখিয়েছিল। যখন তাকে বনে ছাড়ত, তখন সে ক্যামেরাম্যানদের সামনে এমনভাবে দৌড়াত যে, ক্যামেরায় পোজও দিত। যখন কোনো প্রাণী শিকার করত, তখন এমনভাবে তাকে ধরত ও মারত যে, ক্যামেরাম্যানরা খুব কাছ থেকেই তা ভিডিও করে নিতে পারত। এভাবে ভিডিও করে ফিল্ম তৈরি করে সে কোটি-কোটি ডলার ইনকাম করত।

একবার তাদের সিদ্ধান্ত হলো, জঙ্গলে নিয়ে এই অভিনেত্রী সিংহীকে ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে যখন সিংহের সঙ্গে মিলন হবে, তার দৃশ্য ধারণ করে তাদের লাফইস্টোরির উপর ফিল্ম তৈরি করবে। কীভাবে মিলন হয়, কীভাবে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে ইত্যাদি।

একদিন প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ তারা জঙ্গলে গেল। সঙ্গে ক্যামেরাম্যানও ছিল আবার গানম্যানও (বন্দুকধারী) ছিল। একদিকে তাঁবু লাগিয়ে রাতের বেলা সেই অভিনেত্রী সিংহীকে ছেড়ে দিল। সিংহীর গায়ের গন্ধ তো সিংহের পেতে সময় লাগে না। একটা সিংহ এল। উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ার পর তাদের মধ্যে বিবাহ হলো।

যাহোক, যখন দেখল, বনের সিংহ শহরের সিংহীকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তারা খুব আনন্দিত হলো। তারা ভাবল, সিংহী এখানে এক সপ্তাহ

থাকলেই মা হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। এরপর তাকে নিয়ে শহরে ফিরে যাবে। দু-তিন দিন পর পরীক্ষা করে দেখা গেল, সিংহী গর্ভবতী হয়ে গেছে। তাদের ইচ্ছা ছিল, আজকের রাতটা এখানেই থাকুক; কাল তাকে নিয়ে শহরে ফিরে যাবে।

আল্লাহর কী ইচ্ছা! সেই জংলি সিংহের সঙ্গে আরো চৌদ্দ পনেরোটা সিংহী বসবাস করত। তারা যখন জানল, একটা নতুন শহুরে সিংহী এসে মহারাজার মন নেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন তারা বিষয়টা ভালোভাবে নিল না। দেখা গেল, গভীর রাত প্রায় দুটার সময় ১৪/১৫ টা জংলী সিংহী এসে এই অভিনেত্রী সিংহীর উপর হামলা করে বসল। ফায়ারম্যান গুলি করেও আহত সিংহীকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা তাকে টুকরা-টুকরা করে ফেলে গেল। এতে বোঝা গেল, তাদের মধ্যেও হিংসা আছে যেমন মানুষ নারীর মধ্যে হিংসা থাকে।

সিংহের কৃতজ্ঞতার গল্প

আমরা এক দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ঘটনা শোনানো হলো। এক ইংরেজ দম্পতি তাদের ছয় বছরের বাচ্চার জন্য একটা সিংহের বাচ্চা কিনে আনল। বাচ্চাটা সিংহশাবকের সঙ্গে সর্বদা খেলাধুলায় মেতে থাকত। এক দেড় বছর পর সিংহশাবক পূর্ণ সিংহে পরিণত হলো। সিংহ পূর্ণ সিংহ হয়ে গেলে তার সঙ্গে কারো বন্ধুত্ব থাকে না। মানুষ পেলেই গাজরের মতো চিবিয়ে খায়। আল্লাহু আকবার!

পূর্ণ বয়সি হিংস্র সিংহের সঙ্গে তাদের ছোট্ট শিশুটির বন্ধুত্ব ছিল গাঢ়। অনেকেই তাদের পরামর্শ দিল, এভাবে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব হয় না, হতে পারে না। যেকোনো সময় মতের অমিল হয়ে গেলে এই সিংহ তোমার সন্তানের হাড় ছিড়ে খাবে। যাহোক পরামর্শ অনুযায়ী তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এল।

সেই জঙ্গলে অন্য একটা সিংহের রাজত্ব ছিল। সে বয়সেও একটু বৃদ্ধ ছিল। এই নতুন তাগড়া জোওয়ান সিংহের সঙ্গে তার লড়াই হয়ে গেল। জঙ্গলের নিয়ম অনুযায়ী যে পরাজয় বরণ করবে, তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। জোওয়ান সিংহটি যুদ্ধে জয় লাভ করে সেই এলাকায় নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। পূর্বের সিংহের সঙ্গে যেসব সিংহী বসবাস করত, তারা এখন এই নতুন সিংহের সঙ্গে চলাফেলা করতে লাগল। এটাই জঙ্গলের নিয়ম। ইংরেজ দম্পতি আশ্বস্ত হলো যে. সিংহটি ঘর থেকে চলে গেল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, শিশুটি ঘরে নেই। ঘরের বাইরে সিংহ এসে গর্জন করতেই শিশুটি বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বাবা-মা তাদের মেয়েকে সিংহের সাথে খেলতে দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হলো। বন্য জন্তু কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসে বলা যায় না। তারা শিশুটিকে ডাকছে; কিন্তু তার এদিকে কোনোই মনোযোগ নেই।

অনেক ডাকাকাকি করার পর শিশুটি ফিরে এল। এতে মা-বাবার অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলো। কিন্তু এই পরিস্থিতি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, কয়েক দিন পর তারা এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। নির্দিষ্ট দিনে তারা সামানপত্র বেঁধে ফেলল। যখন রওনা হওয়ার দিন এল, মা-বাবা তো তখন সামানপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ সিংহের পরিচিত গর্জন শুনে তাদের মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিংহের কাছে চলে গেল এবং নির্ভয়ে খেলতে লাগল।

তারা বাইরে এসে দেখল, আজকের দৃশ্য অন্য রকম। সিংহটি বসে আছে আর শিশুটি তার কাঁধের উপর বসে খেলা করছে। আর কিছুটা দূরত্বে আরেকটা সিংহ বসে আছে। সেদিন সেও সিংহের সঙ্গে এসেছিল।

শিশুটি তার সিংহ বন্ধুর সঙ্গে খেলাধুলায় লিপ্ত । মা-বাবা বহু ডাকাডাকি করছিল; কিন্তু শিশুটির কোনোই খবর নেই। অবশেষে অনেক চেঁচামেচির পর সে সিংহের পিঠ থেকে নেমে আসার জন্য হাঁটছিল। শিশুটির কী খবর আছে যে, সে যে সিংহের কাঁধে বসে খেলাধুলায় মগ্ন, এ দৃশ্য সিংহীর খারাপ লাগবে। এতে সে ক্রুদ্ধ হয়েছে।

যাহোক যেইমাত্র শিশুটি সিংহীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, অমনি সিংহী শিশুটির উপর হামলা করার জন্য লাফিয়ে উঠল। বিদ্যুদ্গতিতে সিংহও সিংহীর মুখে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে একটা থাপ্পর মারল এবং শিশুটিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে মুক্ত করল। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল এই ঘটনা। চড় খেয়ে সিংহী গর্জন করতে-করতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। এরপর সিংহ শিশুটির কাছে এল এবং পরম মমতাভরে তার লেজ নাড়তে লাগল। লেজ নাড়ানো দ্বারা ইঙ্গিত ছিল, তুমি আমার পিঠে আরোহণ করতে পার। মেয়েটি ইঙ্গিত বুঝে তার পিঠে চড়ে বসল। সিংহটি তাকে কাঁধে তুলে বাড়ির দরজায় রেখে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সকল বস্তুকে জীবন দান করেছেন। তারপর জীবন যাপনের স্বভাবজাত জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা দান করেছেন।'

সিংহের খাবার

প্রথমে আমার ধারণা ছিল, সিংহ হয়ত সকাল বেলা খরগোশ দিয়ে নাস্তা করে। দুপুরে কোনো গরু দিয়ে লাঞ্চ করে এবং রাতে কোনো হরিণ দিয়ে ডিনার করে। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সিংহ সপ্তাহে এক দিন আহার করে। প্রশ্ন করলাম, কেন? আপনারা খরচ কমানোর জন্যই কি এমন করেন? সপ্তাহে মাত্র একদিন খাবার দেন? তারা বলল, না জনাব! একবার খেলেই তার এক সপ্তাহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আমি বললাম, চমৎকার! আমাদের সিংহ (মানুষ) তো দিনে তিনবার শিকার করে।

একটি বিস্ময়কর দৃশ্য

আমরা এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক বন্ধু মুহাম্মাদ মিয়া বললেন, হযরত! এখানে একটা সাদা সিংহের বড় ফার্ম রয়েছে; দেখে গেলে কেমন হয়? আমি বললাম, ঠিক আছে তা-ই হোক। আমরা সেখানে নেমে পড়লাম এবং সেই ফার্মে গেলাম। প্রায় ৩৫/৪০ জোড়া সাদা সিংহ। প্রত্যেক জোড়ার জন্য এক হেক্টর জমির পৃথক বাউন্ডারি। সেখানে জঙ্গলের মতো করে গাছগাছালিও লাগানো হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। আমরা কয়েকজন সবার পেছনে বসা ছিলাম। অন্যরা সামনে। ড্রাইভার আমাদের দেখাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে। একটু আগে গিয়ে দেখলাম, একটা বড় সিংহ একপাশে বসে আছে। অপর পাশে সিংহী উপবিষ্ট। ড্রাইভার সেখানে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। আমার ধারণা, সে সিংহ থেকে মাত্র ১৫/২০ ফিট দূরত্বে গাড়ি থামিয়েছে। আমরা আশ্চর্য হলাম, সে এখানে গাড়ি কেন থামাল। আরো বিস্মিত হলাম, যখন সে গাড়ি বন্ধ করে চাবি বের করল এবং গ্লাসগুলো নিচে নামিয়ে দিল। কেমন একটা ভয়াবহ মুহূর্ত! ভয়ঙ্কর হিংস্র সিংহ মাত্র ১৫ ফুট দূরত্বে। আমি মুহাম্মদ মিয়াকে বললাম, ভাই! মনে হয়, লোকটি বাসায় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে; বাড়ি ফেরার ইচ্ছা নেই। আমরা কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে সে গাড়ির প্রথম দরজা খুলে নেমে পড়ল এবং দাঁড়িয়ে গেল। আমরা অত্যন্ত উঠকণ্ঠা নিয়ে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলাম। একটু পরে সে তার হাতের চাবির ছড়াটা নাড়াতে লাগল। ঝনঝন শব্দ হলো।

সিংহটা তো প্রথমে আরামেই বসে ছিল। ঝনঝন শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। ড্রাইভার দ্বিতীয়বার চাবির ছড়া বাজাল। সিংহও দ্বিতীয়বার

একটু মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকাল। যখন সে তৃতীয়বার আবার ঝনঝন শব্দ করল, এবার সিংহ হালকা একটু 'হু' শব্দ বের করল। যে-ই সে 'হু' করে শব্দ করল, সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকে দরজা, গ্লাস সব বন্ধ করে দ্রুত গাড়ি ছেড়ে দিল। এরপর সে ব্যাখ্যা দিল, আমি আপনাদের একটি বিষয় দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, সিংহ কিন্তু এমনিতেই কারো ওপর হামলা করে না। সে বনের রাজা। তার প্রস্তুতি আছে। নিজেস্ব একটা স্টাইল আছে। হামলা করে না। আমরা বললাম, স্টাইলটা কী? সে বলল, প্রথমে তো সে আরামেই বসে ছিল। আমি ঝনঝন শব্দ করেছি। তো সে প্রথমবার বিষয়টি আমলে নেয়নি। দ্বিতীয়বার শব্দ করেছি। এবার আমার দিকে তাকিয়েছে, আরে! এ আবার কোথা থেকে এল? যখন আমি তৃতীয়বার শব্দ করলাম, তখন সে 'হু' করে শব্দ করল। এতে সে ইঙ্গিত করল, যাও চলে যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

সেব বলল, এরপর যদি আমি সামান্য দেরি করতাম, তাহলে সে অবশ্যই আমার ওপর হামলা করে বসত।

এরপর সে আরেকটি তথ্য জানাল যে, আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন, সিংহের পেছনে একটু দূরে সিংহীও বসা ছিল। আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে গাড়ি থামিয়েছি এবং আমি যতটুকু তামাশা-ই করেছি, সিংহের সঙ্গে করেছি। আমরা বললাম, হ্যাঁ, তা তো লক্ষ করেছি। সে বলল, এসব কিন্তু সিংহীর সঙ্গে করা যাবে না। কারণ, সিংহীর ওপর ভরসা করা যায় না; তার নীতির ঠিক-ঠিকানা নেই। সিংহের একটি নিজস্ব স্টাইল আছে। সে হামলা করলে বলেকয়ে করে। কিন্তু সিংহী আপনার ওপর যখন-তখন হামলা করতে পারে।

মজার ব্যাপার হলো, যখন ড্রাইভার বলছিল, 'সিংহীর উপর ভরসা করা যায় না' তখন সামনের সিটে এক ইংরেজ দম্পতি ছিল, শুনে পুরুষ লোকটি বলে উঠল–

Women Are Also Un-Predictable

'আমাদের নারীরাও বিশ্বস্ত হয় না।'

এ কথা শুনে তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গেল।

সিংহ কখন শিকার করে

সিংহ সাধারণত দিনের বেলা ঘুমায়। সন্ধ্যা নেমে আসতেই সে শিকারের তালাশে বের হয়। আল্লাহ তাকে রাতে দেখার জন্য বিশেষ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সেই অন্ধকারে সে দৌড়াতেও পারে, হামলাও করতে পারে।

সিংহ যখন শিকার করার মনস্থ করে, তখন কখনো নয় ঘণ্টা পর্যন্ত প্ল্যানিং করে। সে কখনো অনিশ্চিত ক্ষেত্রে পা বাড়ায় না। যখন সে শতভাগ নিশ্চিত হবে, আমি এই টার্গেট অবশ্যই ধরতে পারব, তখনই সামনে পা বাড়ায়।

আমাদের জন্যও এখানে কিছু শেখার বিষয় আছে। কারণ, আমরা অনেক সময় কোনো কাজ করার সময় পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়েই কাজে হাত দিয়ে বসি।

হামলার সময় সতর্কতা

সিংহ যখন হামলা করে, সে এ-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকে যেন তার শরীরে কোনো ধরনের আঘাত না লাগে। কারণ, সে জানে, তার দেহে ক্ষত তৈরি হলে তা শুকাতে দেরি হবে আর তাতে মশা-মাছি বসে জীবাণু ছড়াবে। এমনকি ভাগ্য খারাপ হলে মৃত্যুও হতে পারে। তাই সে আত্মরক্ষা করেই হামলা চালায়। আপনি দেখবেন, কোথাও যদি দুটা মহিষ এক সাথে থাকে, তা হলে সিংহ ততক্ষণ পর্যন্ত হামলা করে না, যতক্ষণ একটাকে অপরটা থেকে বিচ্ছিন্ন না করবে। এতে বোঝা গেল, একতা ও সংঘবদ্ধতায় নিরাপত্তা ও বরকত আছে।

সিংহ জায়গা বদলাতে থাকে

সিংহ জায়গা বদলাতে থাকে। তার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থাকে না। দু-চার দিন এখানে থাকে তো, দু-চার দিন ওখানে থাকে। সে তার রাজত্বের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর সেজন্য সে ভালো-ভালো খোরাকও পেতে থাকে।

মানুষের উপর হামলা করার মৌলিক কারণ

কিছুদিন পূর্বে এক ইংরেজের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সিংহের সাথে তার ৮/৯ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা আছে। সে আমাদের দেখাতে নিয়ে চলল। আমরা যে-গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম, তার ওপর লোহার জালি লাগানো ছিল। ইংরেজ আমাদের বলল, আমি বের হতেই সিংহ আমাকে দেখে কাছে আসবে এবং আপনজনের মতো গা ঘষাঘষি করবে। আমাকে তখন শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, মাটিতে পড়া যাবে না। সে গাড়ি থেকে নামতেই তেমনই হলো যেমনটি সে বলেছিল। একটা সিংহ এসে তার গায়ে নিজের গা

ঘষাঘষি করতে লাগল। সে সিংহের কোমরে হাত রাখল। ফলে সিংহ তার সামনে হাঁটু ভেঙে নিচু হয়ে গেল বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে যেমনটা করে। এভাবেই কিছুক্ষণ চলতে লাগল।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, সিংহটা কি আপনাকে চেনে? বলল, সিংহ মানুষের মুখের আকৃতি দেখে না। তার সামনে এমনই লাগে, যেন এখানে দুই পাবিশিষ্ট একটা জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। দুই পাবিশিষ্ট জন্তু বুঝেও হামলা কেন করেনি? এর মৌলিক কারণ হলো, মানুষ যখন ভীত হয়ে পড়ে, তখন তার শরীর থেকে এক ধরনের ক্যামিকেল এড্রালিন বের হয়। সেই এড্রালিন সিংহ শোঁকে। এ-জাতীয় ঘ্রাণ বা ঘ্রাণবিশিষ্ট জন্তুকে সে নিজের শত্রু মনে করে এবং তারপরই সে হামলা করে বসে। এ-কারণে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজেই আগে হামলা করে বসে। অতএব, কোনো মানুষ যদি ভয় না পায়, তাহলে সিংহও তার কোনো ক্ষতি করবে না।

সে বলল, আমি এদের মোটেও ভয় পাই না। এদের সঙ্গে আমি খেলা করি। এরাও আমার সঙ্গে খেলা করে।

পথের অধিকার

বনের মধ্যে একস্থানে লেখা ছিল–

The Right Of The Way Is Wite The Animals

এর অর্থ হলো, যদি তোমরা গাড়িতে এপথ অতিক্রম কর এবং সামনে কোনো প্রাণী রাস্তা অতিক্রম করে, তা হলে তাকে আগে যেতে দাও; তুমি পরে যাও।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ কালের লোকেরা প্রাণীদের অধিকারও নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, রাস্তা পারাপারের সময় প্রথমে জন্তুদের যেতে দাও; তোমরা পরে যাও। অথচ আমরা যখন প্রকৃত অর্থে মুসলমান ছিলাম, তখন এই জংলি জন্তুগুলো মানুষের কথা মেনে চলত। কয়েকটি ঘটনা শুনুন।

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি গোলাম ছিল সাকীনা (রাযি.)। তিনি একবার রোম দেশে কোনো কারণে সেনাকাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে শত্রুরা গ্রেফতার করে নিল। তিনি সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন। এরপর কাফেলার তালাশে চলতে লাগলেন। হঠাৎ পথে একটা সিংহের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সিংহকে সম্বোধন করে

বললেন, হে সিংহ! আমি মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম। আমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। একথা শুনে সিংহটি লেজ নাড়তে-নাড়তে একেবারে কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এরপর সিংহটি সামনে-সামনে চলল আর হযরত সাফীনা (রাযি.) পেছনে-পেছনে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত সাফীনা (রাযি.) যখনই কোনো ভীতিকর বস্তু দেখতেন, তখন সিংহকে আঁকড়ে ধরতেন। এভাবে তিনি সিংহের পথনির্দেশনায় কাফেলার সন্ধান পেয়ে গেলেন।

২. আফ্রিকার বর্বর জাতি হযরত সাহাবায়ে কেরামকে নিজ এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়নি। তাদের আচরণে নিরাশ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম জঙ্গলের পথে পা বাড়ালেন। সেখানকার লোকদের ধারণা ছিল, জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরা তাদের খেয়ে ফেলবে। কিন্তু সামনে ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। সাহাবায়ে কেরামের জামাত যখন জঙ্গলে পৌঁছল, তখন একজন জন্তুদের সম্বোধন করে বলল, হে জঙ্গলের জীবজন্তুরা। এই জঙ্গলে আজ রাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অবস্থান হবে। সুতরাং তোমরা জঙ্গল খালি করে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, জংলি জন্তুরা তাদের বাচ্চাগুলো মুখে তুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা জঙ্গল খালি করে দিল।

৩. এক বুযুর্গ ছিলেন। বাদশাহ তাঁকে দরবারে ডেকে এনে বিচার করে শাস্তির সিদ্ধান্ত নিলেন। শাস্তি হলো বাঘের সামনে ফেলে দেওয়া। তার ইচ্ছা ছিল, আমি নিজেও একটু মজা করে দেখব। যখন তাকে বাঘের খাঁচায় ফেলা হলো, দেখা গেল, বাঘ এসে বুযুর্গের সামনে কুকুরের মতো বিনীয় হয়ে বসে পড়ে তাঁর পা চাটতে লাগল। বাদশাহর উজির খুব হুঁশিয়ার ছিল। সে বাদশাহকে বলল, জনাব! ইনি আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা হবেন। এর কাছে এখনই ক্ষমা চেয়ে নিন। অন্যথায় যদি তিনি অভিশাপ দেন, তাহলে আপনি নির্বংশ হয়ে যাবেন। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ বুযুর্গকে দরবারে এনে নিজের শাহি তাজ তার কদমে রেখে দিলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। বুযুর্গ সসম্মানে ঘরে ফিরে গেলেন।

তাঁর স্ত্রীর তো ধারণা ছিল, হয়ত আজ আমার স্বামীকে শহীদ করে দেওয়া হবে। কিন্তু স্বামী জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে খুব বিস্মিত

হলো এবং প্রশ্ন করল, আপনি জীবিত এলেন কী করে। বুযুর্গ পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

স্ত্রীরা তো স্ত্রী-ই হয়। তারা স্বামীর বুযুর্গি সহজে মেনে নিতে চায় না। সে স্বামীকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা! একটা সত্য কথা বলুন তো। যখন ক্ষুধার্ত বাঘ আপনার দিকে আসছিল, তখন তো আপনি খুব ভয় পাচ্ছিলেন। তখন আপনি কী ভাবছিলেন? বুযুর্গ উত্তর দিলেন, আমি তখন ভাবছিলাম, কি জানি, বাঘের লালা পাক হবে, না নাপাক! অর্থাৎ– তাদের অন্তরে তো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভয় থাকে না। আল্লাহু আকবার!

এখানে প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহ্ওয়ালারা প্রকৃত মালিক ও খালিককে ভয় করেন। আর যে খালিককে ভয় করে, মাখলুককে সে ভয় করে না।

দুআ করি, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমাদের অন্তরেও তাঁর ভয় ও ভালোবাসা ঢেলে দিন, যেন জীবনের বাকি দিনগুলো এমনভাবে অতিবাহিত করতে পারি, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নিজের ভুলত্রুটিগুলো জানা

'যে তার রোগ সম্পর্কে অবগতই নয়, সে নিজের সংশোধনেরও চিন্তা করে না। বাস্তবেও তা-ই হচ্ছে। কখনো-কখনো আল্লাহ বান্দার চোখে পট্টি বেঁধে দেন। ফলে সে নিজহাতে এমন মন্দ কাজ করে, যা তার জন্য ক্ষতিকর; অথচ সে তা দেখেও দেখছে না, শুনেও শুনছে না। তার মস্তিষ্ক তাকে চিন্তা করাচ্ছে না যে, তুমি মন্দ কাজ করছ। সে মন্দ কাজও করছে আবার নিজেকে আল্লাহর বন্ধুও মনে করছে।'

নিজের ভুলত্রুটিগুলো জানা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

বিশেষ মজলিসসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

বিশেষ মজলিসসমূহের এটি প্রথম মাহফিল। 'বিশেষ' কথাটির অর্থ কী? বড় মর্যাদার অধিকারী মারেফাতওয়ালা উন্নত সম্মানের অধিকারী লোকদের মাহফিল? না-না। বরং যারা বেশি অসুস্থ, যারা বিশেষ তাওয়াজ্জুহের উপযুক্ত, যারা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, যারা এতটাই বিগড়ে গেছে যে, যদি তারা এই মুহূর্তে রোগের ওষুধ না পায়, তা হলে নিশ্চিত মারা যাবে, এটি তাদের মজলিস।

হাসপাতালে যেখানে জটিল রোগে আক্রান্তদের রাখা হয়, তাকে বলা হয় 'নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট'। তো আমাদের বিশেষ মজলিস শুরু হয়ে গেল। যারা কয়েক ধরনের রূহানি রোগে আক্রান্ত, যা তাদের ঈমান-আমল তিলে-তিলে ক্ষয় করে দিচ্ছে, এটি তাদের জন্য খুসুসি মজলিস তথা বিশেষ মজলিস।

আমল করার প্রতিজ্ঞা

এ-বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমরা এই মজলিসে যা কিছুই শুনব অবশ্যই তা আমলে পরিণত করব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করাতেন এবং বাইআত করাতেন। আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, নবীজি

এভাবে বাইআত তথা প্রতিজ্ঞা করাতেন যে, আমি যা শুনব, সেই অনুযায়ী আমল করব।

এখন আমাদের এই প্রতিজ্ঞাও সেই সুন্নতের অনুসরণেই হয়েছে। এমন যেন না হয় যে, শুনতে-শুনতে এক সময় 'সুন' (নিস্তেজ) হয়ে যাব। কিছু-কিছু সালেক আছেন, যারা একসময় তালেবে ইল্‌ম ছিলেন, তারা এই অহমিকায় থাকেন যে, আমরা তো জানি। আরে ভাই! এটাই তো বিপদ! এটাই তো পতনের বুনিয়াদ! কেয়ামতের দিন এটাই জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি যে-পরিমাণ জেনেছিলে, সেই পরিমাণ আমল করেছিলে কি-না? যে যে-পরিমাণ জানে, সে সেই পরিমাণ বোঝার নিচে আছে। এটা এমন বোঝা, যা বান্দার ঘাড় মটকে দিতে সক্ষম। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের বিশেষ মজলিসসমূহে আলোচনা হবে।

মনে রাখবেন, তাঁরা বেশি সবকওয়ালা, বেশি মারেফাতওয়ালা মানুষ ছিলেন। বাস্তবতা বাস্তবতা-ই। অন্তরে এই প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যা কিছুই শুনব, সেই অনুযায়ী আমল করব। এরপর আল্লাহর সাহায্য পাবেন। তাওফীকও তার ভাগেই জোটে, যার অন্তরের নিয়ত ঠিক থাকে। নিয়তে ত্রুটি থাকলে তাওফীক পাওয়া যায় না।

নিজের ত্রুটি কখন প্রকাশ পায়

যখন আল্লাহ কোনো বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাকে তার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো অবহিত করে দেন, তার ভুলগুলো তাকে ধরিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, তার দোষত্রুটি সম্পর্কে তাকে বেখবর ও উদাসীন করে দেন। সে নিজের মধ্যে কোনো প্রকারের ত্রুটি দেখতে পায় না। ডাক্তাররা বলেন, সবচেয়ে বড় রোগ সেটি, যাকে রোগী রোগই মনে করে না। কারণ, যাকে সে রোগই মনে করে না, তার চিকিৎসা করার কিংবা তা থেকে আত্মরক্ষার কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। অনুভব তখন করে, যখন আর বাঁচার কোনো পথ বাকি থাকে না।

যে তার রোগ সম্পর্কে অবগতই নয়, সে নিজের সংশোধনেরও চিন্তা করে না। বাস্তবেও তা-ই হচ্ছে। কখনো-কখনো আল্লাহ বান্দার চোখে পট্টি বেঁধে দেন। ফলে সে নিজহাতে এমন মন্দ কাজ করে, যা তার জন্য ক্ষতিকর; অথচ সে তা দেখেও দেখছে না, শুনেও শুনছে না। তার মস্তিষ্ক তাকে চিন্তা করাচ্ছে না যে, তুমি মন্দ কাজ করছ। সে মন্দ কাজও করছে আবার নিজেকে আল্লাহর বন্ধুও মনে করছে।

উদাসীনতার চাদর

এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের কলিগ ছিলেন। আমি তাকে খুব ভালো করেই জানি। কয়েক বছর যাবত তার জীবন দেখার সুযোগ হয়েছে। অত্যন্ত উদাসীনতার জীবন ছিল। ইংরেজি পোশাক, নামাযের খবর নেই, সত্য-মিথ্যার পাথর্ক্য নেই। না চোখ নিয়ন্ত্রণে আছে, না মুখ। মন চাইল, কারো গীবত করে দিল, মন চাইল কাউকে গালি দিল, জেনেবুঝে কারো মনে কষ্ট দিল। টিভি, গান, বাজনা, সুদ, হারাম ইত্যাদির ব্যাপারে কোনো পরোয়া ছিল না। এত নিকৃষ্ট জীবন ছিল তার যে, মন চাইলে কখনো জুমার নামায পড়ল, অন্যথায় না।

একবার তার সঙ্গে নির্জনে বসার সুযোগ হয়েছিল। এই অধম সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাওবা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলার চেষ্টা করলাম। তাওবা প্রসঙ্গে কথাগুলো শুনে সে বলল, আজ আপনার কথাগুলো শুনে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। এরপর যে কথাটি সে বলল, তা শুনে আমি রীতিমতো কেঁপে উঠেছি। সে বলল, 'আমি ইচ্ছা করে তো কখনো গোনাহ করিনি। তবে অনিচ্ছায় যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

এবার তার কথাগুলো একটু চিন্তা করে দেখুন। তার জীবনের অবস্থা তো প্রথমেই বলেছি। পাপের সাগরে নিমজ্জিত জীবন! তার উপর সে বলছে, 'গুনাহ তো কখনো করিনি ! যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' এর অর্থ হলো, সে আল্লাহর বিধান অমান্য করা এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী না চলাকে পাপই মনে করছে না, গুনাহই মনে করছে না। নাউজুবিল্লাহ!

এরপর আমি অনুভব করলাম, আল্লাহ যখন বান্দার উপর চরম ক্রোধান্বিত হন, তখন তার চোখে পট্টি লাগিয়ে দেন। ফলে পাপকে সে পাপ মনে করে না, গুনাহকে গুনাহ বলে স্বীকার করে না। সারাদিন পাপের মধ্যে ডুবে থেকে দাবি করে, 'আমি কোনো পাপ করিনি!'

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যিনাকারী

কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটা হলো, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যাবে। সেটা কীভাবে? লোকেরা স্বীয় স্ত্রীকে তালাকও দেবে আবার তালাক হলো কি-না এ-বিষয়ে কোনো পরোয়াই করবে না। স্বামী-স্ত্রী পুনরায়

স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে থাকবে এবং যিনায় লিপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, তালাকে মুগাল্লাযার পর স্ত্রী আর স্বামীর জন্য হালাল থাকে না। আজ এই মারাত্মক গুনাহের মধ্যে অনেক লোক ডুবে আছে। হ্যাঁ, ভেতরের কথা সবাই জানে না, সবাইকে জানানোও হয় না। শুধু ডাক্তারকে অথবা পীরকে জানানো হয়। ডাক্তারকে শারীরিক চিকিৎসার জন্য আর পীরকে রূহানি চিকিৎসার জন্য জানানো হয়।

যখন যুবক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায় এবং তারা তালাকসংক্রান্ত মাসায়েলগুলো জানেও না, ফলে তালাক পড়ে যায় এমন শব্দ বলে ফেলে; অথচ মনে করে, তালাক পড়েনি। কেউ-কেউ তো এমনও আছে যে, তালাক দিয়েছে বহুবছর আগে, পরে যখন বিষয়টি জানাজানি হয়, তখন বলে, 'আরে ভাই! আমি তো রাগের মাথায় তালাক দিয়েছিলাম! আচ্ছা! বলুন তো, একথা কি কোথাও লেখা আছে যে, আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি খুশি হয়ে তালাক দিয়েছে? এমন কোনো ব্যক্তি কি দেখেছেন, যে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি খুব সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্টির কারণে স্ত্রীকে বলছে, 'আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি?' আরে আল্লাহর বান্দা! তালাক তো হয়ই রাগের মাথায়। এটা কেমন কথা হলো যে, আমি রাগের মাথায় তালাক দিয়েছি?

কেউ-কেউ বলে, আমি তালাক বলে তো ফেলেছি, কিন্তু এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য তালাক ছিল না। ভাই! তোমার বলা কথা লেখা হয়ে গেছে। এবার তোমার উদ্দেশ্য থাকুক আর না থাকুক বাকি ফয়সালা হবে আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী। দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারবা; তবে আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবা না। লজ্জা-শরমের কারণে কাউকে বলেও না। তাছাড়া বলে, কী আর করব? এখন তো সন্তানাদিও হয়ে গেছে। স্বামীও প্রস্তুত, স্ত্রীও প্রস্তুত। এভাবে শরীয়তের হুকুম অমান্য করেই বাকি জীবন কেটে যাচ্ছে।

এমন হয় যে, স্বামী মাসায়েল না জানার কারণে মুখে কুফরি কালেমা উচ্চারণ করছে। ফলে তারা কাফের হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিবাহ ভেঙে যাচ্ছে। তারপরও তাদের একত্রে বসবাস চলছে। অথচ তাদের এ-বিষয়ে কোনো খবরই নেই। একটা পাপ হলো কুফরি, আরেকটা হলো যিনা। আল্লাহর দরবারে এসবের পৃথক-পৃথক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) লিখেছেন, দুই ব্যক্তি কথা বলছিল। একজন বলল, বন্ধু! এটা শরীয়তের নির্দেশ। অপরজন বলল, আরে রাখ

তোর শরীয়তের নির্দেশ। তো সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে। অর্থাৎ শুধু এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলার কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। আজ শরীয়তের প্রতি সেই আযমত ও মর্যাবোধ অন্তরে নেই, যা থাকা উচিত ছিল।

মানুষ কাজ তো করে; কিন্তু এই অনুভূতিই হয় না যে, আমি যা করছি তা কি ভালো, না মন্দ।

একব্যক্তির অমার্জিত মন্তব্য

একজনকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে শরীয়ত অনুযায়ী আমলকারী হবে। নামাযী হবে। কাজ করছিল। তাকে তার ম্যানেজার ডেকে বলল! কী অবস্থা তোমার? কেমন আছ?

সামনে সে যে-উত্তরটা দেবে তা লক্ষ করুন। সে বলল, 'আছি মোটামুটি। জীবিকার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়, নামায কালামও পড়তে হয়। কী করব, অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। এটা আমার বদনসিব।'

কথাগুলো সে হাসতে-হাসতে বলে চলে গেল। আমি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এই লোকটি? সে বলল, নামায কালাম তো পড়ে, তবে একটু রাগ বেশি; তো তাই মাঝেমধ্যে এ রকম মন্তব্য করে।

তো বলুন, শরীয়তের বিধানের প্রতি বিরক্তি প্রকাশমূলক মন্তব্যের কারণে যে তাদের ঈমান চলে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে তাদের কোনো খবরই নেই। এজন্যই দীনের হেফাজতের জন্য ইল্‌ম শেখা জরুরি, ঈমানের হেফাজতের জন্য তাযকিয়া জরুরি এবং দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ জরুরি।

নিজের কথার ব্যাপারেও উদাসীনতা!

মানুষের মধ্যে উদাসীনতা এত প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, তার নিজের মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে? তার হাত কী করছে এ-বিষয়েও সে কিছু বোঝে না।

একবার একস্থানে কয়েকজন বসে গল্প করছিল। কথার ফাঁকে একজন শরীয়তপরিপন্থী কোনো মারাত্মক কথা বলে ফেলল। অন্যারা বলল, এই! এভাবে বলো না। সে বলল, না; আমি তো এমন কিছু বলিনি। বন্ধুরা বলল, তুমি তো এ কথা বলেছ। কিন্তু সে বলছে, না, আমি একথা বলিনি। তো মানুষের মধ্যে মাঝে-মাঝে এত বেশি উদাসীনতা চেপে বসে যে, তার মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে, সে বিষয়ে তার কোনো খবরই থাকে না।

তো এমনটা কেন হয়? কারণ, সেই বান্দার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট এবং তার দোষক্রটিগুলো তার দৃষ্টির আড়াল করে দেন। ফলে সে নিজের কোনো দোষ দেখে না। কিন্তু অন্যের দোষক্রটি ঠিকই তার চোখে পড়ে।

যাহোক, আল্লাহ যখন কোনো বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন, তখন তার ক্রটিবিচ্যুতিগুলো তার সামনে স্পষ্ট করে দেন। ফলে সে সংশোধনের সুযোগ পায়। আর যার উপর তিনি অসন্তুষ্ট হন, তার দোষক্রটিগুলো তার দৃষ্টির আড়াল করে দেন। ফলে সংশোধনেরও সুযোগ পায় না, অবধারিত শাস্তি হতেও মুক্তি পায় না।

দ্বিমুখী আচরণ বর্জন করুন

প্রত্যেক মানুষেরই দ্বিমুখী আচরণ ছেড়ে দেয়া উচিত। নিজের বাহিরটা তেমনই দেখানো উচিত যেমনটা তার ভেতর। অথবা নিজেকে যেমনটা প্রকাশ করে, ভেতরটাকেও তেমনি বানিয়ে নেওয়া এবং নিজেকে তেমন করে পরিচালনা করা। ভেতর-বাহিরের বৈষম্যকে দূর করা এবং দ্বিমুখী আচরণ পরিহার করা। আপনারা হয়ত দেখেছেন, অনেকেই এমন আছেন, যারা মিথ্যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। এটা অনেক বড় পাপ। মিথ্যাকে তারা কেন ভয় পান? কারণ, লোকেরা বলাবলি করবে, দেখো, সূফী হয়ে মিথ্যা কথা বলে, তালেবে ইলম হয়েও মিথ্যা বলে। দেখো, মুখে সুন্নতি দাড়ি, অথচ মিথ্যা ছাড়তে পারেনি; হাফেযে কুরআন হয়ে মিথ্যা কথা বলছে, আলেম হয়েও মিথ্যা পরিহার করতে পারেনি। তো মিথ্যা থেকে অনেকেই শুধু লোক লজ্জার কারণেই বেঁচে থাকেন।

কুদৃষ্টি থেকে কারা বেঁচে থাকে

এক ধরনের গুনাহ এমনও আছে, যা করলে কেউ কিছু বলেও না, লজ্জাও দেয় না। সেটা হলো কুদৃষ্টি। কী এমন সমস্যা এতে? সূফী সাহেব সূফীই আছেন, কারী সাহেব কারীই আছেন, পীর সাহেব পীরই আছেন, হাজী সাহেব হাজীই আছেন। যেহেতু এই গুনাহে কেউ লজ্জা দেয় না, তাই এযুগে গুনাহটা খুব ব্যাপক হয়ে গেছে। যদি কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারীদের চোখের রং বদলে যেত, তা হলে বহুলোক কুদৃষ্টি পরিহার করত। এখন তো বোঝা-ই যায় না, কোন দিকে তাকাচ্ছে, কী নিয়তে তাকাচ্ছে। অন্তরের সম্পর্ক তো আল্লাহর সঙ্গে। এই গুনাহ থেকে কেবল সে-ই পরিত্রাণ পেতে পারে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় হবে।

দোষদর্শী চোখ

গাছের কাছে যেমন নিজের ফল ওজনি মনে হয় না, মানুষের কাছেও নিজের দোষ মন্দ বলে মনে হয় না। তারপরও যখন আমরা আমাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হব, তখন তা সংশোধনের সুযোগ হবে। আমাদের মাশায়েখগণ একে 'দীদে কুছূর' বা 'ত্রুটিদর্শী চোখ' নাম দিয়েছেন। 'দীদে কুছূর' কাকে বলে? নিজের দোষত্রুটি জানা এবং স্বীয় বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হওয়াকেই 'দীদে কুছূর' বলে।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) খুব চমৎকার একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন, অমুক বান্দা 'দিদে কুছূর' লাভে ধন্য হয়েছে। এটি একটি পরিভাষা, যা তিনি চালু করেছেন। তোমরা নিজেদের দু'আসমূহের মধ্যে এই দুআও করো যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দীদে কুছূর দান করে ধন্য করুন। অর্থাৎ আমাদের দোষত্রুটিগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিন।

নিজের দোষত্রুটি জানার উপায়

নিজের দোষত্রুটি চেনার চারটি উপায় আছে। যেহেতু এটি খুসুসী মজলিস, তাই কিছু কথা আপনাদের বলা হবে এবং কিছু কথা আপনাদের দ্বারা বলানো হবে, যেন সবক পাকাপোক্ত হয়ে যায়। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কেউ মুরাকাবায় যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। মাঝেমধ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে, অমুক বিষয়ে কী বলা হয়েছিল? যেন বোঝা যায়, কে কতটুকু মনোযোগসহ শুনছেন।

১. শাইখে কামেলের নজরে থাকা : শাইখ হলেন আয়নার মতো। শাইখের উদাহরণ হলো :

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ

'মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ।'

যেভাবে আয়নায় দেখলে মুখের আকৃতি-সৌন্দর্য দেখা যায়, তদ্রূপ শাইখের নিকট বসার দ্বারা মানুষের উপর তার দোষত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায়। আর যেগুলো প্রকাশ পায় না, সেগুলো শাইখ প্রকাশ করে দেন। বুঝিয়ে দেন, বকে দেন। ফলে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে এসে যায়।

আজকাল তো শাইখের নিকট প্রস্তুতি গ্রহণ করেই আসা হয় যে, শাইখ যেন আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কিছুই না জানেন। যদি কোনো স্বপ্নের কথা

শোনায় তখন ততটুকুই বলে, যতটুকু তার নিকট ভালো মনে হয়েছে, স্বপ্নের যে-অংশ তার নিকট মন্দ বলে মনে হয়েছে, কৌশলে তার বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ– এ হলো সেই রোগী, যে চায়, ডাক্তার যেন আমার ক্ষতস্থান দেখতে না পায়। তো যে-রোগী ডাক্তারের কাছে নিজের রোগ লুকিয়ে রাখে, তার কী করে চিকিৎসা হবে? ডাক্তারের সামনে তো ক্ষতস্থান খুলতে হয়, তাকে দেখাতে হয়। সুতরাং নিজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো অবশ্যই বলতে হবে। তবেই তো ইসলাহ সম্ভব হবে। শয়তান এত নিকৃষ্ট যে, সে মানুষকে এই বলে প্রতারিত করে যে, তুমি নিজের দোষ মানুষকে কেন বলবে? এটা তোমার আর আল্লাহর মাঝের গোপন বিষয়। তা হলে এ-বিষয়ে মাসআলা শুনে নিন।

শাইখের কাছে দোষত্রুটি বর্ণনার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো সাধারণ মানুষের কাছে নিজের দোষত্রুটি প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে যার চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন আছে, তাকে বলতে হবে। অন্যথায় চিকিৎসা কীভাবে হবে? উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে নিজের ত্রুটিবিচ্যুটিগুলো বলার দ্বারা ইসলাহ করা সম্ভব। এ-কারণেই শরীয়ত একে নিষেধ করেনি। এমনকি যদি কোনো মহিলার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করাতে হয় এবং কোনো নারী ডাক্তার না থাকে, তা হলে পুরুষ ডাক্তারের সম্মুখে ক্ষতস্থান বেপর্দা করার অনুমতি আছে। শয়তান একথা বলার সময় তাকে বলে, আরে কেন? তুমি কেন নিজের দোষত্রুটি বলতে যাবে?

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, একেবারে খাঁটি মনে মানুষ তার অন্তরে যে-বিষয় অনুভব করবে, তা-ই শাইখের কাছে উন্মুক্ত করে দেবে। মাশায়েখগণের সিনা মানুষের আমানতের খাযানা। এক হলো, তিনি তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য সাহায্য করেন, তাদের বোঝান, রোগ দমনের পদ্ধতি বলে দেন। আর দ্বিতীয় হলো, নির্জনে-নিভৃতে তার জন্য দু'আ করেন। এজন্যই শাইখের নজরের সামনে থাকার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন আমাদের অবস্থা দেখে ভুলগুলো ধরিয়ে দেন।

আজ যদি কেউ কারো ত্রুটিবিচ্যুতি শাইখের কাছে বর্ণনা করে দেয়, তখন তাকে চোগলখোর বলে গালি দেওয়া হয়। এদিকে তাকায় না যে, হায় এমন কাজ আমি কেন করলাম? আমার এমন করা উচিৎ হয়নি। না; এমন তো করেই না, বরং তালাশ করতে থাকে, আমার ব্যাপারে শাইখের কাছে এসব কে বলেছে। মনে রাখবেন, যেব্যক্তি একাজ করার চেষ্টা করল, সে যেন

তার ইসলাহ ও সংশোধনের পথ বন্ধ করে দিল। শয়তানি ফাঁদ যে শুধু অন্ধকার হয়ে নজরে ধরা পড়বে শুধু তাই নয়; বরং শয়তান এমন ফাঁদও পাতে, যা সালেক বান্দার চোখে নূর মনে হবে। অথচ তা নূর নয়। এমন ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করা খুবই কঠিন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর এক মুরিদ ছিল। সে প্রতিদিন স্বপ্নে জান্নাত দেখতে পেত। কয়েকদিন দেখে-দেখে তার মধ্যে তুষ্টি এসে গেল। সে লোকদের কাছে বলে বেড়াত, আমি তো জান্নাতে ভ্রমণ করি; জান্নাতের আলিশান বালাখানা দর্শন করি ইত্যাদি ইত্যাদি। একথা শাইখের কানে পৌঁছে গেল।

যখন সেই মুরিদ শাইখের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এল, তিনি তাকে বোঝালেন এবং বললেন, ভাই! তুমি যেগুলো দেখছ, এগুলো শয়তানের ফাঁদ। সে তোমাকে আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত করে এই মাকাম থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে যে, তুমি এগুলো মানুষের মধ্যে প্রচার করা থেকে বিরত থাকো।'

সে শাইখের কথা শুনেছে ঠিক, কিন্তু মজলিস থেকে উঠে বলতে লাগল, আমার শাইখও আমার সঙ্গে হিংসা শুরু করে দিয়েছেন। আমার মাকাম ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে শাইখের অন্তরজ্বালা শুরু হয়ে গেছে।

যাহোক শাইখ মজলিসে একবার বলেছিলেন, স্বপ্নে জান্নাত দেখার সময় একবার 'লা হাওলা ওয়া কুউওয়াতা' পাঠ করো। তো পরের রাত যখন সে আবার জান্নাত দেখছিল, তার মনে পড়ে গেল, শাইখ তো লা হাওলা ওলা কুউওয়াতা' পড়তে বলেছিলেন। সে পড়ে বসল। দেখল, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার পরিবর্তে কিছু হাড় ও নাপাকি পড়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ খুলে গেল। সে খুব আশ্চর্য হলো? এরপর শাইখের নিকট গিয়ে বলল, হযরত! আপনি বলেছিলেন 'লা হাওলা ওলা কুউওয়াতা' পড়ার জন্য। আমি তা পড়লাম আর তৎক্ষণাৎ এই ঘটনা ঘটল। শাইখ তাকে বোঝালেন, দেখো, শয়তান স্বপ্নে তোমাকে কোনো সুন্দর বাগান দেখিয়ে তোমার অন্তরে আত্মতুষ্টি ও অহংকার সৃষ্টি করেছিল। তুমি কোনো জান্নাত নয়; বরং একটি সুন্দর দৃশ্য দেখছিলে মাত্র।

মানুষ নিজের কৃতিত্বের উপর সন্তুষ্ট হওয়া বা আত্মতুষ্টি এটাও মারাত্মক ক্ষতিকর স্বভাবসমূহের একটি। এটা মানুষকে বরবাদ করে দেয়।

এখন জান্নাতের দৃশ্য দেখা অথবা তা জানা এটা কেমন ফাঁদ? সবাই তো বুঝতে পারে না। শয়তানের ফাঁদ বড় আশ্চর্যজনক। তাই মূলনীতি হলো, শাইখের নিকট নিজের ভালো অবস্থাগুলোর বর্ণনা দিন আর না দিন, দোষক্রটিগুলো অবশ্যই বলে দিন, হযরত! এই ক্রটিগুলো আমার মধ্যে আছে; আমি এর ইসলাহ চাচ্ছি। প্রথমত শাইখ আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন, এগুলো থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে। অন্যথায় তিনি দু'আ করবেন আর সেই দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দোষক্রটিগুলো পরিহার করার তাওফীক দান করবেন।

যার ওস্তাদ নেই তার কোনো ভিত্তি নেই

মানুষ কখনোই নিজের চিকিৎসা নিজে করতে পারে না। ওস্তাদের প্রয়োজন পড়ে।

ہر آں کار کہ بے استاد باشد

یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

'যে-কাজ ওস্তাদের নিকট দীক্ষা ব্যতীত হবে, সেই কাজ ভিত্তিহীন ও নড়বড়ে হবে।'

সুতরাং কেউ যদি নিজের চিকিৎসা নিজেই করে, তবে সে ধোঁকা খেয়ে যাবে। শয়তান তাকে খুব সহজেই পদস্খলিত করে দেবে।

একব্যক্তির শিশুসন্তান অসুস্থ হয়ে গেল। পেট খারাপ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী বলল, গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসুন। লোকটি একটু গোড়া টাইপের লোক ছিল। বলল, এর জন্য ডাক্তার ডেকে আনার দরকার কী? আমি নিজেই গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি। সে ভেবেছিল, ডায়রিয়া হয়েছে, পানির মতো পায়খানা হচ্ছে, যদি পেট শক্ত করার ওষুধ দেওয়া হয়, তা হলে ঠিক হয়ে যাবে। সে অনুযায়ী ওষুধের দোকানে গিয়ে বলল, ভাই! পেট শক্তের ওষুধ দিন। দোকানদার ওষুধ দিয়ে দিল। খাওয়ানোর পর দেখা গেল, রোগ আরও বেড়ে গেছে। দুই দিনে বাচ্চার অবস্থা কাহিল হয়ে গেল। এবার বেচারী স্ত্রী আর বসে না থেকে নিজেই ডাক্তার ডেকে আনল। ডাক্তার পূর্বের ওষুধ বন্ধ করে ভিন্ন ওষুধ দিল। বাচ্চা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল।

ডাক্তার বাচ্চার মাকে জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চার এই অবস্থায় তাকে ওই ওষুধটি কে খাওয়াতে বলেছে? সে উত্তর দিল, তার বাবা এনেছে। বাবাকে

জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই ওষুধটি কীভাবে দিলেন? বলল, জনাব! আমি ভেবেছিলাম, পেট নরম হয়ে গেছে; তো শক্ত করার ওষুধ খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই দোকানে গিয়ে পেট শক্তের ওষুধ চেয়েছি। যা দিয়েছে তা-ই খাইয়েছি। ডাক্তার বলল, আরে বোকা কোথাকার! আমাদের ডাক্তারদের নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা আছে। সেই বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ। কেউ যদি এসে আমাদের বলে, ভাই! পেট শক্তের ওষুধ দিন, আমরা তাকে পায়খানা কষার কথা ভেবে পেট পাতলা হওয়ার ওষুধ দিয়ে থাকি। আপনি নিজের থেকে রোগ নির্ধারণ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। একে তো বাচ্চাটির পেট নরম ছিল, তার উপর তাকে খাওয়ানো হয়েছে পেট পাতলা করা ওষুধ। বলুন তো এই শিশু কি বাঁচবে, না মরবে? ঠিক এভাবেই যেব্যক্তি নিজেই নিজের চিকিৎসা করবে, তার দশাও এমনই হবে। এজন্যই সবর্দা রোগের জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। তো সেই চিকিৎসকের নাম কী? সেই রূহানী চিকিৎসকের নাম হলো 'মুরশিদ' বা 'শাইখ'।

২. নেককার লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব : নিজের দোষত্রুটি চেনার দ্বিতীয় উপায় হলো সৎ ও দীনদার লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা। যে-বন্ধু দীনদার হবে, সে সংশোধন করতে থাকবে, বলতে থাকবে, আপনি এমন করবেন না, এমন করবেন না। বরং এটা এভাবে করুন ইত্যাদি। আপনি স্বেচ্ছায় সৎ লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে যেন সৎ লোকদের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় এবং এভাবে চিন্তা করবেন যে, এরা আমাকে খারাপ কোনো কাজ করতে দেবে না। এজন্যই যদি কেউ সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু বলে, দোষ ধরিয়ে দেয়, তাহলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং তাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করতে হবে।

সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, যেব্যক্তি আমার নিকট আমার দোষত্রুটির তোহফা আনবে, আমি তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ দেব। আমাদের মাশায়েখগণ এ-জাতীয় বিষয়ে আনন্দিত হতেন।

ভালো বন্ধুর পরিচয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তম বন্ধুর আলামত বলুন। নবীজি যা বলেছেন, তার মধ্যে এটিও ছিল যে, যে-বন্ধু তোমার ভালো কাজে তোমাকে সাহায্য করে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, সে-ই তোমার ভালো ও খাঁটি বন্ধু।

'ভালো কাজে সাহায্য করো'-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যখনই একজন আরেকজনকে এমন কথা বলতে দেখতেন, সঙ্গে-সঙ্গে বলে দিতেন এবং তারা এতে মনক্ষুণ্ন হতেন না। একবার হযরত ওমর (রাযি.) খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠলেন। এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে ভরমজলিসে প্রশ্ন করল, বাইতুল মাল থেকে সবাই একটি করে চাদর পেয়েছে; আপনি কেন দুটি চাদর নিয়েছেন একথার জবাব দিন; অন্যথায় আমরা আপনার খুতবা শুনব না। একথার উপর আমীরুল মুমিনীন তাকে কোনো শাস্তি দেননি। তিনি তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)কে বললেন, আব্দুল্লাহ! দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দাও। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, বাইতুল মাল থেকে সবার মতো আব্বাজানও একটি চাদর পেয়েছেন। আমিও একটি চাদর পেয়েছি। আমি আমার চাদরটি আব্বাজানকে হাদিয়া দিয়েছি। এভাবে তাঁর নিকট দুটি চাদর দেখা যাচ্ছে।

যাহোক প্রশ্নের জবাব মিলে গেল। তার আখলাক ছিল উন্নত। প্রশ্নকারীরাও অনায়াসে প্রশ্ন করত, উত্তরদাতারাও অনায়াসে উত্তর দিত। কারো মধ্যেই নেফাক ছিল না। এজন্য বলি দীনদার লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখলে পদে-পদে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে–

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের উপর থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিৎ, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, কাকে বন্ধু বানাবে।'

সেই দরবেশ এমনই ছিল

এক বাদশাহ ছিলো। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বহু ওলামায় কেরামের আসা-যাওয়া ছিল। তিনি সৎ ও দীনদার ছিল। সবাইকে খুব সম্মানের সাথে দরবারে বসাতেন। একব্যক্তি এমন ছিল যে, বাদশাহ নিজে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে নিয়ে সিংহাসনে বসাতেন এবং নিজে ছাত্রের মতো তার সামনে বসে পড়তেন। এই বেচারা শীর্ণকায় মলিন পোশাকধারী ছিল। অন্যান্য বড়-বড় বিচারপতি ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের আশ্চর্যের সীমা থাকত না যে, আমরা মর্যাদার দিক থেকে এত উঁচু অথচ বাদশাহ এই নগণ্য ফকির লোকটাকে এত সম্মান দিচ্ছেন! নিজের সিংহাসন ছেড়ে তাকে বসাচ্ছেন এবং নতজানু হয়ে তার সামনে বসে পড়ছেন! সিনিয়র বিচারপতিদের দু-একজন শেষ পর্যন্ত বাদশাহকে প্রশ্ন করেই বসল যে, বাদশাহ সালামত! এই সম্মান

প্রদর্শনের কারণ কী? উত্তরে বাদশাহ বললেন, আপনারা তো আমার কাছে আসেন। নায়েবে রাসূল হিসেবে আমিও আপনাদের তাযীম করি। আপনারা আমার দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েও, প্রত্যক্ষ করেও আমাকে কিছু বলেন না; নীরবে চলে যান এবং সন্তুষ্টচিত্তেই ফিরে যান। কিন্তু ইনি একটু ব্যতিক্রম। তিনি এসে যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি দেখেন, তাহলে মুখের উপরই বলে দিয়ে আমাকে সতর্ক করেন। এতে আমি আত্মসংশোধনের সুযোগ পাই। আমি তাঁকে ওস্তাদ মনে করি। এজন্যই তাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ছাত্র হয়ে তার সামনে বসে পড়ি।

আগের দিনের দরবেশগণ এমনই ছিল। তারা যুগের সুলতানদের নির্ভয়ে শিক্ষা দান করতেন।

বাদশাহকে শিক্ষাদান

বাদশাহ হারুনুর রশীদ এক বুযুর্গের কাছে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। উজির যখন বাদশাহর আগমনের অনুমতি চাইল, তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাকে অনুমতি দেব না। উজির বলল, জনাব! তিনি খুব দুর্বল এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। আপনি অন্তত তাকে সাক্ষাতের সময়টুকু হলেও বলে দিন। বুযুর্গ বললেন, না! আমি ব্যস্ত; অনুমতি হবে না।

ইতোমধ্যে বাদশাহ নিজেই বুযুর্গের কামরায় প্রবেশ করলেন। উজির বললেন, জনাব! তিনি এসে গেছেন। একথা শোনামাত্রই বুযুর্গ তার বাতি নিভিয়ে দিলেন। উজির জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! আপনি বাতিটা কেন নেভালেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এই অত্যাচারী ব্যক্তির মুখও দেখতে রাজী নই। মুখের উপরই বাদশাহকে জালেম ও অত্যাচারী বলে দিলেন।

বাদশাহ যখন জোরপূর্বক সালাম দিয়ে মুসাফাহা করলেন, তখন বুযুর্গ তার হাতে হাত রেখে বললেন, আহ! এই হাত কত নরম! যদি এই হাত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেত, তা হলে কতই-না ভালো হতো। বাদশাহ বললেন, হযরত! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, এই সিংহাসনে প্রথম অমুক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিল। তারপর অমুক। তারপর তোমার পিতা। এখন তুমি। যেভাবে তোমার পিতা থাকতে পারেননি, তুমিও থাকতে পারবে না। সুতরাং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নাও।

আগের দিনের বিচারপতিরাও এমন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন যে, বাদশাহরাও তাদের ভয় করে চলতেন। আজ তো বাদশাহর তোষামুদি করে

বিচারপতি পদ গ্রহণ করা হয়। কনফারেন্স হয় ওলামা-মাশায়েখগণের আর সেখানে শাইখুল মাশায়েখ হন বাদশাহ। যাহোক আমাদের বুযুর্গরা এ-বিষয়ে আপসহীন ছিলেন। যা বলতেন স্পষ্ট করে বলে দিতেন। আর এতেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

গভর্নর হলে এমনই হও

এ-কারণেই হযরত ওমর (রাযি.) নিজের গভর্নরদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতেন। জনগণকে জিজ্ঞাসা করতেন, বলো তো, যাকে আমি গভর্নর নিযুক্ত করেছি, সে কেমন লোক? একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে, হযরত সা'দ ইবনে সাঈদ আমেরি (রাযি.)-এর ব্যাপারে লোকেরা তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করল।

এক. শুক্রবারে ছুটি কাটান।

দুই. দিনে ঠিকমতোই কাজ করেন। তবে ঈশার নামাযের পরপরই দরজা বন্ধ করে ফেলেন।

তিন. সকালে অফিসে আসতে একটু দেরি করেন।

হযরত ওমর (রাযি.) তাঁকে ডেকে এই অভিযোগগুলোর উপযুক্ত জবাব তলব করলেন।

তিনি উত্তর দিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আমার ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। ঘরের কাজকর্মগুলো সম্পাদন করতে আমার স্ত্রীর খুব বেগ পেতে হয়। তাই সকালবেলা আমি বাচ্চাদের সামলে রাখি। ততক্ষণে আমার স্ত্রী গৃহস্থালির কাজগুলো শেষ করে নেয়। এ-কারণে আমার অফিসে আসতে একটু দেরি হয়। তারপর সারাদিন তো আমি জনগণের খেদমত করি, আল্লাহর মাখলুকের সেবায় নিয়োজিত থাকি। তাই রাতটাকে আমি আমার আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছি। আর বাকি থাকল, জুমার দিনের প্রসঙ্গ। তো আমার কাছে এক জোড়া পোশাকের বেশি অন্য পোশাক নেই। একে এক সপ্তাহ পরিধান করি এবং জুমার দিন লুঙ্গি পরে সেই জোড়া ধুয়ে দিই। ধোওয়া ও শুকানোর কাজে আমার পুরো দিন লেগে যায়। এজন্য সপ্তাহে জুমার দিন আমি ছুটি কাটাই।

হযরত ওমর (রাযি.) সবকিছু শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! ওমর যাকে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছে, আল্লাহর রহমতে বাস্তবেই সে এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি।

সব সময় তো শাইখে কামেলের সোহবত পাওয়া কঠিন। সামান্য সময় পাওয়া যায়; বাকি সময় নিজের আশেপাশের মুত্তাকী লোকদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিন; তাদের সঙ্গে ওঠাবসা রাখুন, যেন তারা আপনাকে নেকির কাজে সহযোগিতা করতে পারে।

৩. হিংসুকের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের খবর নেওয়া : নিজের দোষত্রুটি চেনার উপায় হলো, মানুষ তার ব্যক্তিত্বের ভালো-মন্দ দিকগুলো নিজের শত্রুদের হতে সংগ্রহ করবে। নিজের দোষগুলো হিংসুকের মুখে শুনবে। আজ আমাদের মধ্যে এ-বিষয়টি নেই। আমরা তো হিংসুকের কথা শুনতেও রাজী নই। তার সব কথাই মিথ্যে বলে মনে হয়। আমাদের মাশায়েখেগণ এমন করতেন না। বরং শত্রুর কথাগুলো এ নিয়তে গুরুত্বের সাথে শুনতেন যে, বাস্তবেই যদি আমার মধ্যে এই ত্রুটিগুলো থাকে, তাহলে নিজেকে সংশোধন করে নেব।

বিষাক্ত কথাও হজম করে নিতে হবে

একবার হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নিকট একটি কিতাব পৌঁছল, যা তার কোনো হিংসুক ও বিদ্বেষী লোক লিখেছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি তার কোনো ছাত্রকে বললেন, আমাকে কিতাবটি পড়ে শোনাও। ছাত্র বলল, হযরত! এই কিতাবটি আপনার এক হিংসুকের লেখা। সে আপনার ব্যাপারে এতে বহু মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা লিখেছে। হযরত বললেন, হ্যাঁ আমি চাচ্ছি, তুমি পড়ে শোনাও। হতে পারে, এমন কোনো বিষয় এতে আছে, যা বাস্তবেই আমার মধ্য আছে। আমি তখন তা সংশোধনের সুযোগ পাব।

আজ তো আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বা হিংসুকের সমালোচনা শোনাও বরদাশত হয় না। শিক্ষিত হোক কিংবা মূর্খ, আলেম হোক কিংবা মুফতী; নিজের মত থেকে ভিন্নমতাবলম্বীর কথা একদম বরদাশত হয় না। আর এ-কারণেই ইসলাহের পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্মরণ রাখবেন, যার দোষত্রুটি বলার কেউ থাকবে না, সে দুনিয়ায় মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন। কে জানে, শয়তান কখন তাকে কুপোকাত করে ফেলে! আমাদের মাশায়েখগণ শত্রুদের এমন কথাগুলো শুনতেন এবং একে মিষ্টান্ন দ্রব্য মনে করে খেয়ে ফেলতেন।

তুমিই আমাকে সঠিক চিনেছ

হযরত খাজা বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। এক মহিলা তাকে বলল, ওহে রিয়াকার! তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তোমার কল্যাণ

করুন। বিগত বিশ বছরের মধ্যে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে আমাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে।

এক্ষেত্রে আমাদের কারো সঙ্গে যদি এমন হতো, তা হলে লাঠি হাতে এখনই এর প্রতিকার হয়ে যেত। যাহোক, শত্রুর মুখেও আমাদের সংশোধনের কথা পাওয়া যেতে পারে। তাই সালেকের মধ্যে এই গুণটি থাকতে হবে যে, সে অন্যের সমালোচনা শুনবে। আজ তো কেউই শোনে না। এ-ও বলছে, সে-ও বলছে। এ তার কথা শোনে না, সে এর কথা শোনে না। সবাই হইচই করে যাচ্ছে। শুনতে কেউ প্রস্তুত নয়। আমাদের বড়রা হিংসুক ও শত্রুদের সমালোচনাও শুনতেন এবং উপযুক্ত কথা পেলে নিজের সংশোধনও করে নিতেন। এ-কারণে তাদের হিংসুকরা যত কথা-ই বলত, শুনে তাঁদের এক বিন্দুও ক্রোধ আসত না। কেন? কারণ, তারা যদি ভুল বলে, তবে কোনো আফসোস নেই। আর যদি সঠিক হয়, তা হলে তা সংশোধন না করলে নিজেরই ক্ষতি।

এক বুযুর্গের ঘটনা

এক বুযুর্গ তাঁর গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিলেন। সেখানে তার মুরিদের সংখ্যাও কম ছিল না। পথে একব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে তাকে বিস্ময়কর সব কথা শোনাতে লাগল। তিনিও শুনেই চললেন। যখন নিজ গ্রামের কাছে এসে গেলেন, এবার তিনি হাঁটা বন্ধ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকটি পেরেশান হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন কেন? তিনি বললেন, দেখো, সামনে আমার গ্রাম। সেখানে আমার অনেক মুরিদ ও ভক্ত আছে। সেখানে যদি তোমার উচ্চবাক্য তারা দেখে, তা হলে তোমার অবস্থা খারাপ করে দেবে। তাই এখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। তুমি যা বলতে চাও, বলে শেষ করো; আমি শুনছি।

অন্তরে এত প্রশস্ততা ছিল তাঁদের। এমন হৃদয়বান মানুষ এখন পাওয়া বড়ই কঠিন। সামান্য কথায় ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায়।

মানুষ হিংসা করে কেন

মানুষ মানুষের সঙ্গে কেন হিংসা করে? এর একটা কারণ হলো, এটা তার দু'আর ফলাফল। সেটা এভাবে যে, মানুষ নামাযে দু'আ করে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

' হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সরল পথ দেখান।'

এই দু'আর ফলে আল্লাহ তাকে সরল পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে কিছু হিংসুক ও শত্রু তৈরি করে দিলেন। তারা তাকে বাঁকা ও মন্দ পথে চলতেই দেয় না। সামান্য একটু দোষ হলেই তাকে বাড়িয়ে হইচই শুরু করে দেয়। ফলে সে সোজা হয়ে যায়। হিংসুকের এই আচরণ বাহ্যিকভাবে যদিও খারাপ লাগে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা তার দু'আর ফলাফল। তাকে সোজা পথে পরিচালিত করার জন্য তার হিংসুকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এজন্য সকল হিংসুকের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখা ঠিক নয় যে, সে আমাদের অকল্যাণ চায়। হতে পারে, আমাদের দু'আর ফলস্বরূপ আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের হিংসা ও শত্রুতার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন আমরা সোজা হয়ে চলি। পুলিশরাও তেমন। তারা এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখে যে, ধরা পড়ার ভয়ে মানুষ প্রকাশ্য অপরাধ করে না। নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে কত মানুষ অপরাধ থেকে দূরে থাকে। তাদের ভয়, জানতে পারলে মানুষ কী বলবে? মানুষকে কীভাবে মুখ দেখাব? তো শত্রুদের মুখ দ্বারাও অনেক সময় মানুষের ইসলাহ হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখার চেষ্টা করবেন।

৪. অন্যদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করা : নিজের দোষ চেনার চতুর্থ উপায় হলো, অন্যদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। অর্থাৎ– যদি কোনো ব্যক্তি ভুল করে বসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি হবে, যে তার ভুল ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একই ভুল থেকে নিজেকে বিরত রাখে। প্রবাদ আছে–

اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ لِغَيْرِهٖ

'সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান, যে অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।'

হযরত লুকমানের পাণ্ডিত্য

হযরত লুকমান (আ.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি এত পাণ্ডিত্য কীভাবে অর্জন করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি সর্বদা অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। তাই আল্লাহ রাব্বুল ইযযত আমাকে পাণ্ডিত্য দান করেছেন। আমাদের সামনে অহরহ কত ঘটনা-ই তো ঘটছে। আমরা দেখছি; অমুক এই ভুল করে এই পরিণতির শিকার হয়েছে; কিন্তু তারপরও সেই ভুল পথে আমরাও পা বাড়াচ্ছি।

প্রকাশ্যে চোরের হাত কাটার বিধানের হেকমত

এবার দেখুন, শরীয়ত চোরের হাত কাটার আদেশ দিয়েছে। এর জন্য সমাজের লোকজনকে একত্রিত করো। মজমা তৈরি করার হুকুম দিচ্ছে। জনসমক্ষে চোরের হাত কাটা কেন? গোপনেও হাত কাটতে পারত। প্রকাশ্যে কাটার উদ্দেশ্য কী? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ভুল করার সে তো করেই ফেলেছে। কিন্তু যারা করেনি, তারা যেন এই ব্যক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একই ভুলের কাছেও না যায়। এজন্যই প্রকাশ্যে হাত কাটার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখবেন, বুদ্ধিমান লোকেরা অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আর বেকুবরা নিজের ভুল থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না। একবার ভুল করে আবারও একই ভুলে পা বাড়ায়। তো মানুষ যখন নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন তার দ্বারা আর ভুল হয় না। আর এটাই মুহাসাবা। এমনিভাবে অন্যের ভুল থেকে সে-ই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, যে নিজের মুহাসাবা করে, নিজের প্রতি নজর রাখে যে, আমি কী করছি, আমি কে। যখন মানুষ নিজের মুহাসাবা করবে, তখন তার দোষত্রুটিগুলো তার সম্মুখে প্রকাশিত হতে থাকবে।

কামেল মানুষের নিদর্শন

হযরত বোরহানুদ্দীন গরীব (রহ.)-এর একজন আলেম মুরীদ ছিলেন। তিনি এসে বললেন, হযরত! আমি যতই নিজের দোষত্রুটি দূর করি, ততই বেশি দোষ নিজের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে। হযরত বললেন, মাওলানা! কামেল মানুষ এমনই হয়। এটা তার কামেল হওয়ার লক্ষণ। সে যতই নিজেকে দোষমুক্ত করবে, ততই তার কাছে নিজের দোষগুলো প্রকাশিত হতে থাকবে।

সবাইকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করো

এজন্য মুমিন বান্দাকে সবাই ভালো মনে করে আর সে সবাইকে নিজের থেকে ভালো মনে করে।

বয়সে বড় হলে ভাবে, তিনি তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। নিশ্চয় তিনি আমার চেয়ে বেশি নেকি অর্জন করেছেন। তাই তিনি আমার চেয়ে উত্তম। আর যদি বয়সে ছোট হয়, তাহলে তার ব্যাপারে ভাববে, তার তো বয়স কম। গুনাহও অবশ্যই কম হবে। তাই সে আমার চেয়ে উত্তমও হবে। তো

বয়স্ক লোকের ব্যাপারে কীভাবে চিন্তা করল? তার বয়স বেশি; অনেক নেকি অর্জন করেছে; বেশি রমজান পেয়েছে, বেশি সংখ্যার লাইলাতুল কদর পেয়েছে; সুতরাং সে তো অবশ্যই আমার থেকে বেশি উত্তম হবে। আর যে বয়সে ছোট, তার ব্যাপারে কীভাবে চিন্তা করল? তার বয়সও কম, গুনাহও কম; তাই সে আমার চেয়ে অনেক উত্তম।

আলেমকেও নিজের চেয়ে উত্তম ভাবে, ফাসেক পাপীকেও নিজের চেয়ে উত্তম ভাবে। আলেমকে উত্তম ভাববার মধ্যে তো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ফাসেককে নিজের চেয়ে উত্ত ভাববার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! একজন পাপের মধ্যে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তাকে নিজের চেয়ে কীভাবে উত্তম ভাবা যায়? আমাদের মাশায়েখগণ এক্ষেত্রে উত্তর দিয়ে থাকেন যে, পাপীকেও উত্তম ভাববার কারণ হলো, যদিও সে এই মুহূর্তে ফাসেক-পাপী; কিন্তু সে যদি কাঁটি তাওবা করে পাপের পথ পরিহার করে আল্লাহমুখী হয়ে যায়, তা হলে তার সকল পাপকে নেকি দ্বারা পবির্তন করে দেওয়া হবে। তখন তো সে আমার চেয়ে উত্তম হয়ে যাবে। তাছাড়া তার কাজকর্মগুলো তো আমাদের দৃষ্টিতে গুনাহ; কিন্তু হয়ত তার গোপন কোনো নেকি আছে, যার কারণে তার সকল পাপকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। কখনো তো এক নেকির বাহানায় আল্লাহ কারো ব্যাপারে মাগফেরাতের ফয়সালা করে ফেলেন। যেমন– বোখারি শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যভিচারী নারী কেবল একটা কুকুরকে পানি পান করানোর উসিলায় ক্ষমা পেয়ে গেছে।

আমাদের দৃষ্টিতে সে ফাসেক-পাপী ঠিক; কিন্তু তার নেকি ও পুণ্যের কাজগুলো আমাদের অজানা। হতে পারে, সে এমন কোনো নেকি করেছে, যা আল্লাহর নিকট এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে, এর উসিলায় তিনি তার সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এজন্য আলেমকেও নিজের চেয়ে উত্তম মনে করো, ফাসেকও নিজের চেয়ে উত্তম মনে করো।

মুসলমানদেরও নিজের চেয়ে ভালো মনে করে এবং কাফেরদেরও নিজের চেয়ে ভালো মনে করে। এ বিষয়টি হজম করা খুবই কঠিন। কারণ, মুমিনের বিষয়টি না হয় মেনে নেওয়া যায়, তার কোনো গোপন নেকি আছে, যার উসিলায় সে আমাদের থেকে উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কাফের? সে তো খোদাদ্রোহী। তাকে কী করে নিজের চেয়ে উত্তম ভাবা যায়?

আমাদের মাশায়েখগণ এ-বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সালেক সর্বদা বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে মুমিনকে নিজের থেকে ভালো

মনে করবে এবং কাফেরকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভালো মনে করবে। অর্থাৎ– হতে পারে, কাফের ভবিষ্যতে তাওবা করে আমার চেয়ে ভালো হয়ে যাবে। আর মুমিন তো আমার থেকে ভালো আছেই।

এমনকি নিকৃষ্ট কুকুরকেও নিজের থেকে ভালো মনে করবে। এখন একথাটা হজম করা তো আরো কঠিন। কারণ, শয়তান অন্তরে এ কথার কুমন্ত্রণা দেবে যে, আরে! বলে কী? আমরা হলাম আশরাফুল আখলুকাত তথা সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী! কুকুরকে কেন উত্তম ভাবব? সে তো নাপাক ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।'[১]

এবং এ আয়াত দলিল হিসেবে সামনে চলে আসবে।

মছনবিতে হেকমতপূর্ণ কথার কারণ

কেউ মাওলানা রুমি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি হেকমতের এই বিশাল ভান্ডার কীভাবে অর্জন করলেন? মছনবি শরীফে এত জ্ঞানগর্ভ ও হেকমতপূর্ণ কথামালা কোথায় পেলেন? মাওলানা রুমি (রহ.) উত্তর দিলেন, একবার আমার কাছে একটা কুকুর এসেছিল। কুকুরটা খোসপাঁচড়ায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ছিল। আমি তার খেদমত করলাম, তার চিকিৎসা করলাম, রুটি গোশত খাওয়ালাম। আমার এই আমল পছন্দ করে আল্লাহ আমাকে মারেফাত দান করেছেন। সে খুব বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলুন।

কুকুর দ্বারা মারেফাত লাভ

তিনি বললেন, আমি কুকুরের সঙ্গে ভালো আচরণ করি। আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেন এবং তিনি আমার মারেফাত লাভের কারণ সেই কুকুরের সেবাকেই বানিয়ে দিলেন। প্রশ্নকারী বলল, সেটা কীভাবে? মাওলানা উত্তর দিলেন, আমি আসছিলাম। পথে দুপাশে পানিভরা খেত ছিল। মাঝখানে সরু পথ। আমি সেই সরু পথ ধরে ক্ষেত অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, বিপরীত দিক থেকে একটা কুকুর আসছে। আমি থেমে গিয়ে

---

১. সূরা তীন : আয়াত ৪

চাচ্ছিলাম, কুকুর পানিতে নেমে আমার জন্য পথ ছেড়ে দিক; কিন্তু সে তা না করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। উদ্দেশ্য, আমি পানিতে নেমে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিই। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার সঙ্গে আমার কথপোকথন হলো। আমি বললাম, দেখ, তোর কোনো ইবাদত নেই; পাক-নাপাকি নিয়ে ভাবনাও নেই। আমার জন্য পাক-নাপাকিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাপাক হলে আমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। সুতরাং তুই পানিতে নেমে আমার পথ ছেড়ে দে।

কুকুর বলল, না; তা হবে না। আপনি পানিতে নেমে আমাকে রাস্তা দিন। তিনি বললেন, আমি পানিতে নামলে, আমার গায়ে নাপাকি লাগলে তোর তো কোনো লাভ নেই। তাই আমাকে যাওয়ার রাস্তা করে দে! একথা শুনে কুকুর উত্তর দিল, আসল কথা কিন্তু এটা নয়; আসল কথা হলো, আপনি নিজেকে উত্তম মনে করছেন। আমি পানিতে নামলে এবং আপনি নিজেকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করলে আপনার অন্তরে এমন নাপাকি লাগবে, যা কখনো পরিষ্কার হওয়ার নয়। পক্ষান্তরে যদি আপনি পানিতে নেমে আমাকে পথ করে দেন, তা হলে আপনার দেহে ওই নাপাকি লাগবে, যা ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব।

মাওলানা বলেন, কুকুরের একথা আমার সামনে আমার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত করে দিল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে পানিতে নেমে তার জন্য পথ করে দিলাম। আর এই আমলের কারণে আল্লাহ আমার জন্য মারেফাতের সাগর উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি যেহেতু কুকুরের সঙ্গে ভালো আচরণ করেছি, তাই কুকুর দ্বারাই তিনি আমাকে মারেফাত দান করেছেন। এবং এটাই আল্লাহর নিয়ম। যে-বস্তু দ্বারা আল্লাহ কষ্ট দেন, সেই বস্তু দ্বারাই তিনি আনন্দ দান করেন। যে-বস্তুকে পরীক্ষার কারণ বানান, সেই বস্তুকেই সফলতার কারণ বানান। এর উদাহরণ কুরআনে কারীম থেকে বুঝে নিন।

হযরত মুসা (আ.)-এর আম্মা যখন তাঁর সন্তানকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছেলেন, তখন কেন ব্যথিত ছিলেন? দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ কী ছিল? পানি; তাই না? পানিতে ডুবে বাচাধন না আবার মারা যায়! এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌মি নুকতা। তালেবে ইল্‌মরা মনযোগী হও! এখানে বাহ্যিক কারণ ছিল পানি। সন্তানকে পানিতে ভাসাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, পানি না আবার তার সন্তানের জীবন কেড়ে নেয়। এজন্য তার অন্তরে বেদনা ছিল, মাথায় দুশ্চিন্তা ছিল।

কিন্তু যখন আল্লাহর ওপর ভরসা করলেন, ধৈর্য ধারণ করে নিজেকে সংযত করে আল্লাহর ফয়সালার ওপর রাজি হয়ে গেলেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেন, তখন আল্লাহ তাকে সবরের বদলা দান করলেন, তাকে আনন্দ দান করলেন। কীভাবে? বনী ইসরাঈল কীভাবে মুক্তি পেল? অত্যাচারী ফেরাউন কোথায় ডুবে মরল? নীল নদে। পানিতে। যে-পানিকে মুসা (আ.)-এর জীবন হরণের কারণ বানিয়েছিলেন, ধৈর্যের পরীক্ষার পর সেই পানিকে তাদের আনন্দের কারণ বানিয়েছেন যে, এই পানিতেই তাদের চিরশত্রু ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। এটা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের একটি নিয়ম। যে-বস্তু দ্বারা কষ্ট দেন, সেই বস্তু দ্বারাই আবার আনন্দ দেন।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সঙ্গেও তা-ই হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রিয়পুত্র ইউসুফ (আ.)কে ভাইদের সঙ্গে দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তারা কৌশলে নিয়ে গেল। কুরআন সেই ঘটনা সম্পর্কে বলছে–

وَ جَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿۱۶﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ

'তারা কাঁদতে-কাঁদতে পিতার কাছে এসে বলল, হে আব্বাজান! আমরা খেলছিলাম। ইউসুফ আমাদের সামানার কাছে ছিল। হঠাৎ একটা বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল।'[১]

এই কান্না ছিল মিথ্যা কান্না। মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে ইউসুফের গায়ের জামাও নিয়ে এল। এ-ঘটনায় হযরত ইয়াকুব (আ.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তো তাঁর ব্যথিত হওয়ার বাহ্যিক কারণ হিসেবে এই রক্তাক্ত জামাটিই চিহ্নিত হলো। সন্তানের রক্তাক্ত জামা দেখেই তার অন্তর ব্যথিত হয়েছিল, এবার সন্তানের বিরহে তিনি এত কাঁদলেন যে, দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। এরপর একটা সময় এল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরীক্ষা শেষ করলেন এবং তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তখন কোন বস্তুটি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিল? ইউসুফের সেই রক্তাক্ত জামা। এই রক্তাক্ত জামা দেখেই বেদনাহত হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। আবার সেই রক্তাক্ত জামা যখন চোখে মোছা হলো, তখন পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুবহানাল্লাহ!

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬, ১৭

দেখুন, আল্লাহ চাইলে কিন্তু বিনা জামাতেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারতন। কিন্তু-না, তিনি জামা আনলেন। কুরআন বলছে–

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا

(ইউসুফ বলল) তোমরা আমার এই জামাটা নিয়ে আমার বাবার চেহারায় মুছে দিও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।'[১]

এটাই হলো আসবাবে আলমের জন্য আল্লাহর শাশ্বত নিয়ম। হযরত ইউসুফের জামা মিশর থেকে কেনান যাচ্ছে। আল্লাহর শান দেখুন! যখন ইউসুফ কূপে নিক্ষেপিত হচ্ছিল, তখন তো বাবার কোনো খবর ছিল না; কিন্তু যখন ইউসুফের জামা সুদূর মিশর থেকে রওনা হয়ে গেল, তখন বাবা বলছেন–

اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ

'আমি ইউসুফের গায়ের সুবাস পাচ্ছি।'[২]

তো মূলত আল্লাহ যখন চান, পর্দা ফেলে দেন। যখন চান পর্দা সরিয়ে দেন। এই অধিকার একমাত্র তাঁরই হাতে।

তো যেই বস্তুর কারণে হযরত ইয়াকুব (আ.) কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই বস্তু দ্বারাই দীর্ঘ পরীক্ষার পর আল্লাহ তাঁকে দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার নেয়ামতও দান করেছেন। সুতরাং এটা একটা উসুল। বুঝে নিন।

সুতরাং আমরাও যদি শরীয়তের বিধানের উপর অবিচল থাকি এবং আমরা সাময়িকভাবে কষ্টের মুখে পতিত হই; যার কারণ একমাত্র শরীয়তের বিধান, তাহলে আমাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার উসিলায় আল্লাহ তাআলা এই শরীয়তের বিধানকেই আমাদের শান্তি ও আনন্দের কারণ বানিয়ে দেবেন। তাই বলছি, কুকুরকেও নিজের থেকে উত্তম মনে করুন।

মালিকের সাথে অফাদারি

মানুষের তুলনায় কুকুর তার মালিকের বেশি অফাদারি ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হয়। কুকুরকে যদি তার মালিক জুতা মারে, তো তৎক্ষণাৎ চলে গেলেও কিছুক্ষণ পর পুনরায় মালিকের দরজায় ফিরে আসে। পক্ষান্তরে মানুষকে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটু-আধটু কষ্ট দেওয়া হয়, তখন সে

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৩

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৪

মসজিদের রাস্তা ভুলে যায়। নিজের একমাত্র পালনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। এজন্য বলতে হয়, মানুষের চেয়ে কুকুরই বেশি কৃতজ্ঞ প্রাণী। আমরা তো শুকনো রুটি পেয়ে ঘিয়ে ভাজা রুটির জন্য অভিযোগ করি, ঘিভাজা রুটি পেলে ভুনা গোশতের অভিযোগ করি। কিন্তু কুকুর? মালিক যদি তাকে কিছু না-ও দেয়, তারপরও সে মালিকের দরজা ছাড়ে না; বরং সবর ও শোকর করে সেখানেই পড়ে থাকে।

আরেফানা কালাম

এক আরিফ বিল্লাহ্ বলেন–

راتیں جاگیں تے شیخ سڈاویں
راتیں کا گن کتے تیتھوں اوتے

অর্থাৎ– তুমি রাত জেগে ইবাদত করে নিজেকে শাইখ মনে করছ?

আরে! রাতে তো কুকুরও জাগে। বরং সে তো তোমার চেয়েও বেশি জাগে। আমরা জাগি আধা ঘণ্টা, পৌনে এক ঘণ্টা। অথচ কুকুর সারা রাত জেগে তার মালিকের বাড়ি পাহারা দেয়। শুকনো পচা খাবার খেয়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে শুয়ে থাকে। তার জন্য বিছানারও কোনো বন্দোবস্ত নেই।

رکھا سکھا ٹکرا کھا کے
دن جارو کھاں وچ ستے تیتھوں اتے

আমরা যদি রাতের ডিউটি করে ঘরে ফিরি, তো সকালবেলা নরম বিছানায় আরাম করে ঘুমাই আর বেচারী স্ত্রী ছেলেমেয়েদের হাতে-পায়ে ধরে বলতে থাকে, দোহাই আল্লাহর! তোরা হইচই করিস না। তোদের বাবার ঘুম নষ্ট হলে আমার রক্ষা হবে না। ঘরে মোটামুটি কারফিউ লেগে যায়। অথচ কুকুর সারারাত জেগে পাহারা দেয়; কিন্তু তার জন্য কোনো বিছানার ব্যবস্থা থাকে না। না শীতের মৌসুমে কম্বলের ব্যবস্থা থাকে, না গরমের মৌসুমে ফ্যানের ব্যবস্থা।

تو ناشکرا اتے پلنگاں
اوشاکر روڑیاں اتے تیتھوں اتے

'তুমি পালঙ্কে শুয়ে নাশোকরি কর আর সে নাপাকির স্তূপে শুয়েও তার প্রভুর শুকরিয়া আদায় করে।'

در مالک دا مول نہ چھوڑن
بھاویں مارے سو سوجتے تیتھوں اتے
اٹھ بلھیا تو یار منا لے
نئیں تاں بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے

সুতরাং ভাই! যাও, স্বীয় প্রভুকে রাজি করাও; অন্যথায় কুকুরের কাছেও তুমি হেরে যাবে।

বুকটা হিংসামুক্ত করার ফজিলত

কী আশ্চর্যের কথা যে, মানুষ অন্যের দোষত্রুটির ব্যাপারে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তাকে ঘৃণা করে। অথচ নিজের দোষত্রুটিগুলোর ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত থাকার পরও নিজের নফসকে ভালোবাসে।

যখন সবাইকে ভালো মনে হবে, বলুন তো; তখন কারো ব্যাপারে অন্তরে কি হিংসা আসতে পারে? পারে না। সুতরাং তাসাওউফ ও সূলুকের আসল মর্ম এই মাহফিলে বুঝে নিতে হবে। তা হলো–

آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتن
کفرست در طریقت ما کینہ داشتن

'অর্থাৎ– আমার আইন হলো অন্তরকে আয়নার মতো স্বচ্ছ রাখা। আর তরীকতের পথে অন্তরে হিংসা রাখা তো কুফর রাখার মতো।'

সুতরাং কারো অন্তরেই অন্যের ব্যাপারে হিংসা থাকতে পারে না। কোনো কালেমা উচ্চারণকারীর ব্যাপারেই হিংসা করা যাবে না।

আজকের এই মাহফিলে আমরা কি একথা বলতে প্রস্তুত আছি যে, যে-ই আমার প্রতি অবিচার করেছে, অত্যাচার করেছে, দুর্ব্যবহার করেছে, আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম? আজ আমরা অন্তরগুলোকে পরিষ্কার করে নিই। বুঝে এসেছে কি, কেন এই ভূমিকা ছিল? বিষয়টি সাধারণ নয়। তাসাওউফের সকল স্তর একদিকে আর বুকটাকে হিংসামুক্ত করা একদিকে। ওপরে লা ইলাহা অথচ ভেতরে 'কালা বাবা' এমন যিকিরে কী লাভ হবে? আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিন। কেউ যদি গালি দেয়, দুর্ব্যবহার করে, নির্যাতন করে, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দিন।

এতে সবচেয়ে বড় লাভ হবে, বান্দা অন্য সকল মানুষকে নিজের থেকে উত্তম মনে করবে। আর এতেই তার জন্য লুকায়িত আছে মহাসাফল্য।

কুরআনে মাজীদে আমাদের আলোচনা

রমযানুল মুবারকের কথা। একবার এই অধম কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছিলাম। কথা তো লম্বা; তবে সংক্ষেপে বলছি। কুরআনে মাজীদের একটি আয়াত সামনে এল–

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

'আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা আছে, তোমরা কি বুঝছ না ?'[১]

মনে একথা ভেসে উঠল যে, 'তোমাদের আলোচনা' শব্দটির মধ্যে তো সবাই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ– এখন আমি পড়ছি; আমার আলোচনাও এতে আছে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক সালেকের কুরআনের সেই আয়াতটি খুঁজে বের করা উচিৎ, যাতে আমাদের আলোচনা আছে। এভাবে কুরআন পড়ে দেখুন। এর স্বাদই আলাদা। কোনো-না-কোনো আয়াত অবশ্যই এমন চোখে পড়বে, যা আমাদের অবস্থার সঙ্গে একেবারে মিলে যাবে।

আমিও খুঁজতে লাগলাম। একটি আয়াত এমন পেয়ে গেলাম, যা শতভাগ আমার অবস্থার সঙ্গে মিলে গেল। আপনারাও খুঁজুন; পেয়ে যাবেন। আল্লাহ সবার জন্য সহজ করে দিন। কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করুন, আল্লাহর রহমত পাবেন। যে-আয়াতটি শতভাগ আমার অবস্থার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, সেটি হলো–

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা এক গোলাম বান্দার উদাহরণ পেশ করেছেন, যে কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না। (অথচ তার অবস্থা হলো) সে স্বীয় মালিকের জন্য বোঝা হয়ে আছে। যেখানেই তাকে পাঠানো হয়, কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।'[২]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০

২. সূরা নাহল : আয়াত ৭৬

বাস্তবেই আজ আমরা স্বীয় মালিকের জন্য বোঝা হয়ে আছি। তার দেওয়া নেয়ামত আমরা ভোগ করি। কিন্তু যেভাবে চলা উচিৎ ছিল সেভাবে চলি না। এ-কারণেই আল্লাহ নাফরমান মানুষ ও জিনদের যমিনের বোঝা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ

'হে আমার যমিনের বোঝাসমূহ। খুব শীঘ্র আমি তোমাদের জন্য নিজেকে অবসর করে নিচ্ছি।'[১]

আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য বোঝাস্বরূপ। আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি, যেদিকেই যাই, আমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কী হয়। দু'আ করি, আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন।

আজকের এই মাহফিলে দুটি বিষয় বলা উদ্দেশ্য ছিল।

এক. যদি আমাদের অন্তরে কারো ব্যাপারে হিংসা থাকে, তা হলে আজই তা শেষ করে ঘুমাব। এই মাহফিল হতে ওঠার পূর্বে নিজের অন্তর থেকে সবার হিংসা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে নেব।

দুই. ভবিষ্যতে যখনই কুরআন পড়ব, তখন কুরআনের আয়নায় নিজের চেহারাটাও অবশ্যই দেখার চেষ্টা করব।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

॥ ২৪তম খণ্ড সমাপ্ত ॥

---

১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৩১